বিশিষ্ট লোকের পরস্পর মিলন হয় ? ইহার উত্তরে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যাহারা অতিশয় নীচপ্রবৃত্তি,—চোর, ডাকাইত, লম্পট, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক—যাহারা লোকসমাজের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে নিকৃষ্টতম—নিম্নতম স্তরের অধিবাসী,—সেইরূপ অতি জঘন্যপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট নরনারীই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামতাড়িত হইয়া পরস্পব মিলিত হয়। সে মিলনের—সে কুৎসিত সংযোগের ফল কি অমৃতময় হইতে পারে ? তাহা কি কালকূটের ন্যায় বিষময় নহে ? সেরূপ বীজের উৎপন্ন সন্তান কি বিষবৃক্ষ নহে ? সেইজন্যই সমাজে এত চোর, ডাকাইত ও লম্পট আদির চরিত্র প্রকটিত হইয়া কি সমাজের ধ্বংসের কারণ হইতেছে না ? তাই সেই ধ্বংস হইতে দেশ[illegible] জন্য প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত, সমাজ-ভক্ত, স্বজাতিভক্ত ব্যক্তি নারীর সতীত্বকে কোটি কোটি কোহিনুর অপেক্ষাও মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করেন ; ও যাহাতে সমাজের সকলে তাহার সেইরূপ সমাদর করিয়া ধন্য হইতে পারেন ও সমাজের কলঙ্কেব সৃষ্টি না হয়, ধর্ম্মহীনতা কালিমার উপর চরিত্রকলঙ্কের প্রলেপলেপন হইয়া জীবন দুর্ব্বিষহ না হয়,—তাহারই ইচ্ছা ও চেষ্টা তিনি করিয়া থাকেন।

দেশের বর্ত্তমান সামাজিক ও নৈতিক শোচনীয় অবস্থা দেখিযা সেইরূপ যথার্থ স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তি অতিশয় কাতর হন। বর্ত্তমান সমাজের নরনারীর ধর্ম্মহীন, নীতিহীন, ব্যভিচার-পূর্ণ জীবনের গতি লক্ষ্য করিয়া ইহার পরিণাম আরও কত শোচনীয় হইবে—ইহা ভাবিয়া তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। কিসে আবার এ ধর্ম্মহীনতা, অসাধুতা, অসতীত্ব, অসংযম ও ব্যভিচার বা ম্লেচ্ছাচার এ দেশ হইতে চিরবিদায়

গ্রহণ করিবে, তাহার পন্থা উদ্ভাবন জন্য তিনি সচেষ্ট হন। সেইরূপ যথার্থ স্বদেশভক্ত কোনও মহানুভব ব্যক্তির হৃদয়ে সেই চেষ্টা উদিত হওয়ায়, তিনি বর্ত্তমান নারীজগৎকে ফিরাইয়া কিসে পূর্ব্ব সতীত্বের আলোকে আলোকিত ও সেই মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত করিতে সহায়তা করা যায়, তজ্জন্য সতীত্বসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখাইয়া তাহা গ্রন্থাকারে পরিণত করিয়া দেশের উপকারের আশায় দেশকে দিবার জন্য দেশের লোককে ঐ প্রবন্ধ লিখিবার প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন; এবং তাহাব জন্য পাঁচশত মুদ্রা পুরস্কার ঘোষিত হয়। এই গ্রন্থ সেই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল, এবং তাঁহারই সেই সদিচ্ছার পরিণতি।

জাতীয় চরিত্রগঠন পুরুষের সাধুতা ও নারীর সতীত্বের উপরই নির্ভর করে। ধর্ম্মপ্রাণতাই ঐ সাধুতা ও সতীত্বের মূল। মূল উচ্ছেদপূর্ব্বক অগ্রভাগে সভ্যতার নামে বর্ব্বরতা ও ব্যভিচারের সলিলসিঞ্চনে কখনও জাতীয় জীবন-বৃক্ষ সরস, সতেজ বা সমুন্নত হইতে পারে না। সেরূপ বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইতে মাত্র কালের অপেক্ষা করে; তাহার পতন অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। জগতের ইতিহাসই এ শিক্ষা প্রদান করে। যিনি ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ করেন না, তাঁহাব শিক্ষিতাভিমান বৃথা। জগতের অন্যান্য দেশ—গ্রীস, রোম আদি—ছাড়িয়া এই ভারতবর্ষের মোগল-সাম্রাজ্যের ও রাজপুত রাজন্যবর্গের ইতিহাসই উহার যথেষ্ট শিক্ষার স্থল। ইতিহাসের ঘটনারাশি যেন পর্য্যায়ক্রমে পুনরায় উদিত হয়, তাহাদেরই যেন পুনরভিনয় বা পুনঃপ্রকাশ হয়—ইহাই অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহামতি টড্ সাহেবের প্রণীত রাজপুতানার ইতিহাসপাঠে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন বর্ত্তমান কালে তাহার একটী ভাবের পুনরভিনয়ের কাল পূর্ণ হইয়াছে। স্বাধীনদেশবাসী, স্বাধীনতাপ্রিয় মহানুভব টড্ সাহেব রাজপুতানার গৌরব অগৌরব সকল কাহিনীই কি যথাযথ ও সুন্দর ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন! সে জাতির ইতিহাসে স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ত্যাগের, বীরত্বের, চরিত্রবত্তার, সাধুতার ও সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। আহা! মহারাণা প্রতাপসিংহের চরিত্রে তাহা কিরূপ উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে! আবার জাগতিক উন্নতি যশঃ ও সুখৈশ্বর্য্যকামী রাজপুত্রগণের স্বধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার আদি ত্যাগে বিধর্ম্মী মোগল সম্রাটগণের সংশ্রবে ও তাহাদের সহিত কন্যা, ভগিনী আদির পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার তাঁহাদের অধীনে উচ্চপদলাভে বিশেষ ম্লেচ্ছত্বপ্রাপ্তির ও জাতীয় চরিত্রনাশের পরাকাষ্ঠাও বিদ্যমান আছে। কিন্তু স্বধর্ম্মাদি রক্ষার যে কি গুণ, ও তাহা ত্যাগের যে কি দারুণ কুফল, তাহাও সুন্দর-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ম্লেচ্ছ মোগলসম্রাটগণের সংস্পর্শে সে ম্লেচ্ছত্বগ্রহণের ও জাতীয়ধর্ম্মাদি ত্যাগের ফলে—যে সকল ঐশ্বর্য্য বা মানলাভ কত রাজপুত রাজাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তাহার পরিণতি কি? তাঁহাদের সেই সব মান আদি আজ কোথায়? সেনাপতি মানসিংহের সে মান কবে ধূলিসাৎ হইয়াছে! কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহের চরিত্র-মন্দির-শীর্ষ আজও সুবিমল যশের গগন চুম্বন করিতেছে, এবং যতদিন এ পৃথিবীতে জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা ও তজ্জন্য স্বার্থত্যাগের ও দুঃখদৈন্যবরণের গুণের আদর থাকিবে, —যতদিন চরিত্রবত্তার সমাদর থাকিবে,—ততদিন মহারাণা

প্রতাপসিংহের সুপবিত্র ও সমুজ্জ্বল স্মৃতি মানবসমাজে কখনই আবিল বা লুপ্ত হইবে না।

মোগলসম্রাটগণের সংসর্গে রাজপুত রাজন্যগণ তাঁহাদিগের জাতীয় চরিত্র হারাইয়া হীন হইয়াছিলেন। অত জাগতিক উন্নতির মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা প্রকৃতই কত অবনত,—অত উচ্চ হইয়াও প্রকৃতই কত নীচ হইয়াছিলেন! পরে একদিন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ,—ভুক্তসিংহ, জয়সিংহ প্রভৃতি, আপনাদিগকে যথার্থই অধঃপতিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন; যথাসময়ে তাঁহাদিগের চৈতন্যসঞ্চার হইয়াছিল, এবং যে মহাপুরুষ নিজজীবনে শত সহস্র ভীষণ পরীক্ষাসত্ত্বেও আদর্শ রাজপুতচরিত্র হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হন নাই,—যিনি মোগল সম্রাটের কৃপারবিকরে সুখশায়িত জীবনের সকল উন্নতিকে অতিতুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করিয়া স্বীয় জাতিধর্ম্মের পবিত্রতা ও চরিত্ররক্ষার জন্য অশেষ ক্লেশানলে দগ্ধ হইতে পশ্চাদ্‌পদও হন নাই,—এবং সেই অনলশোধিত হইয়া বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় আজীবন শোভা পাইয়া গিয়াছিলেন,—সেই মহারাণা প্রতাপসিংহের পূতচরণপ্রান্তে তাঁহারা "পুনরায় আমাদিগকে রাজপুত করিয়া লও,"—"আমাদিগের মধ্যে জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি কর"—"আমাদিগকে এ অবনতি হইতে পুনরুত্থিত কর"—"আমাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়া লও"—ইত্যাদি কতই কাতরোক্তি করিয়াছিলেন!

যে রাজপুত রমণীগণের সতীত্ব ও বীরত্বের অদ্ভুত সমাবেশ জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিল,—যে সকল রাজপুতকন্যা মোগলসম্রাজ্ঞীর অতুল সুখভোগাদি অতি ঘৃণিত বস্তু বুঝিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই ম্লেচ্ছমিলনের আতঙ্কে ভীত হইয়া যখন কোন রাজপুতরাজার সাহায্য পাইবার জন্য একখানি পত্র

লিখিতেন, তখন সেই একখানি মাত্র সাহায্য-লিপি কত সহস্র সৈন্যের কার্য্য করিত, সে রাজপুত-চরিত্র আজ কোথায় ? হিন্দু নরনারী আজ সভ্যতার আগ্নেয়গিরির উৎপাতে, জাগতিক সুখৈশ্বর্য্যের আশারূপ ঘূর্ণিবায়ুর ক্রিয়ায়, কোথায় উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন! হিন্দুত্ব ও জাতীয় চরিত্র হারাইয়া ম্লেচ্ছত্বগ্রহণে যে সৌদামিনীপ্রভায় আপনাদিগকে উজ্জ্বল জ্ঞান করিয়া অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতেছেন, সেই চপলা-শোভা চিরস্থায়ী নহে, ও হিন্দুজীবনে প্রকৃত সুখকর নহে এবং দারুণ অধঃপতনেরই কারণ বলিয়া যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন,—যখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব সর্ব্বস্ব হারাইয়া মেকি টাকায় ঘর ভর্ত্তি করিয়া ধনী থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতই অতি নির্ধন বা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, —যখন তাঁহাদের বর্ত্তমান অচৈতন্য অবস্থা দূর হইয়া যাইবে, এবং প্রকৃত চৈতন্যের উদয় হইবে, তখন কাহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া—"আবার আমাদিগকে হিন্দু কর," "আমাদের ম্লেচ্ছত্ব ঘুচাইয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর"—"আমাদিগকে বিশুদ্ধ কর" "আমাদিগকে পবিত্র কর,"—"আমাদিগকে এ সভ্যতার আলোক হইতে রক্ষা কর" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহারা বিলাপ করিবেন, এবং তখন কে বা কাহারা তাহার প্রতীকার করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাই জানেন। তবে তাহা যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ, ইতিহাসের পুনরুক্তি—পুনঃপ্রকাশ অপরিহার্য্য।

আজ যে হিন্দুরমণীর স্বাধীনতালাভের কুহকে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাবিচরণ,—আজ যে হিন্দুনারীর হিন্দুত্ব ও সদাচার পরিত্যাগে

ম্লেচ্ছত্ব ও কদাচারবরণ,—আজ যে হিন্দুকুলস্ত্রীগণেরও স্বাধীনতার সমীরসেবনে অন্তঃপুরত্যাগ,—ইহা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের,—হিন্দুজন্মগ্রহণের কারণবিস্মৃতির এবং পূর্ব্ব-আদর্শ-বিস্মরণেই কুফল। হিন্দু স্ত্রীলোককে ঘরের বাহিরে দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, ঘরে আগুন লাগিয়াছে। কারণ, ঘরে আগুন না লাগিলে,—পুরস্ত্রীর গৃহত্যাগের ন্যায় অমঙ্গল বা দুর্ঘটনা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সতীত্বের বর্ত্তমান আদর্শ বা তথাকথিত হিন্দুগণের বর্ত্তমান আচরণ আদির সম্বন্ধে লিখিতে হইলে, সামাজিক কলঙ্করাশি বাহিরে প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারে না। উহা অনেক সময়েই সমীচীন বা যুক্তিসঙ্গত হয় না, এবং কখনই সুরুচিসঙ্গত হইতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু গৃহদাহ আরম্ভ হইলে, প্রাণরক্ষার জন্য গৃহের কুলললনাগণকেও লোকলজ্জার ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া প্রকাশ্য রাজপথে বাহির করিয়া রাখিতে বাধ্য হইতে হয়, এবং গৃহের মূল্যবান্ সকল দ্রব্যই সর্ব্বলোকের সমক্ষে বাহির করিতে হয়। সময় বুঝিয়া সমাজের অনেক "বুদ্ধিমান্" লোক তখন আপনাদের প্রকৃতির ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করে, এবং ভিন্ন সমাজের লোকও তখন সে সুযোগ প্রায় হারায় না। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে,—সে সমাজ-গৃহে আগুন লাগিয়াছে। কামের অনল,—ব্যভিচারের উদ্দীপ্ত অগ্নিশিখা এখন তাহার শীর্ষস্থান আক্রমণ করিয়াছে; তাহার "মট্‌কা" জ্বলিতেছে। তাই এখন আর গোপনের লজ্জাশীলতারক্ষার উপায় নাই, এবং তাহা উচিতও নহে। "চুপ" "চুপ" করিয়াই সর্ব্বনাশ হইতেছে। সেই,

সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষার জন্যই খোলাখুলিভাবে না লিখিলে যেন কর্ত্তব্যের ত্রুটী করা হয়। তাই এখন লেখকেরও নির্লজ্জ হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শরীরবিজ্ঞানের শিক্ষার ন্যায় সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষায় ও কর্ত্তব্যপথপ্রদর্শনেও সব কথা অকপটে—খুলিয়া বলা বা ব্যক্ত করা একান্ত প্রয়োজন হয়; তাহা কখনই সুরুচিবিরুদ্ধ বা কুরুচিসঙ্গত বলিয়া নিন্দনীয় হইতে পারেনা। ব্যভিচারপূর্ণ সভ্যতার আলোক যাঁহাদিগের চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে,—যাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ সাজিয়া সংসার-পথে চলিতে সাধ করিতেছেন,—তাঁহাদিগকে চক্ষুতে অঙ্গুলিপ্রদানের কষ্ট না দিলে, প্রকৃত ব্যাপার বুঝান যায় না। উহা ক্লেশকর হইলেও সামাজিক মঙ্গলকর বলিয়া অপরিহার্য্য। সেহেতু নারীচরিত্রবিশ্লেষণে যে সুরুচির অপলাপ সম্ভাবনা হইয়াছে, সুধীসমাজ তাহা উপেক্ষা করিবেন ও লেখকের ন্যায় তাহার আবশ্যকতা অনুভব করিবেন, এরূপ আশা করা দুরাশা নহে।

এই ভারতবর্ষ যখন "আর্য্যাবর্ত্ত" নামের যোগ্য ছিল,—এই দেশ যখন "হিন্দুস্থান" নামে অভিহিত হইত, তখন—সেই প্রাচীন কালে—নানাদেশ হইতে কত ভূপর্য্যাপক এদেশে আসিয়া ইহার অতি প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ,—এ দেশবাসীর চরিত্রের সাধুতা ও সতীত্ব, অসাধারণ সত্যপ্রিয়তা, গুরুজনসেবা ও বিশ্বাস-প্রতিপালন আদি গুণে মুগ্ধ হইয়া অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে যে বিদেশী ব্যক্তিগণ এখানে আসিয়া বা এখানকার কথা শুনিয়া যে সকল মত প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন,—সে উভয় মতের মধ্যে

কি স্বর্গনরক প্রভেদ দৃষ্ট হয় না? সে স্বর্গ এ নরকে কেন পরিণত হইল? ইহার কারণ প্রদর্শনে যে কেহ বলিতে পারেন যে, বহুকাল ম্লেচ্ছসংসর্গেই এইরূপ অবস্থা আনয়ন করিয়াছে। প্রাচীন আদর্শ লোপ পাইয়া পরবর্ত্তী ম্লেচ্ছজাতির আদর্শানুসরণ যে জাতীয়চরিত্রের বিশেষ গ্লানিসৃষ্টির কারণ—ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না! রক্ষকের ভক্ষকবৃত্তি, বা আপন আদর্শানুসারে অপরের চরিত্রগঠণের প্রবৃত্তি ও তদনুরূপ শিক্ষাপ্রদান ও প্রাপ্তি পরাধীনদেশের চরিত্রহীনতাসৃষ্টির বিশেষ সহায়ক বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জারজসন্তানের পিতৃত্ব যেমন প্রকৃত জনকের দ্বারা কখনও স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ রক্ষকের নানা দোষও চিরকাল তাঁহার দ্বারা অস্বীকৃতই থাকে। কারণ, তাহা অতিশয় অগৌরব ও কর্ত্তব্যহীনতার পরিচয়। যে কারণেই হউক, প্রত্যেক সমাজেই নিম্নস্তরে কুৎসিৎ দৃশ্য অল্পবিস্তর থাকেই। অপরাপর তথাকথিত সুসভ্যদেশের সমাজ সর্ব্বাঙ্গে বিষাক্ত বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; তাহাদের তুলনায় হিন্দুসমাজগাত্র অতি অল্প স্থানেই বিষদুষ্ট বলিতে পারা যায়। মাত্র তাহা দেখিয়া—এ দেশ নিতান্ত অসভ্য,—এ দেশে ধর্ম্ম বা সুনীতি কাহারও নাই,—এরূপ কদর্য্য ও মিথ্যা কথা সাধারণভাবে বিবৃত করা ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতা বা সম্যক্ দৃষ্টিহীনতার ফল। উহা ঐরূপ বিবৃতকারীর মস্তিষ্কের দারুণ বিকৃতি ও চরিত্রের দারুণ নীচতা বা দীনতাই সূচিত করে। যে সমাজের সর্ব্ব-কলেবর পাপ-বিষে,—ব্যভিচারের, অসংযমের বিষে জর্জ্জরিত,—আমেরিকাদেশের ন্যায় গত কল্যকার সভ্যতারূপ ভূতাবিষ্ট দেশের সেইরূপ সমাজের এক কুমারী—Miss Kåtherine Mayo—

মিস্ ক্যাথেরাইন মে-ও সম্প্রতি "Mother India" বা "ভারত-মাতা" নামে এক অতি কদর্য্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি সমগুণসম্পন্ন দেশে মহা বাহাদুরী লইতেছেন! সকল চালুনীই সূচের ছিদ্রের নিন্দাতেই শতমুখ! আহা! ঐ লেখিকা কি ইংলণ্ডদেশে গমন করেন নাই? যদি একবার সেখানকার হাসপাতালগুলি—পুলিস আদালতগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া পুস্তক লিখিতে বসিতেন, তবে কুৎসার উপকরণস্বরূপ কতই সত্য বস্তু পাইতেন ও তাহা হইলে সুপবিত্র ভারতবর্ষসম্বন্ধে লিখিত পুস্তকে যে দারুণ মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহা একেবারেই করিতে হইত না! ঐ ঘৃণিত পুস্তকে মিথ্যার ও অতিরঞ্জনের অবতারণার পরাকাষ্ঠা ও চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে। গল্পে শুনা যায় যে, কোনও এক রাজ-পরিবারে রাজমাতার পীড়ার সময়ে বমনের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র পালকের ন্যায় বস্তু বহির্গত হইলে, সেই কথা প্রথমে রাজ-অন্তঃপুরে, পরে রাজবাটীর মধ্যে ও অবশেষে বাহিরে লোকমুখে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে প্রচারিত হইয়াছিল যে, রাজ-মাতার মুখ দিয়া ক্রমাগত ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য পক্ষী বাহির হইতেছে, আবার উদরে প্রবেশ করিতেছে—আবার মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। ঐ পুস্তক-লেখিকা কুমারী মে-ও আপন প্রকৃতিগত রবে "ভারত-মাতা"র মুখ দিয়া অসভ্যতা ও কুনীতি কুরুচির পক্ষীকুল বা পশুপাল অনর্গল বহির্গত হইতেছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহাতেই আপন আপন অভিরুচি অনুসারে অপরাপর দেশ ও জাতি মহানন্দ উপভোগ করিতেছে! জার্ম্মান মহাসমরের সময় "War-babies"

বা অসংখ্য বিজন্মা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে—যে সকল দেশে আইনের সুশীতল সলিলধারায় তাহাদের জারজত্বকালিমা প্রক্ষালিত করিয়া সুজন্মাদলভুক্ত করিয়া লওয়া সম্ভবপর হইয়াছে, সেই সকল দেশও এই পবিত্রতম ভূমি ভারতবর্ষের সতীনারীদিগের স্বভাবসিদ্ধ সতীত্বের প্রতি কুটিল ক ক্ষপাত করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? দেবতার উপযুক্ত বাহনও জুটে! তাই এই লেখিকা দেবী আবির্ভূতা হইতে না হইতে তাঁহার উপযুক্ত একটি বাহনও আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া তাঁহার সম আলোচনার নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে! এ জগতে —ভূচর, খেচর, স্থলচর, জলচর, উভচর,—নদী-চর, বক-চর,—অনুচর, পার্শ্বচর,—দিবাচর, নিশাচর,—আবার সিলচর, পিলচর,—কত চরই আছে! ঐ দেবীর এই বাহন চরটি বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত পিলেরচর;—তাই হিন্দুনারীর—পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি ব্রহ্মচারিণী হিন্দুবিধবার—অক্ষয় সতীত্ব-শোণিত শুষ্ক করিতে তৎপর হইয়াছে! এ চরটি পূর্ব্বে "ভারত-মাতা"র বন্ধু বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয়, সেই দলভুক্ত ছিল। এক্ষণে এ নরকত্যাগে স্বর্গবাস করিতেছে। আহা! ভারতের কতই বন্ধু আছে! তবু নির্ব্বোধ অকৃতজ্ঞ ভারত-সন্তান বলে—"সাবধান! বন্ধুগণ হইতে সাবধান!!" যাহাদের উদরে গরুর পাল চরে, তাহাদের গালের ভিতর যে গরুটা চরিবে, ইহা বিচিত্র নহে। দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, যাহাদের গৃহ ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত—আগাগোড়া—কাচনির্ম্মিত, তাহারাও অপরের প্রস্তরভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যের দুই একস্থানে কাচনির্ম্মিত দেখিয়া সেই কাচে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবার কুপ্রবৃত্তি ও দুঃসাহস প্রদর্শন করে! যে দেশের ধনকুবেরগণের পাঁচ শত জন

সুসম্মিলিত হইয়া এক প্রকাণ্ড পাত্রে এক উলঙ্গ রমণীকে স্থাপন করিয়া সেই পাত্র সুরা বা পানীয় পূর্ণ করত সেই বিবস্ত্রা কামিনীর অঙ্গসঙ্গে পবিত্রীকৃত ও পরম রমণীয় পানীয় পরমপ্রীতিসহকারে সুধাবোধে পান করিয়া আপনাদের নারকীয় কুপ্রবৃত্তিপুঞ্জের হুঙ্কারজনক পূতিগন্ধে জগতের অপর অসভ্য দেশের অধিবাসী-গণকে নাসিকা আচ্ছাদন করিতে বাধ্য করে,—যে দেশে অর্থকে, Almighty Dollarকে, সর্ব্বশক্তিমান্ জ্ঞান করিয়া ভগবানের স্থান অধিকার করিয়া বসিতে দেওয়া হয় ও সেই দেবতার পূজাই দেশময় বিদিত, অন্য ধর্ম্ম বা ভগবানের সহিত কোন সংশ্রব সাধারণের আছে কিনা সন্দেহ,—যে দেশের আদালতের প্রতি-মিনিটে কতই বিবাহবিচ্ছেদের মকদ্দমা হইতেছে—যে দেশের অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা তাহার গর্ভধারিণীর শাসন—পরপুরুষসঙ্গ-ত্যাগের শাসন—অসহ্য বোধ করিয়া পিস্তলের গুলিদ্বারা আপন মাতার হৃদয় বিদীর্ণ করত তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া আপন জীবনের পাপ-পথ নিষ্কণ্টক করে,—যে দেশের আদমসুমারের বিবরণে কত সংখ্যা হইয়াছে জানিনা, তবে কত কুমারীর চরিত্র এতই কু যে, তাহারা দাদার মতন কেন, দাদাকেই ভর্ত্তা পাইয়া স্ত্রী পুরুষের ন্যায় বাস করে, কিন্তু এতই নাককাটা, দুকাণ কাটা যে, সেই কুৎসিত কথা অতি নির্লজ্জভাবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, এবং দারুণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, সুনীতি সুরুচি বিরুদ্ধ, মনুষ্যকৃত ও ঈশ্বরকৃত উভয়তঃ আইন বিরুদ্ধ—ঘোর নারকীয় জীবন যাপন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না—যে সকল দেশের গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না,—সেইরূপ দেশের এই কুমারী-লেখিকা যে আমাদের

ভারত-মাতার বক্ষে মিথ্যা কুৎসার গুলি বা অতিরঞ্জনের বর্শাঘাতে একান্তবে তাঁহার হৃদয়শোণিত পাত করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না,—ইহা বিচিত্র নহে। সকলই অধিকার, রুচি ও প্রকৃতি ভেদে ও ভাগ্যবশেই ঘটিয়া থাকে। মক্ষিকা দেহের মধ্যে যে স্থানে ব্রণ, ক্ষত বা ঘা থাকে, তাহাতেই তাহার প্রকৃতিগত অধিকার বোধ করে ও তাহাতেই তাহার রুচির অনুরূপ উপকরণ পায়! তাহার ভাগ্যে ঘা ভিন্ন আর কিছুই জুটেনা। পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতা মহানগরী দেখিতে আসিয়া ধাপার মাঠ মাত্র দেখিয়া যাওয়া যেমন বিড়ম্বনা,—ভারতবর্ষে আসিয়া আপন অভিরুচি মত স্থান দেখিয়া যাওয়ায়, বা অপর কোন কুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট শুনিয়া কেবলমাত্র অসত্য ও কুৎসার থলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া যাওয়ায়, ঐ লেখিকা-কুমারীর সেইরূপ বিড়ম্বনা মাত্রই হইয়াছে। সকলই এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ—সেই ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়। তাই শবব্যবচ্ছেদের বিদ্যাদানের সময় সেই অধ্যক্ষ বা শিক্ষক কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে মাত্র গুহ্যদেশ বা পায়ু প্রদান করেন, এবং সে তাহাতেই ছুরিকা চালন করিতে শিখিয়া মাত্র মল ভাণ্ডের জ্ঞানলাভ করিয়া তৃপ্তি পায়, ও সেই স্থানের জ্ঞানই জগতে প্রচার করিতে বাহির হয়। অপর কোন ছাত্র বা ছাত্রী সেই অধ্যক্ষের বা শিক্ষকের কৃপানির্ব্বাচনে শবের মস্তক লাভ করে, ও তাহাতে মস্তিষ্কাদির সৃষ্টি দেখিয়া কতই আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করে! এই ভারত-মাতার মৃত দেহের মধ্যে একই আমেরিকাদেশের মহিলা পূজনীয়া সিষ্টার নিবেদিতা বা তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিকা রমণীগণ কোন্ অংশ পাইয়াছেন ও কিরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, এবং এই লেখিকা কুমারী ও তাঁহার ন্যায়

প্রকৃতিসম্পন্না নারীগণই ও এক প্রকৃতির নরগণই বা সেই দেহের কোন্ অংশ পাইয়াছেন ও তদ্দ্বারা কি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের রুচিত পুস্তকে ও সমালোচনায় ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেখিলেই বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। হায়! হস্তী কর্দ্দমে পতিত হইলে কদর্য্যদেহ ভেকও তাহাকে লাঞ্ছনা প্রদান করে! আহা! পথের পার্শ্বে মৃতসর্প পতিত রহিয়াছে দেখিলে, রাখালবালকও তাহার লেজ ধরিয়া কয়েকবার ঘুরপাক দিয়া ও সজোরে মাটিতে আছাড় দিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিয়া লইয়া যায়! কারণ, সে জানে যে, উহা মৃত,—উহার জীবন নাই,—উহার বিষ নাই,—উহা আর দংশন করিতে পারিবে না,—উহা দ্বারা আর কোন ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা নাই! পুরাকালে মহিষাসুর সিংহবাহিনীর সহিত যুদ্ধে তাঁহার বাহন জীবিত সিংহের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়া কত বীরত্ব-প্রকাশ করিয়াছিল। আধুনিক বৃষাসুরগণ মৃত সিংহ কোথাও পাইলে মনের আশ মিটাইয়া তাহাকে আঘাত করিয়া অদ্ভুত বীরত্বপ্রকাশ করে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া যে বীরত্বপ্রকাশ—তাহা সুসভ্য বীরজাতির একচেটিয়া বীরোচিত কার্য্য! সে বীররসের কণিকামাত্র কিন্তু কোন অসভ্য দেশবাসী ভীরু কাপুরুষগণের আস্বাদন করিবার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই! আহা! সেইরূপ অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যাদি সন্দর্শনে অসভ্য জাতির লোকদিগের হস্তপদ থাকিলে তাহা, তাহাদের উদরে প্লীহা যকৃতের অতি বৃদ্ধি ও বিস্তৃতিবশতঃ বিশেষ স্থানাভাব থাকিলেও, তাহাদেরই পার্শ্বে অবস্থান জন্য তথায় প্রবেশলাভ করিয়া থাকে! যাহাহউক, ইংরাজী মতে নাম করা বা খ্যাতিলাভ মানে—এ পৃথিবীতে একটা গোল-

স্নাল সৃষ্টিকরা। তাহা বিশেষভাবেই করা হইতেছে দেখা যাইতেছে! কিন্তু হিন্দুজাতির ধর্ম্ম আদি সদ্গুণ বিদেশীয়া বিজাতীয়া কোন কুমারী কেন, কোন মহামারীর লেখনীর ঘূর্ণিবায়ুতেও উড়িয়া যাইবে না। হিন্দুধর্ম্মও আত্মার ন্যায়।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।"

সেহেতু এদেশবাসী প্রত্যেককেই বলিতে ইচ্ছা—

"তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥

কিন্তু এখনও কি তাঁহারা আপনাদের যে দোষ আছে, তাহা দূর করিতে অবহিত হইবেন না? এখনও দেশবিদেশের কাছে লাঞ্ছনাভোগের শেষ হইবে না? স্বামী বিবেকানন্দপ্রদত্ত জ্ঞানোপদেশ সে পাতাল দেশে এত শীঘ্র বিলুপ্ত হওয়া আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু এদেশে স্বামীজীর ও তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রত্যক্ষ জীবন ও তাঁহাদের প্রদত্ত ধর্ম্মশিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা, ও সতীত্বের আদর শিক্ষার উপদেশরাশির কোন ফলোদয় না হওয়া কি অধিকতর আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় ক্লেশস্বীকারে পরিদর্শন করিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন; সেজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বন্ধুবর উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের নিকট এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে অশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব, ও তজ্জন্য তাঁহারা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। আমার দেশের লোকে, তাঁহাদের অতি আদরের নাটক নভেল বা প্রেমউপন্যাস বা "ছোট গল্প" ফেলিয়া ধৈর্য্যসহকারে এই গ্রন্থ ধারণ ও পাঠ করিবেন কিনা, তাহা জানিনা। যদি কেহ করেন ও ইহা দ্বারা কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয়, তাহাহইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে; এবং ইহা যে মহানুভব ব্যক্তির সদিচ্ছার ফল ও যাঁহার আনুকূল্যে ইহার প্রকাশ ও প্রচার, তাঁহারও ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। সেই পূর্ণতা ও সফলতার জন্যই ইহা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হইল, এবং তাঁহারই প্রতিনিধিস্বরূপ আমার বড় প্রিয় স্বদেশবাসী নরনারীর শ্রীকরকমলে ইহা সাদরে ও— "আধ ভয়ে আধ আশায়"—অর্পিত হইল। ফলাফল তাঁহার ও তাঁহাদিগেরই হাতে। তিনি ও তাঁহারাই তাহা বিধান করিবেন। পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার ভ্রমপ্রমাদাদি, বিশেষতঃ মুদ্রাযন্ত্রভূতের বিশেষ ও অশেষ দৌরাত্ম্য বা অশুদ্ধিরাশির ত্রুটী নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন—এই মিনতি। অলমিতি বিস্তরেন।

বারাসাত।
জেলা ২৪ পরগণা।
ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল।

গ্রন্থকার।

সতীত্ব

সূচিপত্র।

———

সতীত্ব।

সতীত্ব অর্থ—সতীর ভাব বা ধর্ম্ম। সতী অর্থ—সাধ্বী পতিব্রতা। পতিব্রতার লক্ষণ এইরূপ:—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"

অর্থাৎ যে স্ত্রী, স্বামীর দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ বোধ করেন—স্বামী বিদেশে থাকিলে যিনি স্বামীর অদর্শনে মলিন ও কৃশভাব ধারণ করেন, এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে মৃতা হন, তাহাকেই পতিব্রতা বলে।

পতি শব্দে—ভর্ত্তা, রক্ষক, প্রভু বা পালন-কর্ত্তা স্বামী বুঝায়। "ভার্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ"—অর্থাৎ ভার্য্যার ভরণ হেতু ভর্ত্তা ও পালন হেতু পতি।

ব্রত অর্থে নিয়ম, যাহা পালন না করিলে প্রত্যবায় হয়, এবং যাহা পরিপালন করিলে স্বর্গাদি অভীষ্ট ফল আয়ত্ত হয়।

পতিব্রতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দুই প্রকার অর্থ হয়:—(১) দেবতাজ্ঞানে পতির সেবা বা পরিচর্য্যা করাই যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, তদ্ভিন্ন আর কোনও পালনীয় ব্রত নাই, এবং (২) জীবনে মরণে পতির সঙ্গে যাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বা অপরিত্যাজ্য।

সৎ শব্দের মৌলিক অর্থ—সত্য, সাধু, উত্তম ইত্যাদি।

সতীত্ব।

যে স্ত্রীলোক ঐরূপ সৎ বা সাধুপ্রকৃতিসম্পন্না, তিনিই যথার্থ সতী বা সাধ্বীপদবাচ্যা। এই সতীত্বই রমণী জাতির গুণ বা একমাত্র বিশেষ ধর্ম্ম।

ভারতবর্ষে ও সমগ্র হিন্দু-জাতিই সতীত্বকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, এবং পরম পবিত্র বোধে সমাদর করিয়াছিলেন। জগতে আর কোনও দেশে কোনও জাতিই সতীত্বকে ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান ও আদর করেন নাই।

তপস্যাই ছিল ভারতের সার রত্ন—তপস্যাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। হিন্দু-নারীর তপস্যার সার তপস্যা—সতীত্ব রক্ষা। ইহা তাহাদিগের সাধনার ধন। এ তপস্যার - এ সাধনার স্থান নির্জ্জন বন বা গিরি-গুহা কিংবা পর্ব্বত-শিখর নহে; উহার স্থান - হিন্দু-গৃহস্থের পবিত্রতম অন্তঃপুর। প্রেম, ভক্তি, বিবেক, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, একান্তবশ্যতা, স্বার্থত্যাগ ও আত্ম-দান এই তপস্যার—এ পূজার পুষ্প ও উপকরণসামগ্রী; সতী রমণীর অতি পবিত্র হৃদয় ইহার আসন, সতী স্ত্রী এ সাধনার—এ পূজার পূজারি, এবং পরমারাধ্য পতিই এ পূজার দেবতা। গৃহে গৃহে নিত্য এ পূজার আয়োজন ও সাধনা। ইহার ফল দুই প্রকার—ঐহিক ও পারলৌকিক। ঐহিক ফল—ধার্ম্মিক, মেধাবী, দীর্ঘায়ু, উত্তম পুত্র-কন্যা লাভ, এবং তদ্দ্বারা দিগন্তসঞ্চারী যশোবিস্তার ও পৃথিবীকে নারীধর্ম্মের আদর্শপ্রদান, আর নিজ চিত্তের পবিত্রতাসম্পাদন। পারলৌকিক ফল—অক্ষয় স্বর্গসুখভোগ প্রভৃতি। এ তপস্যা সংযমসাপেক্ষ—অতি কঠিন, অতি আয়াসসাধ্য বলিয়া অপর দেশের স্ত্রীজাতির মনে

হইতে পারে; কিন্তু ইহা হিন্দুনারীর জন্মগত অধিকার ও প্রকৃতিগত কার্য্য। সে জন্যই তাঁহারা এত দুরূহ তপস্যায় অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছিলেন, হইতেছেন ও হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

সতীত্ব হিন্দুনারীর স্বভাবসিদ্ধ বা প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। কবির কবিত্ব যেমন স্বভাবসিদ্ধ বা প্রকৃতিজাত প্রতিভার ফল, হিন্দু-নারীর সতীত্বও সেইরূপ। চৌদ্দটী করিয়া অক্ষর গণিয়া কবিতা লিখিলেই যেমন প্রকৃত কবি হওয়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ সতীধর্ম্মের একটী একটী মাত্র নিয়ম পালন করিয়া চলিলেই যথার্থ সতীত্বের বিকাশ সম্ভবপর হয় না। সুশিক্ষিতা, অভিজ্ঞা নর্ত্তকীর যেমন বেতালে পা পড়ে না, সেইরূপ হিন্দুসতীনারীর জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কারসিদ্ধ সতীত্বধর্ম্মসাধনায় তাহার পা বেতালে বা বিপথে পড়ে না। সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞানে তাল লয় আদির শিক্ষা সহজ হইতে পারে বটে, কিন্তু কণ্ঠের মধুরতা যেমন গায়কের স্বাভাবিক বা স্বভাবসিদ্ধ গুণ, হিন্দুসতীনারীর সতীত্বও সেইরূপ তাহার স্বভাবসিদ্ধগুণ—জন্মান্তরীণ সাধনার ফল। সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম-ভক্তি-সাধনার অত্যুৎকৃষ্ট শেষ ফল। প্রাণের অকৃত্রিম গভীর ভালবাসা বা ভক্তি থাকিলে, সেই ভালবাসা বা ভক্তিদ্বারা ভক্তিপাত্রের তুষ্টিসাধনই জীবনের সারধর্ম্ম হয়। তখন আর "এইটি কর বা ঐটি করিও না" এরূপ বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয় না; তখন তদগতপ্রাণ হইয়া যায়। সেই পাত্রের জন্যই এই প্রাণধারণ—জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব সেই ভালবাসার বস্তুর পদে দান করা হয়।

পৃথক্ সত্তা বা অস্তিত্ব আর তখন থাকে না। তখন পদে পদে প্রতি কার্য্যে ও প্রতি নিঃশ্বাসে তাহার তুষ্টিসাধনই জীবনের সর্ব্বোত্তম ব্রত হইয়া যায়। তাই পতিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করা,—সে দেবতার সেবায় আপনাকে ভুলিয়া পতিকে প্রাণের গভীর ভালবাসা দানে তুষ্ট করিতে হয়। পতির জন্যই জীবন ধারণ--জীবন ধারণের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই—জীবনের সফলতাই পতিসেবায়— এইরূপ জ্ঞানেই হিন্দুনারীর জীবন গঠিত। তাহার সেইরূপ পবিত্রতম আদর্শ ও উদ্দেশ্যময় জীবনের কার্য্যাবলীর সমষ্টিই সতীধর্ম্ম। সে সতীধর্ম্মের আলোক-জ্যোতিঃ বা তেজঃ অক্ষুণ্ণ—অফুরন্ত—অনন্ত। কিছুতেই তাহা নিবিবার নহে। এক জীবন-প্রদীপ নিবিলেও আবার অপর জীবন-প্রদীপের সৃষ্টি হয়। সেই সতীত্ব ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। সে আলোকের কাছে অন্ধকার-পাপ ঘেঁষিতে পারে না।

জগতে যে সকল কার্য্য বা কার্য্যফল দৃষ্ট হয়, তাহার অগ্রে সহস্র প্রকার কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে। সে সকল কারণের মধ্যে কতক বা প্রকাশিত, কত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। স্থান বিশেষের স্বাভাবিক জলবায়ুর গুণে যেমন বিশেষ বিশেষ ফল ফুল আদি সৃষ্ট হয়, ভারতবর্ষে সতীত্ব-ধর্ম্মও সেইরূপ এদেশের জলবায়ুগুণজাত বিশেষ সুমিষ্ট ফল বা সুরভিপূর্ণ ফুল। এ ফুল ফল অন্যত্র সম্ভবপর নহে।

হিন্দু-সতীনারীর হৃদয়ের ন্যায় অতি উচ্চ পাপ-মেঘহীন

নির্ম্মল হৃদয়-আকাশ পৃথিবীর আর কোনও প্রদেশে দেখা যায় না। সতীত্ব সেই আকাশের তারা-ফুল, সেই আকাশের সুধা-ফল। অপর জাতির নিকট উহা " আকাশ-কুসুম " বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ; কিন্তু হিন্দুজাতির কাছে ইহা কবি-কল্পনা বা অলীক বস্তু নহে। সেই কুসুম-সুবাস ভাগ্যবান্ হিন্দুপতির ঘ্রাণতর্পন জন্য—ঘ্রাণেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য—বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সেই সরস অমৃত-ফল ভাগ্যবান্ হিন্দুপতির রসনা-তৃপ্তির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার অপরূপ সৃজন। ঐ ফুল, ঐ ফল—প্রত্যক্ষ সত্য পদার্থ।

ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনে সকল দিক্ সমুজ্জ্বল থাকা প্রায় দেখা যায় না। কোনও দিক্ বিশেষ উজ্জ্বল থাকে,—আবার অপর দিক্ প্রায়ই ঘোর অন্ধকারময় থাকে। হিন্দুজাতির বর্ত্তমান জীবনে পূর্ব্বতম গৌরব-রবি অস্তমিত হওয়ায় অনেক দিক্ অন্ধকারময় হইয়াছে সত্য ; কিন্তু এখনও হিন্দুনারীর সতীত্বরূপ পূর্ণচন্দ্র হিন্দুসমাজকে বিমল জ্যোৎস্নায় আলোকিত রাখিয়াছে। ঘোর অমানিশায় সব অন্ধকারময় করে নাই। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা—পশ্চিম গগনের সেই সুপরিচিত রাহু—এই উজ্জ্বল শশীকে গ্রাস করিবার জন্য করাল বদন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে সত্য ; কিন্তু যে মহামায়া জগজ্জননীর কটাক্ষপাতে নিমেষে কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও সূর্য্য চন্দ্র রাহু কেতু আদির সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, সেই শিব-সতীর পবিত্রতম আদর্শে গঠিত এই শশী—তাঁহারই স্বহস্তরচিত বস্তু—করুণাময়ীর করুণায় কখনই যে

রাহুর সর্ব্বগ্রাসে পতিত হইবে না। বিপদ্‌কাল উপস্থিত সত্য ; কিন্তু বিপদে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক প্রতীকার চেষ্টা করা ও সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করা হিন্দুর বিশেষ শিক্ষা।

পূর্ব্বপুরুষদিগের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রতীকার চেষ্টায় পূর্ব্বপুরুষদিগের শরণাপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। সূর্য্যবংশীয় সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজা হরিশ্চন্দ্র, ঋষি বিশ্বামিত্রের দারুণ অগ্নি-পরীক্ষায় সর্ব্বস্বান্ত হন এবং পরে চণ্ডালের দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন। পরীক্ষার শেষসীমায় উপনীত হইলে তিনি নিজের আদিপুরুষ সূর্য্যদেবের শরণাগত হইয়া "পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্য" অর্থাৎ "সবিতার বরণীয় সেই তেজঃ আমাকে পবিত্র করুন" বলিতে বলিতে সকল বিপদ-সাগর হইতে—সকল পরীক্ষা হইতে—উত্তীর্ণ হন এবং বিনষ্ট সর্ব্বস্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই মহৎ দৃষ্টান্তানুসারে পূর্ব্ব-গৌরব-ভ্রষ্ট, পরপদানত, বর্ত্তমান হিন্দুজাতির কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। পিতৃলোকের শরণ—পিতৃগণের স্তুতি, পিতৃপ্রণাম ও অর্চ্চনা—এ বিপদ্‌ হইতে উদ্ধারের পরম সহায় হইতে পারে। কারণ—পিতৃস্তুতি দ্বারা—

নমঃ "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমংতপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

অর্থাৎ "পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা ; পিতা প্রীতিলাভ করিলে সকল দেবতাই প্রীত হন"

এই বলিয়া তাঁহাদিগকে স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করিলে সকল দেবতার প্রসন্নতা লাভ হইবে।

কারণ—পিতৃপ্রণাম দ্বারা—

" পিতৄন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥ "

বলিলে অর্থাৎ " যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তিধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, অভীষ্ট ফলের কামনা করিলে যাঁহারা সকল বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সমর্থ, এবং কোনও ফলের কামনা না করিলে যাঁহারা মুক্তিপ্রদান করেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি " বলিয়া তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাদিগের কৃপায় সকল অভীষ্ট ও মুক্তিলাভ হইবে।

আমরা—বর্ত্তমান হিন্দুজাতি—এখন ত দেশ বিদেশে কাঙ্গালের মত কত যাচ্ঞা করিয়া বেড়াইতেছি। কাহার কাছে কি পাইতেছি? পিতৃগণ সব দিতে পারেন—এই শাস্ত্রবচন একবার সরলভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয় না কি?

মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন—

" যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা। "

অর্থাৎ " অধিকগুণসম্পন্ন লোকের নিকট যাচ্ঞা করিয়া কিছু না পাওয়াও ভাল, তবু অধমের নিকট চাহিয়া পাওয়াও

ভাল নহে।” আমরা আপনাদিগের সেই সমধিকগুণসম্পন্ন পিতৃগণের নিকট চাহিয়াও যদি না পাই, তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু চাহিবার মত চাহিলে পাইবই। কারণ শাস্ত্রবচন কখনও মিথ্যা নহে। সন্তান পিতৃ-পুরুষের বড়ই প্রিয় সামগ্রী; তাঁহাদের নিকট একান্তভাবে চাহিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অভীষ্টফল দিতে পারেন ও দিবেন।

পিতৃপূজায় পিতৃলোকের সন্তোষে অসাধ্যও সাধিত হয়, ইহা হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা। সকল দেশেই এ পূজার আদর আছে। মহামতি বার্ক (Burke) বলিয়াছেন— “By respecting our fore-fathers we learn to respect ourselves”. অর্থাৎ “আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা আপনাদিগকে সম্মানিত করিতে শিক্ষা করি।” এ দেশে সে শিক্ষার অনাদর হইয়া আজ আমাদের এই দুরবস্থা। যে হিন্দুজাতি তাঁহাদের সুমহৎ ও উদার প্রাণ এই বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া—“আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যান্তং জগৎ তৃপ্যতু” অর্থাৎ “ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হউন” বলিয়া সমগ্র জগতের তৃপ্তিসাধন করিতেন, সেই হিন্দুজাতি আজ বর্ত্তমান দশায় আপনাদিগের তৃপ্তিও সাধন করিতে পারিতেছেন না—ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

হিন্দুনারীগণ পূর্ব্বগৌরবমণ্ডিত সতীত্ব-রত্ন রক্ষার জন্য সেই মহামায়া সতীদেবীর—সেই পূর্ব্বতম আদর্শসতী—সীতা সাবিত্রীআদি দেবীর শরণাগত হইলে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত

পথে চলিলে নিশ্চয়ই সে রত্ন রক্ষা হইবে। কঠোর তপস্যা-লব্ধ-সিদ্ধি, সতীত্ব। তাহা হানির সম্ভাবনা হইলে আবার সেই তপস্যা দ্বারাই সেই সিদ্ধি পুনরায় অর্জ্জন করা সম্ভব হয়। সে সিদ্ধির সমাদর না করিলে—কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইলে—তাঁহাদের সেই সতীত্ব-সুধাকর যে রাহুগ্রস্ত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

হিন্দুললনার এই সতীত্ব কি,—কিসে ইহার সৃষ্টি, কিসে ইহার পুষ্টি—ইহার সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে,—প্রাচীন কালের—এই ভারতবর্ষ এবং হিন্দুর ধর্ম্ম, সমাজ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, আচার পদ্ধতি, শিক্ষা, বিবাহ আদি সম্যক্ জানা আবশ্যক। সেই হেতু নিম্নে ঐ সকলের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ভারতবর্ষ :—

একটি শ্লোক আছে :-

যা রাকা শশী শোভনা গতঘনা সা যামিনী যামিনী।
যা সৌন্দর্য্যগুণযুতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী॥
যা লোকদ্বয়সাধিনী সুকৃতিণাং সা চাতুরী চাতুরী।
যা গোবিন্দপদারবিন্দমধুগা সা মাধুরী মাধুরী॥

যে যামিনীতে সুনীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয় এবং জগৎকে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পরম রমণীয় করিয়া সকলের চিত্তে বিমল আনন্দ প্রদান করে, ও সুষুপ্তিক্রোড়ে শ্রান্ত নর-নারীকে বিশ্রামের অতুল সুখ বিতরণ করে, তাহাই প্রকৃত সুখকর বলিয়া সেইরূপ যামিনীই আদর্শ যামিনী। নতুবা যে

সতীত্ব ।

যামিনীতে আকাশ ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন থাকে ও মুহুর্মুহুঃ বৃষ্টি-পাতে ও গভীর বজ্রনাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়া জনসাধারণের অশেষ ভীতি উৎপাদন করে এব সকলকে নিদ্রাসুখে বঞ্চিত করে, তাহা যামিনীই নয।

এইরূপ যে কামিনী অতুল রূপলাবণ্যসম্পন্না, অশেষ-গুণান্বিতা এবং অমূল্য রত্নখচিত সতীত্ব-মুকুট মস্তকে ধারণ করিযা গৃহলক্ষ্মী— দেবীস্বরূপিনী,— যাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে জগৎ ভক্তি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিযা ধন্য হয, তিনিই আদর্শ কামিনী। নতুবা রমণী অসতী হইলে তাহাতে দেহকান্তি বা লম্পট কুক্করের নীচ-চিত্ত-বিনোদন-গুণ থাকিলেও সে কামিনী কামিনীই নয।

যে চাতুরী বা বুদ্ধিতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের সুখ ও সদগতি লাভ হয, তাহাই যথার্থ চাতুরী, এব যাহা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মজাত ও স শ্লিষ্ট তাহাই আদর্শ মাধুরী।

যে সতীত্ব-মাধুরী এই পবিত্র ভারতভূমিতে দৃষ্ট হয় তাহার তুলনা নাই। এই ভারতভূমিই পতিব্রতা নারীর জন্মভূমি। পৃথিবীর অপর কোনও দেশে এরূপ পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি সাধ্বীনারীমূর্ত্তি—নযনগোচর হয় কিনা সন্দেহ। নারী-জাতির মধ্যে সতীত্বে ভারতরমণী আদর্শ স্থানীয়া। পতি-ভক্তির এরূপ আদর্শ জগতে আর নাই ও হইতে পারে না, কারণ ধর্ম্মজ্ঞানে ইহার সেবিকা জগতে আর কোন দেশে নাই।

এই বিশ্বে-- এই সংসার-অরণ্যে—ভারত-ললনা-মাতঙ্গী-মস্তক ভিন্ন অন্যত্র এইরূপ অমূল্য সতীত্ব-গজ-মুক্তা জন্মে না।

এই গজ-মুক্তা ধারণ করিয়া সাধ্বী-মাতঙ্গীগণ ভারত-সংসার-অরণ্যে সচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে পাপ-সরোবর-পঙ্কে প্রস্ফুটিত শত প্রলোভন-শতদলে অতি তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করিয়া সগর্ব্বে যেরূপ বিচরণ করেন এরূপ আর কোনও দেশে দেখা যায় না।

মহামায়া জগজ্জননী সতীদেবীর পূত দেহ জগৎ-পিতা মহেশ্বরের স্কন্ধ হইতে বিষ্ণু-চক্রে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত—সমস্ত ভারতের নানা স্থানে—পতিত হইয়া এই দুর্লভ ও অমূল্য সতীত্ব-বীজ ভারতের সর্ব্বত্র বপন করা রহিয়াছে। সেই অমোঘ বীজ—সেই অপূর্ব্ব তেজঃ—সেই অমূল্য রত্ন যে দেশে শোভা পায়, সে দেশ ধন্য সে দেশ জগতের আদর্শ।

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি।
সে যে সকল দেশের রাণী—সে যে আমার জন্মভূমি॥"

কবি অভ্রান্ত সত্য কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের জন্মভূমি - এই পবিত্র ভারতভূমি - সর্ব্বদেশের রাণী, সকল দেশের শ্রেষ্ঠ। অপর সকল দেশ এই দেশের পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া ইহার নানাবিধ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যরাশি সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বপতি "এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে" সাজাইয়া রাখিয়াছেন সত্য, এবং এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে সমুদায় বিশ্বমাঝে যেরূপ আদরে ও যত্নে নানা রত্ন আভরণে সাজাইয়া অতি মনোরম

করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, এরূপ আর কোন দেশকে করেন নাই। তাই বলিতে সাধ হয়, জগৎপিতার সৃষ্ট এই জগতে ভারতবর্ষ তাঁহার "খাসমহল,"—ভারতবর্ষ তাঁহার অনন্তলীলাভূমি—তাঁহার অপরূপ প্রেমের প্রমোদ-কানন -তাঁহার অপূর্ব্ব অব্যক্ত আনন্দের আনন্দ-বাজার।

গোলোক ছাড়িয়া ভূলোকে আসিয়া--অনন্তরূপ ছাড়িয়া সান্ত মানুষরূপ ধরিয়া—পাপের পরাজয় ও পুণ্যের বিজয় ঘোষণা করিতে--তাঁহার সনাতন ধর্ম্মের কলঙ্ক অপনোদন করিতে—হিন্দুর নিকট তাঁহার "দয়ার সাগর" নামের সার্থকতা দেখাইতে -কত বার এই ভূমিতেই কমলাসহ কমলাপতি সেই যোগিজনদুর্লভ---ভক্তজনসুলভ—শ্রীপদ-বিক্ষেপ করিয়া ইহাকে অধিকতর পবিত্রীকৃত ও ধন্য করিয়া-ছেন। যুগে যুগে, বারবার এ সৌভাগ্য-উদয় জগতের আর কোন দেশে হয় নাই ও হইবে না। ভক্তি, আদর, যত্ন, অতিথি সেবা এ ভারতবর্ষ যেমন জানে, আর কোন দেশ তাহা জানে না। রসস্বরূপ তিনি—এরূপ "সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা" সরসভূমি ছাড়িয়া—রাজরাজেশ্বর হইয়াও ছদ্মবেশে অতিথি হইয়া আসিয়া—অতিথিভক্ত ও সেবাপ্রিয় এ দেশ ভিন্ন অন্য শুষ্ক মরুভূমিতে—নীরস অতিথি-বিমুখ জড়বাদীর দেশে—নামিতে তাঁহার মন কেন হইবে? তাই এই ভারতেই, তাঁহার অতি আদরের—অতি প্রিয় ভূমি—ভারতেই—তাঁহার শ্রীপদধূলিদানে অধিকতর পবিত্র ও ধন্য করিতে কতবার আসিয়াছিলেন এবং আসিবেন।

সতীত্ব।

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে নানাভাবে শ্রেষ্ঠ-তম দেশ। ইহার বাহিরের শোভা যেরূপ বিচিত্র ও মনোহর, ইহার ভিতরের সৌন্দর্য্যও ততোধিক। ভারতের হিমাচল, গঙ্গা, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তের যথা সময় নানা ফুল ফল লতা বৃক্ষ পশু পক্ষী আদিসহ ঋতু পরিবর্ত্তন সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করে। সমগ্র পৃথিবীতে যাহা আছে, এক ভারতে তাহার সমস্তই দেখা যায়। সকল প্রকার ফুল, ফল, ভ্রমর, প্রজাপতি, পশু ও পক্ষী, এই ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের আর কুত্রাপি নাই। বিশ্ব-নিন্দুকও বোধ হয় ভারতের নিন্দা করিতে পারে না। ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব আমাদিগের ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রাদিতে বহু ভাবে লিখিত আছে। সে শাস্ত্রে আমাদের আর আদর নাই, সে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ এখন আমাদের অসহ্য; তাই লোকহিতকর ঋষি বাক্যে আস্থা দেখাইতে আমরা আজ অতিশয় কাতর। কিন্তু যদ্যপি কোন ইংরাজ বা ইংরাজ-মহিলা এই ভারতের ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের ও এই ভারতবর্ষের সুখ্যাতি করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে যেন আমাদের সে কথায় কর্ণপাত করিতে প্রবৃত্তি হয়, নতুবা নহে। বস্তুত ভূতের মুখে রাম নাম বাহির হইতে শুনিলে রাম-মাহাত্ম্যে সন্দেহ থাকে না ও আরও বিশ্বাস হয় ইহাতে সন্দেহ নাই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৫৭ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ লিখিত আছে। (১)

---

(১) কৃতত্রেতাদিকশ্চাত্র চতুর্যুগ কৃতো বিধিঃ।
এতৎ তু ভারতং বর্ষং চতুঃসংস্থানসংস্থিতং॥

সত্যাগ্র।

"ব্রহ্মা এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারি যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সমুদ্র, ও উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত—যেন জ্যারোপিত শর-সন্ধান। হে দ্বিজোত্তম! এই ভারতবর্ষ সর্ব্ব-বীজ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল এই স্থান হইতেই মনুষ্য সুকর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব মরুতত্ব প্রভৃতি দেবত্ব, এবং কুকর্ম্ম দ্বারা অসুরত্ব ও তির্য্যক্ সরীসৃপ প্রভৃতি পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাকে কর্ম্মভূমি বলে। যে সকল কর্ম্ম অন্যত্র দেবগণ বা অসুরগণ করিতে পারেন না, সেই সকল কর্ম্ম করিবার উপযোগী একমাত্র স্থান এই ভারতবর্ষে দেবতাগণও জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন।"

ইহা যথার্থ। ভগবানের যে সুদুর্দ্দর্শ অসাধারণ বিশ্বরূপ

দক্ষিণাপরতো হ্যস্য পূর্ব্বেন চ মহানিধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্ম্মুকস্য যথাগুণঃ॥
তদেতৎ ভারতং বর্ষ, সর্ব্ববীজং দ্বিজোত্তম।
ব্রহ্মত্বমমরেশত্বং দেবত্ব, মরুতস্তথা॥
মৃগপশ্চপ্সরো যোনিস্তদ্বৎ সর্ব্বে সরীসৃপাঃ।
স্থাবরাণাঞ্চ সর্ব্বেষামিতো ব্রাহ্মণ শুভাশুভৈঃ॥
প্রযাতি কর্ম্মভূর্ব্রহ্মণ নান্যালোকেষু বিদ্যতে।
দেবানামতিবিপ্রর্ষে সদৈবৈষ মনোরথঃ॥
অপি মনুষ্যামাপ্স্যামো দেবত্বাৎ প্রচ্যুতো।।তক্ষি
মনুষ্যঃ কুরুতে তৎতু যন্ন শক্য, সুরাসুরৈঃ॥

দেবতাগণও সতত দেখিতে প্রয়াসী,—যাহা বেদ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ—কিছু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না—যাহা কেবল প্রাণঢালা একান্ত ভক্তি দ্বারা জানিতে ও দেখিতে পাওয়া যায় -সেই বিশ্বরূপ এই স্থানের আকাশতলেই—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রেই—নারায়ণ নর-নারায়ণ ধনঞ্জয়কে দেখাইয়াছিলেন। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—" ভক্ত ভগবানের বৈঠকখানা " বলিয়া এবং জ্ঞান তাঁহার নিজ স্বরূপ বলিয়া এত ভক্ত ও জ্ঞানী হৃদয় পূর্ণ ভারত ভূমিকেই তিনি পুনঃ পুনঃ তাহার অলৌকিক লীলাভূমিতে পরিণত কবিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন।

হিন্দুপুরাণের শ্রেষ্ঠতম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও এই ভারত-বর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত আছে। পঞ্চম স্কন্দ ১৭ ও ১৯ অধ্যায়ে উহার বর্ণনা আছে। (১)

" কল্পান্তস্থায়ী স্বর্গসুখভোগের পরও ক্ষণকালের জন্যও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ লাভ অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ এই ভারতবাসী-মনুষ্য ইচ্ছা করিলে তাহার কর্ম্মফল ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া অশেষ জন্ম-মৃত্যুর দায় হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।"

---

(১) " কল্পায়ুষান স্থান জয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাম ভারত ভূজয়োর্বরং।
ক্ষণেণ মর্ত্তেণ কৃতং মনস্বিনঃ সংনস্য।
সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ॥

সতীত্ব।

কর্ম্মেই জীবের অধিকার—কর্ম্মফলে কদাচ নহে—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ আছে। তাহার অতি অল্প পালনেই মহৎ সংসার-ভয় নাশ হয়। এই ধর্ম্মশিক্ষা আর কোন জাতির কোন ধর্ম্মে প্রদত্ত হয় নাই। এক ভারতেই উহা প্রচারিত ও বর্ত্তমান আছে।

স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ২১ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ঃ—(১) সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপসমূহের মধ্যে জম্বুদ্বীপ সমান জগতে নাই, এবং নব বর্ষসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি এবং এরূপ স্থান দেবতাগণেরও দুর্লভ।

কবি যথার্থ গাহিয়াছেন ঃ—

"আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।" কারণ এই কর্ম্মভূমিতে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য জন্মগ্রহণও ধন্য, এবং মরিবার মত মরিতে পারিলে—হরিপাদপদ্মসম্ভূতা পূতসলিলা জাহ্নবী-তটে বা কাশীধামে বা যোগমার্গে অবস্থিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলে—পরমা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর জন্মাইতে হয় না। জন্মমৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবার এমন স্থান জগতে অদ্বিতীয়।

---

(১) সন্তি দ্বীপান্যনেকা বৈ পারাবারান্তরাস্থতাঃ।
জম্বুদ্বীপসমো দ্বীপো ন কোঽপি জগতীতলে॥
তত্রাপি নববর্ষাণি ভারতং তত্র চোত্তমম্।
কর্ম্মভূমিরিয়ং প্রোক্ত দেবানামপি দুর্লভা॥

সতীত্ব।

পঞ্চম বেদ স্বরূপ মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে দশম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ঃ—(১)

"কেবল মাত্র ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের সৃষ্টি হইয়াছে। * * * এই ভারতবর্ষ— যথায় আমরা এক্ষণে অবস্থান করিতেছি---এই স্থানেই যথার্থ পুণ্য কর্ম্ম কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা তুমি শুনিয়াছ।"

এই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে কথিত হইয়াছে ভক্তিদেবী তাঁহার জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন ঃ—(২)

"আমি দ্রাবিড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ণাটে ও মহারাষ্ট্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং গুজরাটে বৃদ্ধা শীর্ণা হইয়াছি। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনধাম লাভ করিয়া আমি পুনরায় তরুণী যুবতী হইয়াছি।"

কাপ্তেন জে, বি, সীলি তাঁহার "ওয়ান্‌ডার্স অফ্ ইলোরা" নামক পুস্তকে (যাহা লণ্ডনে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

---

(১) "চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ভারতর্ষভ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ তিষ্যশ্চ কুরুবর্দ্ধন ॥
* * * *
ইদন্তু ভারতং বর্ষং যত্র বর্ত্তামহে বয়ং।
ততঃ প্রবর্ত্ততে পুণ্যং তৎসর্ব্বং শ্রুতবানসি ॥"

(২) "উৎপন্না দ্রাবিড়ে দেশে বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে জীর্ণতাং গতা।
বৃন্দাবনস্য সংযোগাৎ যাতাহম্ তরুণী যুবা ॥"

হইয়াছিল) ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

পণ্ডিত মোক্ষমূলার এই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বিদ্যা জ্ঞান আদি গুণে বিমোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন :—"পৃথিবীর মধ্যে কোন্ দেশ প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যে ধন-রত্নে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ— এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি ভারতবর্ষ।"

সার মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্, সার উইলিয়ম্ জোন্‌স্, বিচার-পতি উডবফ, কর্ণেল অল্‌কট, বিবি বেশান্ত, মিঃ সিনেট প্রভৃতি মনীষিগণ. এবং প্রাচীন কালে যে সকল ভূপর্য্যাটক এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ভারতবর্ষেব রীতি-নীতি ধর্ম্ম আদির ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন।

অবনী-রাণীর অম্বর-গাত্রে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক-শোভার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ভারতবর্ষই তাহার অম্বরমণি—দিনমণি। মেদিনী-সুন্দরীর চারু-অঙ্গে মনোরম অলঙ্কার-শোভার অন্ত নাই। কিন্তু ভারতবর্ষই তাঁহার "কমনীয় কণ্ঠভূষা-হারে দ্যুতিমান্ মধ্যমণি।" এ মণির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিবার ক্ষমতা যাহার তাহার থাকে না। অভিজ্ঞ জহুরি ব্যতীত অমূল্য জহরৎ চিনিবার শক্তি সকলের থাকে না। মূলধন অনুসারে ফলবিক্রেতা বা বস্ত্রবিক্রেতা ইহার সামান্য মূল্য ঠিক করিতে পারে, কিন্তু যথার্থ খ্যাতনামা জহুরি—আর্য্য-ঋষিগণ—ইহার প্রকৃত মূল্য জ্ঞাত থাকিয় তাহা জগতে ঘোষণা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহাদের সন্তানগণ এ মণির কি মূল্য নিরূপণ করিতেছে? এই কর্ম্মভূমিতে সৌভাগ্যবশে

জন্মগ্রহণ করিয়া আসিয়াও কি কর্ম্ম করিয়া চলিয়া যাইতেছে ? তাহাদের সুকঠিন হৃদয়-কাষ্ঠ-ফলকে অজ্ঞান ও বিস্মৃতির—অসংযম ও ব্যভিচারের—আলিপনা এতই সুপ্রতিষ্ঠিত—এতই চিরস্থায়ী হইয়াছে যে, শাস্ত্র-বারিধির বারিরাশিও তাহা প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিতেছে না। দৈন্য ও দাসত্বের অগ্নিরাশিও তাহা অপনোদন করিতে পারিতেছে না। তাহাদের মোহের অন্ধতা—অন্ধকার আর কিছুতেই দূর হইতে চাহিতেছে না। বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে এ দেশ "স্বর্গাদপি গরীয়সী" হইলেও—ইহার মহিমা অপার হইলেও—এ দেশের অসাধারণ মাহাত্ম্যও আজ অত্যুগ্রস্বভাব ও যথেচ্ছাচার আধুনিক অধিবাসীদিগের বা পাত্রের মাহাত্ম্য দ্বারা, এবং অত্যুৎকট কলি-কাল-মাহাত্ম্য-দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই যেন পরাভূত ও দূরীভূত। ধন্য এ কালের এবং একালের পাত্রদিগের বিষম মাহাত্ম্য ! তাই এই পুণ্য ভূমি—কর্ম্মভূমি—পবিত্রতমভূমি—ভারতভূমির এই দশা। তাই সাধের "আর্য্যাবর্ত্ত" আজ অনার্য্যবর্ত্ত ; "হিন্দুস্থান" আজ আর হিন্দুর স্থান—হিন্দুত্বের আদরের স্থান—নহে। হিন্দুত্ব-বিহীন হিন্দুস্থানে আর পূর্ব্বনাম-গৌরবের সার্থকতা নাই। মাতা বসুন্ধরা ও স্রষ্টা বিধাতাই জানেন আবার কবে ও কিসে এত কুসন্তানের পরিবর্ত্তে হিন্দু-সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া ভারত-জননীর শ্রীমুখের শত অসংযম ব্যভিচারের কালিমা—কলঙ্ক অপনোদন করিবে ও আপনাদিগের চরিত্র ও ধর্ম্মবলে—সাধুতা ও সতীত্ববলে—তাঁহার সেই মুখ আবাব নিষ্কলঙ্ক ও

উজ্জ্বল করিবে; আবার কবে ও কিসে এই স্বর্ণভূমি আর "গিল্‌টির বাজার" থাকিবে না ও আবার সেই পাকা সোণার ক্ষেত্রে পরিণত হইবে; আবার কবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বের সেই সব সোণা ফলিবে; আবার কবে ও কিসে এই হিন্দুস্থান জাল হিন্দুত্বের জাল ছিঁড়িয়া আসল হিন্দুর স্থান হইয়া প্রকৃত "হিন্দুস্থান" হইবে; আবার কবে ও কোন্ মহাবীরের—কোন্ শ্রীরামচন্দ্রের রণকৌশলে ও প্রভাবে এ অহিন্দুত্ব-কুম্ভকর্ণ—এ অসংযম---রাক্ষসরাজ রাবণ নিধনপ্রাপ্ত হইবে; কবে কাহাদের দ্বারা কোন্ গয়াধামে কোন্ গদাধরের পাদপদ্মে "ইণ্ডিয়া"র পিণ্ডদানান্তে তাহার বর্ত্তমান প্রেতত্ব—প্রেতভূমিত্ব—ঘুচিয়া তাহার সদ্‌গতিলাভ হইবে; আবার সৎসতীর প্রাদুর্ভাবে এ স্থান আর অধম নরক থাকিবে না—তাহা আবার স্বর্গ হইবে—তাহা আবার স্বর্গের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে।

অতীতেই ভারতের সর্ব্ব গৌরব নিহিত। এ দেশেব সনাতন ধর্ম্মই এই দেশকে এখনও রক্ষা করিতেছে। বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, উপনিষৎ, মহাভারত, রামায়ণ আদি পুরাণ—তন্ত্রাদি মহামূল্য দুর্লভ রত্নরাশি এই দেশকে যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দান করিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। পৃথিবীর কত জাতি এই দেশ হইতে কত প্রকারে কত বিষয়ের বিদ্যা জ্ঞান আদি ঋণ গ্রহণ করিয়া ধনী হইয়াছে তাহার সীমা নাই। ঋণ পরিশোধ করা দূরে থাকুক, শুধু কৃতজ্ঞতাস্বীকাররূপ সুদ দিতেও জগতের অপর ঋণী দেশ কাতর। কৃতঘ্ন ঋণীর ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই সমান।

সতীত্ব ঃ

কথায় বলে "মরা হাতী লাখ টাকা" ; অর্থাৎ হাতীর ন্যায় বৃহৎ মূল্যবান্ জন্তু জীবিত না থাকিলেও তাহার মৃতদেহও অসার নহে, সেই মৃতদেহের বিনিময়েও লক্ষ টাকা মূল্য পাওয়া যায়। তাই এই ভারতবর্ষরূপ মরা হাতীও লাখ টাকায় বিকাইতেছে। তাই আজ সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব্ব দেশ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের মহাধর্ম্মমণ্ডলে (Parliament of Religions) হিন্দুই সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি তথা কথিত সুসভ্য দেশসকল তথা কথিত এই অসভ্য দেশ—ভারতবর্ষের চরণে লুণ্ঠিত। প্রকৃত সভ্যতার প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজঃ মিথ্যা সভ্যতাভিমানীর বৃথা গর্ব্ব-মেঘে ঢাকিয়া রাখা অসম্ভব। তাই শ্রেষ্ঠতম সভ্য জাতি এই ভারতবাসীর ধর্ম্ম-তপন সমগ্র জগতে আলোক বিতরণ করিয়া জগৎকে মোহিত করিতেছে।

হায় পাশ্চাত্য সভ্যতা! তুমি সংসার-মরুতে মায়াবিনী মরীচিকা মাত্র। তোমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কে প্রকৃত সুখ-শান্তি-জল পাইয়াছে ? সেই জলতৃষ্ণায় কাতর মানবগণ তোমার পশ্চাতে ছুটিয়া অশান্তির অনল ভিন্ন শান্তি-জল-কণা পায় না। তাই আজ তোমাদের সমাজের—তোমাদের দেশের এই দশা। রণ-নদীতে রক্তস্রোত বহিয়াছে—পৃথিবীব্যাপী হাহাকার উঠিয়াছে। যে অর্থকে তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ (Almighty Dollar) বলিয়া পূজা করিতেছ, সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভুলিয়া যাহাকে তাঁহার আসনে বসাইয়াছ,—তাহার উপাসনায় তোমার সুখ শান্তি কোথায় ? ঘোর প্রবৃত্তি-মার্গে ছুটিতেছ—

বাসনা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই—সুখ শান্তি পাইবারও অবসর নাই। পররাজ্য, পরস্বাধীনতা, পরসর্ব্বস্ব—সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য গ্রহণেও শান্তি নাই। গ্রহণে—প্রবৃত্তি মার্গে শান্তি নাই। শান্তি,—ত্যাগে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং"—অর্থাৎ ত্যাগের পরই শান্তি।

এই ত্যাগের আদর্শ ছবি ভারতে এখনও যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর কুত্রাপি তাহা দেখা যায় না। জগতের যাবতীয় ভোগবাসনাত্যাগী—দেহ আমি নহি এই দৃঢ় জ্ঞানে এই দেহে আমি বোধ পর্য্যন্ত ত্যাগী—নগ্ন সন্ন্যাসীর সজীব ছবি এই ভারত ভিন্ন আর কোথায় দেখা যায়? মূর্ত্তিমান্ বেদান্তদর্শন এই স্থান ব্যতীত অপর স্থানে দর্শন করা যায় না।

প্রকৃত ধর্ম্মে—প্রকৃত জ্ঞানে—যে পাশ্চাত্যদেশ বামন মাত্র, সে কি এই নিষ্কলঙ্ক শশধর ধরিতে পারে? জড়বাদীর ক্ষুদ্র শুষ্ক মস্তিষ্ক এ ছবির মর্ম্ম ধারণা করিতেও পারে না।

ভারতললনার অপূর্ব্ব সতীত্বধর্ম্মও অপর দেশবাসী ধারণা করিতে পারে না। এই সতীত্ব ধর্ম্ম যে কি—হিন্দু-বিবাহ-সংস্কার যে কি—ইহাদের অর্থ ও উদ্দেশ্য যে কি মহান্—তাহা অপর দেশের লোকেব কথা দূরে থাকুক, হিন্দু বলিয়া পরিচিত অনেকে তাহা জানেন না বা জানিতে ইচ্ছাও করেন না।

পুরুষ প্রকৃতি-সংযোগ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ পূর্ব্ব-সংস্কার

শ্রুতিতে কথিত আছে :—

"স বৈ নৈব রেমে। তস্মান্নেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।" অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা একাকী অবস্থায় রতি অনুভব না করিয়া দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন এবং আপনাকে মায়াবলে প্রকৃতি-পুরুষরূপে বিভক্ত করিলেন।

একটি বীজের ভিতরে দেখা যায় দুইটি ঠিক সমান অৰ্দ্ধ দানা মুখে মুখে জোড়া ও খোসায় ঢাকা থাকিয়া এক হইয়া রহিয়াছে। অনন্তদেবের সৃষ্টিতে—একটি বীজে—অনন্ত শক্তি নিহিত থাকে। একটি বীজ হইতে একটি গাছ জন্মাইয়া সেই গাছে অসংখ্য ফল ও বীজ হয় ও সেই অসংখ্য বীজে আবার অসংখ্য গাছ হইতে পারে। তাহাতেই দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র বীজে অনন্ত সৃষ্টি-শক্তি বর্ত্তমান থাকে।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষ-সৃষ্টি বা স্ত্রী-পুরুষ-সৃষ্টি বড়ই অদ্ভুত। শক্তিমান্ ও শক্তি অভেদ বা এক, উভয়ের মিলন বা মিলিত কার্য্য অভিন্ন বা এক। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি ; এক ভাবিলেই অপরকে মনে পড়ে—তাহাদের প্রভেদ দেখা যায় না।

এই স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে সৃষ্টির বিকাশ। কি মনুষ্য কি পশুপক্ষীকীটপতঙ্গাদি জীব, কি উদ্ভিদাদি সৃষ্ট পদার্থ—সমস্তই স্ত্রীপুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণে প্রভেদ নাই। শিব-গৌরীতে প্রভেদ নাই।

শ্রুতি এই ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ সংসার বা জগৎ-বৃক্ষকে রুদ্র-উমা বা শিব-গৌরী স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রুদ্র নর ও উমা নারী, রুদ্র ব্রহ্মা ও উমা বাণী, রুদ্র বিষ্ণু ও উমা লক্ষ্মী, রুদ্র সূর্য্য ও উমা ছায়া, রুদ্র সোম ও উমা তারা, রুদ্র দিবা ও উমা রাত্রি, রুদ্র যজ্ঞ ও উমা বেদী, রুদ্র বহ্নি ও উমা স্বাহা, রুদ্র বেদ ও উমা শাস্ত্র, রুদ্র বৃক্ষ ও উমা বল্লী (লতা), এবং রুদ্র গন্ধ ও উমা পুষ্প বলিয়া বর্ণনা আছে।

রামায়ণে "শ্রীরাম-নারদ-সংবাদে" উক্ত আছে দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রকে স্তব করিয়া বলিতেছেন ঃ

"ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শিবস্ত্বং জানকী শিবা।
ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্য্যস্ত্বং জানকী প্রভা॥

* * * *

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকী শুভা।
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং ত্বং হি রাঘব॥" অর্থাৎ

"হে রামচন্দ্র! তুমি বিষ্ণু সীতা লক্ষ্মী, তুমি শিব সীতা শিবানী, তুমি ব্রহ্মা জানকী বাণী, তুমি সূর্য্য ও জানকী প্রভা। * * * এই পৃথিবীতে স্ত্রীবাচক যাহা আছে অর্থাৎ স্ত্রীলোক যত, তাহা সীতা বা সীতা অংশে জাত, এবং পুরুষ-বাচক যাহা আছে অর্থাৎ পুরুষ যত, তাহা তুমিই বা তোমার অংশে জাত।

"শিব-শতনাম স্তোত্রে" উক্ত হইয়াছে ঃ

"অহমেব জগদাধারো মমাধারস্ত্বমেব হি।
ত্বৎসমা প্রকৃতির্নাস্তি মৎসমো নাস্তি পুরুষঃ॥"

সতীত্ব

পার্ব্বতী সদাশিবকে তাঁহার কত নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজ নাম সকল বর্ণনা করিয়া বলিলেন : "আমিই এই জগতের আধার এবং তুমিই আমার আধার। তোমার সমান প্রকৃতি নাই, আর আমার সমান পুরুষ নাই।"

স্ত্রীমূর্ত্তি মহামায়া জগজ্জননীর এক একটি রূপ। মহামায়া এই স্ত্রীরূপে বা স্ত্রী-মূর্ত্তিতে এই মায়ার সংসার চালাইতেছেন। তিনি শক্তিস্বরূপিণী, নারী-মূর্ত্তি তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি। সেহেতু এই স্ত্রী-মূর্ত্তির আসন এই সৃষ্টিতে যে কত উচ্চে, তাহা আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞাত থাকিয়া শাস্ত্রে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত আছে মহিষাসুর-বধের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দেহ এবং সর্ব্ব দেবগণের দেহ হইতে উৎপন্ন অতুল তেজঃ একত্র হইয়া অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী নারী-মূর্ত্তি-ভগবতী-রূপে পরিণত হয়। ভগবতী কর্ত্তৃক মহিষাসুর নিধনের পর দেবগণ স্তবে বলেন : (১)

"হে দেবি! তুমি পুণ্যশীলজনগণের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা, তুমি পাপাত্মগণের গৃহে অলক্ষ্মী-রূপা; তুমি বিশুদ্ধ বুদ্ধিমান্-গণের হৃদয়ে বুদ্ধি-রূপা, সংব্যক্তিগণের হৃদয়ে তুমি শ্রদ্ধা-

---

(১) "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী চতুর্থ অধ্যায় ৫ম শ্লোক॥

রূপা, সৎকুলেজাত সাধুগণের হৃদয়ে লজ্জা রূপা, তুমি এই জগৎ পালন কর। এতাদৃশী তোমাকে প্রণাম করি।"

শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের জন্য যুদ্ধকালে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং সমস্ত দেবতাগণের যেমন রূপ, যেমন ভূষণ, যেমন বাহন, ঠিক সেই রূপ, ভূষণ ও বাহন লইয়া সেই দেবগণের শক্তিরূপা দেবীগণ অসুরবধের জন্য জগন্মাতার নিকট আগমন করেন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করেন। শুম্ভবধের পর নিশুম্ভ ভগবতীকে বলেন যে তিনি অপরের বলসাহায্যে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতেছেন। তাহাতে ভগবতী উত্তর করেন যে তিনি এই জগতে অদ্বিতীয়া ও সকলেই তাঁহার---বিশ্ব রূপিণীর---বিভূতি মাত্র। ইহা বলিয়া সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী আপন শরীরমধ্যে সমস্ত দেবীমূর্ত্তি বিলীন করিয়া একাকী যুদ্ধ করিয়া নিশুম্ভকে বধ করেন। তৎপরে দেবগণ যে স্তব করেন, তাহাতে উক্ত আছে· (১)

হে দেবি! শ্রুতি আদি অষ্টাদশ বিদ্যা তোমারই অংশ-ভেদ; জগতে সমস্ত নারী (চৌষট্টি কলা, পাতিব্রত্যাদি ধর্ম্ম ও সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-শক্তিশালিনী ব্রহ্মাণী প্রভৃতি) তোমারই অংশস্বরূপা, একমাত্র তুমি মাতৃরূপে এই জগতের ভিতরে বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছ; অতএব তুমি পূজ্যাগণের শ্রেষ্ঠা;

(১) "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ" ॥

স্তুতি বিষয়ে তোমার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ উক্তি আর কি থাকিতে পারে ?

শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিভূতিবর্ণনসময়ে বলিয়াছেন ঃ

"কীৰ্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।"

(১০ম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক)।

অর্থাৎ "আর নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা—এই সপ্তদেবতারূপা অর্থাৎ যাহার আভাস মাত্রেই প্রাণিগণ শ্লাঘ্য হয়, তাহাও আমি।"

মহামায়া জগজ্জননী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই মায়াময় জগৎ পালন করিতেছেন। শৈশবে মাতৃরূপে, বাল্যে সহোদরা রূপে, যৌবনে সহধর্ম্মিণীরূপে ও প্রৌঢ়ে কন্যারূপে—মহামায়ার এই চারি প্রকার নারীমূর্ত্তি—মানুষ যাহা দেখিতে পায়, তাহা সেই মহামায়ারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ—বিভিন্ন আকৃতি। এই চারি প্রকার আকার ধারণ করিয়া তিনি এই দুস্তর সংসার-খেলা খেলিতেছেন ও খেলাইতেছেন। যাহাকে দেখিতে চক্ষু দেন, সেই দেখিতে পায়, "যে ধরতে জানে" তাহার কাছেই ধরা পড়েন। যাহাতে ধরা না পড়েন, তাহার জন্য কিন্তু কত আয়োজন—কত লুকোচুরি। কারণ—"বুড়ি ছুঁইয়া ফেলিলে আর খেলা চলে না ; তাঁহার ইচ্ছা খানিক খুব খেলা হয়।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন ঃ (১)

"সাধন অবস্থায় কামিনী দাবানল-স্বরূপ—কাল সাপের

(১) শ্রীম লিখিত "কথামৃত"। চতুর্থ ভাগ, ২২২ পৃষ্ঠা।

স্বরূপ। সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান্ দর্শনের পর, তবে মা আনন্দময়ী। তবে মা'র এক একটি রূপ ব'লে দেখ্‌বে।" তাই বেশ্যামূর্ত্তিতেও সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি নমস্কার করিতেন।

পূর্ব্বজন্ম ও সংস্কার।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি ও উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন (১)

যেহেতু জাত-ব্যক্তির মরণ নিশ্চিত, এবং মৃতের জন্ম নিশ্চিত, অতএব তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে—মৃত্যুতে—শোক করিতে পার না। হে ভারত! ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত (চক্ষুরাদির অগোচর), (কেবল) মধ্যে (জন্মগ্রহণ করিবার পর) ব্যক্ত বা প্রকাশিত, এবং নিধনেও অব্যক্ত; অতএব তাহাতে আবার শোক বিলাপ কি?

মানব-জীবন অনন্ত। সতী নারীর জীবনও অনন্ত। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলে, সেই অনন্ত জীবনের কতক অংশমাত্র প্রকাশ পায়—মধ্যভাগমাত্র ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়। এই জন্মগ্রহণের পূর্ব্বের ভাগ বা মৃত্যুর পরের

---

(১) "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"
শ্রীগীতা, ২য় অধ্যায়, ২৭।২৮ শ্লোক।

ভাগ—পানকৌড়ি পাখীর জলে ডুবাব মত—অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত থাকে। সতীনারীব জীবন—মধ্যভাগমাত্র—এ সংসারে দেখা যায়। তাঁহাব পূর্ব্বজীবনের সংস্কারই এই জীবনে—মধ্যভাগে—প্রকাশ পায়।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—(১)

"হে অর্জ্জুন! প্রলয়কালে সমুদায় ভূত আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমার মায়াতে লয় পায়, এবং পুনরায় সৃষ্টি কালে আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি।

সেহেতু দেখা যায় মানবেব অনন্ত জীবনে এই অনন্ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চলিতেছে।

বিষ্ণু পুরাণে উক্ত হইয়াছে :—(২)

"পরাশর কহিলেন,—ব্রহ্মন্! প্রজাপতি যখন সৃষ্টি কবিতে প্রবৃত্ত হন, সে সময়ে তাঁহাব ইচ্ছা মাত্রই দেবগণ, মনুষ্যগণ,

---

(১) "সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥"
শ্রীগীতা, ৯ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক।

(২) পরাশর উবাচ :—
কর্ম্মভির্ভাবিতাঃ পূর্ব্বৈঃ কুশলাকুশলৈস্তু তাঃ।
খ্যাতা তয়া হ্যনির্মুক্তাঃ সংহারে হ্যুপসংহৃতাঃ॥
স্থাবরান্তাঃ সুরাদ্যাস্তু প্রজা ব্রহ্মংশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বতঃ সৃষ্টিং জজ্ঞিরে মানসাস্তু তাঃ॥"
বিষ্ণু পুরাণ, প্রথম অংশ, ৫ম অধ্যায়, ২৬।২৭ শ্লোক।

তির্য্যক্ জাতি ও স্থাবরগণ—এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল; কারণ তাহারা প্রলয়কালে সংহারপ্রাপ্ত হইলেও, সংস্কাররূপে স্থিত স্বীয় কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না; এবং পূর্ব্বজন্মের সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মজনিত শুভ ও অশুভ অদৃষ্ট তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।"

এই পূর্ব্ব জন্ম ও সংস্কার—হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষা। এই পূর্ব্ব জন্ম ও সংস্কাব বশতঃ সতীত্ব-বীজ বা অসতীত্ব-বীজ অঙ্কুরিত ও প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্যজাতির বা অন্যান্য জাতির ধর্ম্মে এই শিক্ষা না থাকিলেও অনেকেই পূর্ব্বজন্ম, সংস্কার ও কর্ম্মফল মানিতে বাধ্য হইতেছেন।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন:—(১)

"যদি সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে উত্তম উপাসকদিগের প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার উত্তম গতি হয়। রজোগুণের বিবৃদ্ধি সময়ে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্মে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মৃত ব্যক্তি পশু আদি মূঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।"

---

(১) "যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥"

শ্রীগীতা, ১৪ অধ্যায়, ১৪।১৫ শ্লোক।

সতীত্ব।

সতীত্ব এই সাত্ত্বিকতার ও রাজসিকতার পরিণতি, এবং অসতীত্ব এই তমোগুণের পরিণতি।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—(১)

"ঈশ্বর—দেহাদির স্বামী জীব—যখন কর্ম্মবশে অন্য শরীর প্রাপ্ত হন, অথবা যখন যে শরীর হইতে যাহাতে গমন করেন, তৎকালে পূর্ব্ব শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয়াদি ও সংস্কার লইয়া যান। যেমন বায়ু আশয় বা কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ।"

সেহেতু পূর্ব্ব জন্ম, তাহাতে কৃত ভাল মন্দ কর্ম্ম ও তজ্জন্য ভাল মন্দ সংস্কার লাভ হয়—ইহা অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সতীত্ব ও অসতীত্বের সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াই নারীগণ সতী ও অসতী হইয়া থাকেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

সৃষ্টি কর্ত্তা তাঁহার লীলাক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিরূপ বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উক্ত বৃক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গুণে ধর্ম্মময় কুসুম বিকসিত হইত, এবং তাহা হইতে মনোহর সতীত্ব-ফল প্রসব করিত।

---

(১) "শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥"
শ্রীগীতা, ১৫ অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

সতীত্ব :

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় (চতুর্থ অধ্যায় ১৩ শ্লোক) বলিয়াছেন :—

"আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি ; কিন্তু তাহার কর্ত্তা হইলেও (বস্তুতঃ) আমাকে অব্যয় বা আসক্তিশূন্য বলিয়া শ্রম রহিত এবং অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও।

তিনি গীতায় (অষ্টাদশ অধ্যায়, ৪১-৪৬ শ্লোক) আরও বলিয়াছেন :—

"হে অর্জ্জুন ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্ম-সকল স্বভাবজ গুণ দ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান ও বিজ্ঞান—ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজ কর্ম্ম। শৌচ, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বর ভাব,—এই সকল ক্ষত্রিয়গণেব স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃসি, পশুপালন ও বাণিজ্য,—বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম, এবং ত্রিবর্ণের সেবাকর্ম্ম—শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে। স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুন। যাঁহা হইতে মানবগণের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয় এবং যিনি এই সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, মানবগণ স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।"

সেহেতু পতির সেবা বা অর্চ্চনা দ্বারা সেই জগৎরূপী ভগবানেরই সেবা বা অর্চ্চনা করা হয়—ইহাই সতীত্ব ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। সতীত্বধর্ম্মেই প্রেম-ধর্ম্ম বা নিষ্কাম-ধর্ম্মের

শিক্ষা। বিনা ভগবৎ-প্রেমে যেমন নিষ্কামধর্ম্মপালন হয় না, সেইরূপ পতি-প্রেম বিনা সতীত্ব-ধর্ম্ম পালন হয় না। দেহকে আত্ম জ্ঞান করিয়া তাহার সুখ বিধানের কর্ম্ম কামের কর্ম্ম,—সকাম কর্ম্ম; উহা নিষ্কাম কর্ম্ম বা প্রেমের কর্ম্ম নহে। সেইরূপ পতিকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার দেহ-সুখ-বিধানের কর্ম্ম সামান্য সকাম কর্ম্ম; উহা হইতে উচ্চ অবস্থা লাভ কয়িয়া পতিকে ভগবান্ বা দেবতা জ্ঞান করিবার ও তাঁহাকে ভগবানের বা দেবতার স্থলে অভিষিক্ত করিবার অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম্ম বা প্রকৃত সতীধর্ম্ম পালনের কর্ম্ম আরম্ভ হয়; ঐ অভ্যাসের পরিণতিই সতীত্ব-ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত—সকাম হইতে নিষ্কাম ধর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্মের উচ্চতর ও ক্রমে উচ্চতম সোপানে আরোহণের ব্যবস্থা। সতীত্বের ন্যায় প্রেম-শিক্ষার এমন পুস্তক—এমন চারু পাঠ—আর ছিল না ও নাই, এবং হইতেও পারে না।

আজ সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, সেই ক্ষত্রিয় ও তাঁহার ক্ষত্রিয়াণী, সেই বৈশ্য ও তাঁহার বৈশ্যা, এবং সেই শূদ্র ও তাহার শূদ্রানী কোথায়? তাঁহাদিগের সেই সিদ্ধি—সেই সুখ আজ কোথায়?

সেই সব পূর্ব্বতন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর সাধুতা ও সতীত্বের ভাবপরিবর্ত্তন কি বর্ত্তমান শোচনীয় দশার অন্যতম কারণ নহে?

স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে। বস্তুতঃ পুরুষ অর্দ্ধ, ও তাঁহার স্ত্রী অর্দ্ধ; এই উভয় অর্দ্ধ জুড়িয়া ষোল আনা, বা এক টাকা।

কিন্তু এক্ষণে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সে শিক্ষা ভুলিতেছেন। পুরুষ আট আনা হইয়াও স্ত্রী ছাড়িয়া নিজেই ষোল আনা হইতেছেন এবং স্ত্রীও নিজে মাত্র আট আনা ভুলিয়া স্বামী ছাড়িয়া নিজেই ষোল আনা হইতেছেন; অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ষোল আনার স্থলে স্বতন্ত্রভাবে উভয়ে বত্রিশ আনা বা দুই টাকা হইয়া আজ আমাদের সমাজের এই দশা।

প্রাচীনকালের শিক্ষা ও আদর্শ এই যে স্ত্রীজাতির কখনও স্বতন্ত্রতা ছিল না। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে তখন কাহারও কোনও আপত্তি হইত না। শাস্ত্রকারগণ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে লোকহিতকর কার্য্যের সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা দিয়াছেন —সকলেই এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী থাকিয়া হাস্যমুখে ও অতি কর্ত্তব্যজ্ঞানে শাস্ত্রের যাবতীয় বিধিনিষেধ মান্য করিয়া ও তদ্দ্বারা শাস্ত্রমর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নিজ নিজ জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মপালনে অতি পবিত্রভাবে ও পরমসুখে কাল-যাপন করিতেন। হিন্দু হইয়া শাস্ত্রেব নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া চলা বা যথেচ্ছাচারিতা এখনকার মত তখন কাহারও স্বাভাবিক বা সম্ভবপর ছিল না। সে কারণে সৎ সতীরও অভাব ছিল না—সুখশান্তিরও অভাব ছিল না। অসৎ অসতীর প্রাদুর্ভাবের ও ব্যভিচারবিস্তারের সম্ভাবনা তখন সেহেতু অতি অল্পই ছিল।

হিন্দুর দশবিধ সংস্কার সুসংস্কার রাশি সৃষ্টির ভিত্তি স্বরূপ।

হিন্দুশিশুর গর্ভবাস হইতে তাহার বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার-কার্য্যের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; যথা—(১) গর্ভাধান, (২) পুং-

সবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্ত্তন, এবং (১০) বিবাহ। প্রত্যেক সংস্কারের নির্দ্দিষ্ট কাল ও বিধি-ব্যবস্থা আছে। সে সকলের মন্ত্রাদি যে কত কল্যাণকর ও সর্ব্বতোভাবে হিতকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যৌবনে বিবাহ সংস্কারের পর প্রৌঢ়াবস্থায় ও বৃদ্ধাবস্থায় অপর আটত্রিশটী যাগ বা পূজা বা ব্রতের অনুষ্ঠান আছে; যথা—বেদব্রত চারিটী, পঞ্চযজ্ঞ পাঁচটী, পাকযজ্ঞ সাতটী, হবির্যজ্ঞ সাতটী, সোমযজ্ঞ সাতটী, মোট ত্রিশটী এবং গুণ আটটী যথা—(১) দয়া, (২) ক্ষান্তি, (৩) অহিংসা, (৪) শৌচ, (৫) অনায়াস, (৬) সুমঙ্গল, (৭) অকার্পণ্য এবং (৮) অস্পৃহা,—মোট ৩৮টী।

হিন্দুর এরূপ সংস্কার-যুক্ত-জীবন—গর্ভাধান হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত—এবং এ নশ্বরদেহত্যাগের পরও পিতৃলোকে স্থিত পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মসকল দেখিলে হিন্দু-জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য কি—লক্ষ্য কি—আদর্শ কি—গন্তব্য স্থান কোথায়—প্রাপ্তব্য কি তাহা বুঝা যায়। তাহা হিন্দু শাস্ত্রের পরম তথ্য —"সর্ব্বে সর্ব্বাত্মকা প্রতীতি" অর্থাৎ সর্ব্বপদার্থে সর্ব্বব্যাপী আমি আত্মারূপে ব্যাপিয়া আছি—এই প্রতীতি বা জ্ঞান; আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও আমিই সেই আত্মা—এই বোধ। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মময়—এই জ্ঞানলাভ ও উপলব্ধি, ও তদ্দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মনাশ ও মুক্তি।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ

জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”—অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার—অখিল—কর্ম্ম কাণ্ড জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। এই জ্ঞান লাভের জন্যই কর্ম্ম-কাণ্ড; জ্ঞান লাভ হইলেই সর্ব্ব কর্ম্মের শেষ। “আমিই সেই আত্মা”—এই আত্মজ্ঞানলাভই হিন্দু নরনারীর জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে হিন্দু-জন্মগ্রহণের ও জীবনধারণের চরম উদ্দেশ্য —জ্ঞানভক্তিলাভ—জীবনরহস্য ভেদ—সত্য ও নিত্যধনলাভ বা মুক্তি, পশু-জীবন যাপন নহে; দেবজীবনযাপন ও দেবত্ব-প্রাপ্তি, ও তৎপরে ততোধিক ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হিন্দুর চরম স্থান বা গন্তব্য স্থান। চতুর্ব্বর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ-জীবন মানবজীবনেব আদর্শ ছিল।

সেই চরম-জ্ঞান-লাভের সহায়ক-হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির চতুর্ব্বিধ আশ্রম বা চতুর্ব্বিধ অবস্থা-গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, যথা—(১) ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, (২) গৃহস্থাশ্রম, (৩) বাণপ্রস্থ আশ্রম ও (৪) সন্ন্যাস বা ভৈক্ষ্য আশ্রম।

১। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—উপনয়নের পর সাধারণতঃ প্রায় ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত গুরু বা আচার্য্যের গৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন —“আমি বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা—আত্মবিদ্যা—ব্রহ্ম-বিদ্যা।” যে বিদ্যাশিক্ষায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত বা পরাবিদ্যা। নতুবা অপরা বা নিকৃষ্টা বিদ্যা তাহার তুলনায় কিছুই নহে। সেই গুরু বা আচার্য্যের চরিত্র আদর্শ ছিল; সেই পবিত্রতা—নিস্পৃহতা এখন ধারণায় আনাও কঠিন। সেই

অকৃত্রিম শিষ্য-প্রীতি ও গুরুভক্তি এক স্বর্গীয় বস্তু ছিল। বেদাদি অধ্যয়নজনিত সেই বিদ্যাও ধন্য ছিল—সেই অতি পবিত্র সংযত ছাত্র-জীবনও ধন্য ছিল; সে শিক্ষকও ধন্য ছিলেন—সে শিক্ষার্থীও ধন্য ছিলেন। সেই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ধর্ম্ম-জীবন-লাভের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সেই সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য-ভিত্তির উপর হিন্দুগণ তখন নিজ ধর্ম্মজীবনরূপ সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সফলকাম হইতেন। গুরু শিষ্যের বিদ্যালাভের যত্নে ও সেবায়, ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ-দানে বিদ্যাসমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রেরণ করিতেন। সেকালের গুরু-শিষ্য—আর একালের গুরু-শিষ্য—স্বর্গ-নরক প্রভেদ। এখনকার ধর্ম্মজ্ঞানহীন বিদ্যার গুণে গুরুমারাবিদ্যাও লাভ হয়। তখনকার শিষ্যের গুরুভক্তি ও গুরুর শিষ্য-প্রীতি এখন ধারণার অতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্য-গণের অলৌকিক ও অদ্ভুত ক্ষমতাও ছিল। তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদদান করিলেই শিষ্যের সর্ব্ব বিদ্যালাভ হইত। পুরাণে ঐরূপ বহু দৃষ্টান্তের পরিচয় আছে।

২। গৃহস্থাশ্রম—সাধারণতঃ ২৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর—গৃহস্থাশ্রম। আশ্রম সকলের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার পর বিবাহ করিয়া ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সংসার-ধর্ম্ম-পালন করিতে হইত।

৩। বাণপ্রস্থাশ্রম—৫০ বৎসরের পর সংসার ত্যাগ করিয়া ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বনে কুটীরে বাস করিতে হইত।

৪। সন্ন্যাস বা ভৈক্ষ্য আশ্রম—৭৫ বৎসরের পর সর্ব্বত্যাগী হইয়া আয়ুঃশেষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। তখন অতিথিও সর্ব্বদেবময় বলিয়া পরিগণিত হইতেন ও সর্ব্বত্র দেবতার ন্যায় আদর যত্ন পাইতেন।

উক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রত্যেক আশ্রমের শিক্ষা আদি দ্বারা তখন মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লাভ উহার সাহায্যে যেরূপে হইত, তাহা আর কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না ও হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-জীবনের চরম লক্ষ্য তখন সন্ন্যাস ছিল। তপস্যাই তখন প্রত্যেকের জীবনব্যাপী ছিল; সকল জীবনই তখন আজীবন তপস্যাময় ছিল।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যয়নাদি তখন জীবনের প্রথম তপস্যা ছিল। তাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—"ছাত্রাণামধ্যয়নন্তপঃ"—অর্থাৎ ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা। সে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ লাভ হইত। শাস্ত্রসঙ্গতভাবে জীব-প্রবাহ-বৃদ্ধির সহায়তার সঙ্গে নিজ ইন্দ্রিয়-সংযমাদির ও সংসারে পরোপকার করিবার অবসর পাইয়া তদ্দারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবা'র সাহায্য গৃহস্থাশ্রমে যারপরনাই হইত। সতীস্ত্রী-লাভে—"বশানুগা" "মনোবৃত্তি-অনুসারিণী"-ভার্য্যাসঙ্গে সংসারে অশেষ প্রকারে সুখী হইবার অবসর হইত। তাই দক্ষ সংহিতায় দৃষ্ট হয়—

" পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দানুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমাৎ পরং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা॥ "

অর্থাৎ ছন্দ-অনুবর্ত্তিনী বা পুরুষের ইচ্ছানুগামিনী পত্নীই গৃহস্থাশ্রমের মূল। যদি ভার্য্যা বশীভূতা ও অনুগতা থাকেন, তবে গৃহস্থাশ্রমের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই।.

মনু বলিয়াছেন :—

" সন্তুষ্টো ভার্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥ "

অর্থাৎ, যে কুলে বা পরিবারে স্ত্রী দ্বারা স্বামী, ও স্বামী দ্বারা স্ত্রী সর্ব্বদা সুখী থাকেন, সে পরিবারে নিশ্চয়ই চির-মঙ্গল বিরাজ করে।

তৃতীয় আশ্রমে বা বাণপ্রস্থাশ্রমে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া—সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া—বনবাসী হইয়া কঠোরতর তপস্যা করিতে হইত। মনু বলিয়াছেন :—

" স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পয়া॥
ভূমৌ বিপরিবর্ত্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈর্দ্দিনম্।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনে বপয়ন্নপঃ॥ "

তৎপরে শেষ আশ্রম—কঠিনতম আশ্রম—সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইত; সর্ব্ব বাসনা সর্ব্ব কর্ম্ম, সর্ব্বকর্ম্মফল, সর্ব্ব সুখদুঃখভাবনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমী বা কৈবল্যাশ্রমী হইতে হইত। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় (১৮ অধ্যায়ে ২ শ্লোক) বলিয়াছেন :—

" কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ "

অর্থাৎ, কবিগণ বা পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্মের ন্যাস বা বর্জ্জনকে 'সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন। বিচক্ষণ বা আত্মজ্ঞানিগণ সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা বা গুণাতীত অবস্থা লাভের বা কৈবল্য লাভের ব্যবস্থা।

"উদ্বাহ-তত্ত্বে" উক্ত হইয়াছে ঃ—

" প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি।
তথ চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥ '

অর্থাৎ, প্রাণহীন শবদেহ যেমন সুখদুঃখ আব লাভ কবে না, প্রাণযুক্ত বা জীবিত থাকিয়াও সেইরূপ সুখদুঃখেব অতীত অবস্থা যিনি লাভ করেন, তিনিই কৈবল্যাশ্রমী।

সন্নাস-আশ্রমেই—কৈবল্য-আশ্রমেই—সুখদুঃখের অতীত অবস্থালাভ ঘটিত, দেহাত্মবুদ্ধিনাশ ঘটিত। ঐরূপ উচ্চাবস্থা লাভই তখন শেষ জীবনে—সকল জীবনে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-জীবনের চবম লক্ষ্য ছিল।

হিন্দু বিবাহ-সংস্কার।

দ্বিতীয় বা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া হিন্দুগণ পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতেন।

হিন্দুর বিবাহ একটি ধর্ম্ম-সংস্কার বা ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠান। ইহা অন্যান্য জাতির ন্যায় চুক্তিমূলক নহে। হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, উহা জন্মজন্মান্তর স্থায়ী। স্বামী বা স্ত্রী কাহারও মৃত্যুতে উহা আপাতদৃষ্টিতে ছিন্ন বা শেষ হইল বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। হিন্দু-কন্যা বাল্যে কায়-

মনোবাক্যে পবিত্র ও সংযমী মাতাপিতার নিকট তাঁহাদের আদর্শ-চরিত্র দ্বারা এবং বিবাহের পর ঐরূপ পবিত্র ও সংযমী স্বামীর হস্তে পড়িয়া স্বামীর ও তাঁহার মাতাপিতা আদিব সৎচরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা আপন জীবনের একমাত্র সার লক্ষ্য—পতিকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ও সেবা করাই নারী-ধর্ম্ম—স্থির করেন। ঐরূপ নারী-ধর্ম্ম বা সতী-ধর্ম্ম পালন জন্মজন্মান্তরে করিতে করিতে অভ্যাসগত কর্ম্মজনিত সতীত্ব-সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল বাখিয়া হিন্দুনারী জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বাভ্যাসগত সংস্কার বশতঃ পূর্ব্বভাব ধারা-খাতেই জীবন প্রবাহিত করিয়া চলিয়া যান।

হিন্দু সমাজে পতি-পত্নী মিলন বা বিবাহ অতি পবিত্র। পতি অতি পবিত্র-গঙ্গারূপে প্রবাহিত—পত্নী স্বচ্ছসলিলা যমুনা, আপন জীবন-প্রবাহ সেই পতি-প্রবাহে সম্পূর্ণরূপে মিশাইয়া দেন; এই প্রয়াগ—এই হিন্দুর বিবাহ-প্রয়াগ—এ সঙ্গম—অতি পবিত্র। পতির সঙ্গে মিশিয়া আর যমুনা নাম নাই; পতিগোত্রে মিশিয়া পত্নী পৃথক সত্তা হারাইয়াছেন। পতিগত-প্রাণা পতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছেন—পৃথক্ অস্তিত্ব আর নাই। অর্দ্ধাঙ্গিনী বটে, কিন্তু কোন্ দিকেব অর্দ্ধ বা কিরূপ অর্দ্ধ, তাহা নিরূপণ করা যায় না; ষোল আনার অর্দ্ধ। প্রয়াগ-বিবাহ-তীর্থে মিলিত হইয়া, গঙ্গা যমুনা উভয় নদীর জল একত্রে মিশিয়া গিয়া—একটী মাত্র নদী হইয়া—পবিত্রতোয় স্বামী-স্ত্রী-রূপী গঙ্গানদী সেই "ব্রহ্ম-সাগর"-সঙ্গম জন্য ছুটি-তছে। উভয় জীবনের মিলিত প্রয়াস সেই "ব্রহ্ম-সাগর"-সহ

মিলন। পাছে ভারতে এ শিক্ষা কখনও ভুল হয়, তাই ভগবান্ ভারতের মানচিত্রে এই গঙ্গা-যমুনা—প্রয়াগ ও সাগর—চির-স্থায়িভাবে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের হিন্দু-নর-নারীব চিত্ত-পট হইতে এ জ্বলন্ত ছবি—এ শিক্ষা কখনও মুছিবার নহে।

হিন্দু-বিবাহ-রূপ ধর্ম্মসংস্কার পুরুষের পক্ষে যৌবন সংস্কার। এই যৌবন-সংস্কাবে চতুর্ব্বর্ণের এবং সঙ্কর জাতীয় লোকদিগেরও অধিকাব আছে। স্ত্রীজাতির ও শূদ্রের বিবাহই প্রধান সংস্কার।

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভেব মূলকারণ পত্নী। সুতরাং মনুষ্য-জীবনে সফলতা বা নিষ্ফলতা লাভ করিবার সন্ধিস্থল বিবাহ বা পত্নীলাভ। সেই হেতু হিন্দুর বিবাহে শত শত সতর্কতাসূচক বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রের প্রাধান্য বা প্রামাণ্য হিন্দু অস্বীকার করিতে পারেন না। চিকিৎসক যেমন রোগীর পীড়া দেখিয়া তাহার ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলে, রোগী সেই ঔষধ ও ব্যবস্থাদির উপর ষোল আনা নির্ভর করিয়া তাহা সেবন ও পালন কবিয়া নীরোগ হন,—রোগী যেমন চিকিৎসকের সহিত "কেন এই ঔষধ দিলেন?" "কেন অন্য ঔষধ দিলেন না?" "এ ঔষধ তিক্ত ও ভাল নহে"—ইত্যাদি তর্ক বিতর্ক করিতে পারেন না, করিলে ব্যাধি মুক্ত করা ও হওয়া কঠিন হয়, সেইরূপ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় সন্দিহান হইলে বা তর্ক বিতর্ক করিয়া তাহার পালন না করিলে, ভব-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার উপায় থাকে না। চিকিৎসক

পরম উপকারী, রোগ হইতে মুক্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, এই জ্ঞানে যে রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন ও তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে চলেন, তিনি আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু যিনি নানা সন্দেহ মনে আনিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ অমান্য করেন, তাঁহার ব্যাধিমুক্তির আশা কম হইয়া যায়। শাস্ত্রকারগণ আমাদের পরম উপকারী—তাহাদের নির্দ্দেশ বা বিধি নিষেধ আমাদের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলকর—এইরূপ সরল বিশ্বাসে ও জ্ঞানে যিনি তাহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনিই শাস্ত্রোক্ত অমৃতময় ফললাভের অধিকারী হন। সেই জন্য এ জীবনে কি কার্য্য ও কি অকার্য্য, তাহা সম্যক্ জানিতে হইলে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ জানিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আদর বা সম্মান করিয়া চলা উচিত। নতুবা অবনতি অনিবার্য্য। সেহেতু শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় (১৬ অধ্যায়, ২৩।২৪ শ্লোক) অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি বা মোক্ষ পায় না। অতএব ইহা কার্য্য বা কর্ত্তব্য, এবং ইহা অকার্য্য বা অকর্ত্তব্য এইরূপ ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ; এজন্য শাস্ত্রের বিধান উক্তি জানিয়া এই সংসারে কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।"

হিন্দুর শাস্ত্র অনন্ত এবং তাহার বিধিনিষেধও অনন্ত, এবং অনেক বিষয়ে পরস্পর বিরোধীও দৃষ্ট হয়। সে জন্য অনেক সময় মহাপণ্ডিতগণও ইহার স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়

সতীত্ব ।

আধুনিক সমাজের আচার-ব্যবহারেও ভয়ানক দুর্দ্দিন ও দুরবস্থা আনিয়াছে। অনেকে আপন প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা যেরূপ, সেইরূপ অনুকূলবিধি মনোনীত করিয়া লইতে পারেন। সেইজন্য যথার্থশাস্ত্রজ্ঞ সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে থাকিলে তিনি এই অনন্ত শাস্ত্র ও বহুবিধ জ্ঞাতব্যের মধ্য হইতে—আয়ুঃ অল্প ও বহুল বিঘ্ন দেখিয়া—হংসের ন্যায় জল ও দুগ্ধমিশ্রিত পদার্থ হইতে অসার জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া সারভাগ-দুগ্ধ—গ্রহণ করাইয়া জীবন ধন্য করিয়া দিতে পারেন।

সদ্‌গুরু ও শুধু পণ্ডিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেজন্য "জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্রে" উক্ত হইয়াছে ঃ—

"মন্থিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রানি চৈব হি।
সারস্তু যোগিভিঃ পীতঃ তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥"

অর্থাৎ চারিবেদ ও সমুদায় শাস্ত্রই মন্থন করিয়া নবনীত-রূপ সারভাগ যোগিগণ খাইয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ঘোল বা অসার অংশ লৌকিক পণ্ডিতগণ পান করেন।

শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থনে যে অমৃত উঠে, তাহা সদ্‌গুরুর ভোগ্য, ও তিনিই শিষ্যকে সেই অমৃতদানে অধিকারী ; এবং যে হলাহল উঠে, তাহাই বৃথা তার্কিক পণ্ডিতগণ খাইয়া ছট্‌ফট্ করেন, এবং তাঁহাদের আশ্রিতগণের ভাগ্যে তাহার অংশ ভিন্ন অন্য কিছুই মিলে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শাস্ত্র-সম্বন্ধে প্রকৃত অজ্ঞ—কামিনীকাঞ্চনসেবী—বিবেকবৈরাগ্যহীন সাধারণ পণ্ডিতদিগকে "চিল শকুনির" সহিত তুলনা করিয়া বলিতেন। "চিল শকুনি

উচু আকাশে উঠে; কিন্তু তাহাদের নজর ভাগাড়ের দিকে থাকে—কোথায় মরা গরু পড়িয়া আছে। যাহাদের বিবেক বৈরাগ্য নাই—তাহাদের খড় কুটার ন্যায় বোধ হয়। তাহারা ফড় ফড় করিয়া অনেক শ্লোক আওড়াইতে পারে, কিন্তু কিছুই ধারণা করিতে পারে না।" তিনি শাস্ত্রের বিধান মান্য করিয়া চলার সম্বন্ধে বলিতেন যে, শাস্ত্রে কি আছে তাহা জানিয়া লইয়া সেই অনুসারে কার্য্য করা উচিত। যেমন কেহ একখানি চিঠিতে লিখিয়াছে—"পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানি রেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবে।" সেই চিঠি হারাইয়া গেলে অনেক খুঁজিয়া চিঠিখানি পাইলে ঐ লেখা পড়া হইল; তখন আব চিঠির দরকার নাই; চিঠি ফেলিয়া ঐ সন্দেশ ও কাপড়ের যোগাড় করিলেই হয়। শাস্ত্রের বিধান জানিয়া তাহার পালন কার্য্যে করিবার জন্য তিনি উপদেশ দিতেন।

হিন্দু-বিবাহ-সম্বন্ধে শাস্ত্রকার মনু আট প্রকার বিভাগ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্ষ, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আসুর, (৬) গান্ধর্ব্ব, (৭) রাক্ষস, এবং (৮) পৈশাচ। অষ্টম বা পৈশাচ বিবাহ অতি অধম। আসুর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ-বিবাহ-ব্যাপারে কোনও শাস্ত্রীয়-সংস্কার নাই। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে সংস্কার-লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং তাহার মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহেই পূর্ণ-সংস্কার-লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, ও তাহাই ভারতবর্ষে সমাদৃত ও আদর্শ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত।

এই ব্রাহ্ম বিবাহ স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের কত শুভকর—

পরস্পরের আত্মোন্নতি লাভের কত সহায়ক—তাহা উহার ব্যবহারাদি দর্শন করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। উহার প্রধান তিন অঙ্গ, (১) অর্হনা বা অর্চ্চনা, (২) কন্যাদান এবং (৩) পাণি-গ্রহণ। ঐ গুলির মন্ত্রাদি বুঝিলে হিন্দু বিবাহ যে কি পবিত্র বন্ধন, তাহা বুঝা যায়।

(১) অর্হনা বা অর্চ্চনা :—[১]

পাত্রের প্রতি ভক্তি ও আড়ম্বরসহ পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে। পাত্র চরিত্রবান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন, এবং তাহাকে সাদরে স্বয়ং আহ্বান পূর্ব্বক বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিতা কন্যা দান করাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে।

(২) কন্যাদান :— [২]

শাস্ত্রে বালিকাকন্যাদান মহাপুণ্যকর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ আছে। অষ্টমবর্ষে গৌরী, নবমবর্ষে রোহিণী, ও দশমবর্ষে কন্যকা দান শাস্ত্রসম্মত ও প্রশস্ত। তাহার পর কন্যাকে রজস্বলা কহে ও সেরূপ কন্যাদান শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

দানকার্য্যের ছয়টি লক্ষণ আছে,(১) দাতার পবিত্রতা,(২) দেয় দ্রব্যের অর্পণ, (৩) তাহার নাম উচ্চারণ, (৪) দেয় দ্রব্যের উপর উৎসর্গ জ্ঞাপক জলত্যাগ বা প্রোক্ষণ, (৫) যিনি দান করিবেন তাঁহার উল্লেখ, (৬) গ্রাহক বা দানগ্রহণকারীর স্বীকার

[১] "আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

[২] "অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥"

কন্যাদানে উক্ত ছয় প্রকার লক্ষণই বিদ্যমান আছে। পাত্র কামস্তুতিপাঠপূর্ব্বক কন্যাদান স্বীকার করেন। এই কামস্তুতি মন্ত্রটির মর্ম্ম অতি সুন্দর। এই কাম, সামান্য স্ত্রীঘটিত ভৌতিক কাম নহে। উহা সেই কাম-জনক-হৃদয় হইতে উত্থিত সর্ব্বভূতব্যাপী অনাদিবাসনা বা আধ্যাত্মিককামের স্তুতি। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় নিজ বিভূতি বর্ণনা করিবার সময় প্রাণিগণের মধ্যে তিনি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প বলিয়া আপনাকে যে উল্লেখ করিয়াছেন [৩] এবং প্রাণি সকলে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম বা স্বীয় স্ত্রীতে পুত্রোৎপত্তি মাত্র উপযোগী বলরূপে অবস্থিত বলিয়া আপনাকে যে উল্লেখ করিয়াছেন [৪] সেই অনাদি পুরুষের স্তুতিই এই কাম স্তুতি। এই কামস্তুতি পাঠে কন্যার দান ও গ্রহণ শেষ হয়। দানের দ্বারা দাতার অধিকার লোপ ও গ্রাহকের অধিকার সৃষ্টি হয়। পিতা কন্যাদান করায় পাত্রের ঐ কন্যাতে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। কিন্তু পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠান ভিন্ন পতি-পত্নী ভাব জন্মায় না।

(৩) পাণিগ্রহণ—এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ সকল দেখিলে ও বুঝিলে আর্য্যদিগের প্রাচীনরীতিনীতি এবং বিবাহ-সংস্কারের সারভূতকথা সকল হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

পাণিগ্রহণের ব্যবস্থাসকল দ্বারা পতি-পত্নী ভাব দৃঢ়বদ্ধ হয়, এবং উভয় জীবন একীভূত হইয়া স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর সমস্ত দোষ অপনয়ন করার, উভয় চিত্ত অনুরূপ হওয়া, এবং স্ত্রী এক-মনা হইয়া পতি বাক্যের সেবা ও পালন করার প্রার্থনা বা

---

[৩] "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ।" (শ্রীগীতা, ১০।২৮শ্লোক।)

অনুজ্ঞা হয়। পরে অন্নরূপ পাশ ও মণিতুল্য প্রাণসূত্রের ও সত্যরূপ গ্রন্থি দ্বারা বধূর মন ও হৃদয়কে বর বন্ধন করেন, এবং "হে বধু! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক" এইরূপ প্রার্থনা দ্বাবা বিবাহ-বন্ধনের চরম গ্রন্থি প্রদত্ত হয়।

স্বামী স্ত্রীর এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন মিলন বা তুইকে এক করার ব্যবস্থা হিন্দু-বিবাহ দ্বারা যেরূপ হয়, জগতেব কোন দেশেব কোন শাস্ত্রেই তাহা নাই। মনু বলিয়াছেন [১] "প্রভু বা ব্রহ্মা আপনার দেহকে তুই ভাগে বিভক্ত কবিয়া এক অর্দ্ধ খণ্ডে পুরুষ ও অপর অর্দ্ধ খণ্ডে নারী সৃষ্টি করিয়া বিরাটের সৃষ্টি করিয়াছেন।" পূর্ব্বের বিভক্ত তুই অংশ এই হিন্দু বিবাহ-সংস্কার বা বন্ধন দ্বারা পুনরায় এক কবা হয়। পৃথিবীর কুত্রাপি আর বিবাহ-বন্ধন এত গভীর, অতলস্পর্শী, দৃঢ় এবং পবিত্র হয় না।

হিন্দুর বিবাহ আপাত সৃষ্টিতে কঠোরতম বন্ধন বটে, কিন্তু এই বন্ধন ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবাব সহায়ক। শাস্ত্র-সঙ্গত ধর্ম্ম-কর্ম্ম দ্বারা উভয় জীবন এক হইয়া সেই আদি কারণে পরিশেষে মিশিয়া যায়। বাজীকর যেমন ভেল্‌কি দেখাইবার

[৪] "বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতঃ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥"
শ্রীগীতা, ৭ম অধ্যায়, ১১ শ্লোক।

[১] "দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাড়মসৃজৎ প্রভুঃ॥" মনু

সময় একটি দড়িতে শত কঠিনগ্রন্থি দিয়া দর্শকবৃন্দকে তাহা খুলিতে দিলে কেহ শতচেষ্টাতেও তাহার একটিও খুলিতে পারেন না, কিন্তু বাজীকর তাহা হস্তে লইয়া একটিবার মাত্র নাড়া দিলে দেখা যায় সব গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে- দড়িতে আর কোন গ্রন্থি নাই ; সেইরূপ এই মায়ার সংসার যে "কল্পিত ইন্দ্রজাল" মাত্র তাহা হিন্দু স্বামী-স্ত্রী বুঝিতে পারেন, এবং উভয়ের জীবন-রজ্জুর শত বন্ধন সেই বাজীকরের মহাবাজের শ্রীহস্তে পতিত হইলে, তিনি দয়া করিয়া একটিবার মাত্র নাড়া দিলে বা আকর্ষণ করিলে সব বন্ধনই খুলিয়া যায় ;— মানবজীবন-ধারণ ধন্য ও সার্থক হইয়া শেষে সেই অনন্তে মিশিয়া যায়। হৃদয়-গ্রন্থি, সকল বন্ধন— ছিন্ন হইয়া যায় - সকল সংশয় ঘুচিয়া যায়। (১) হিন্দুর এই মহা পবিত্র বিবাহ-বন্ধনই সেই মোক্ষলাভের বা মুক্তিপথের প্রধান সহায় ও হেতু।

কেহ কেহ বিবাহকে দণ্ড মনে করেন।

"দণ্ড" অর্থে যখন যষ্টি বা লাঠি হয়, তখন এই বিবাহ দণ্ডে নির্ভর করিয়া দুর্ব্বল মানব সংসার-ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন, ও তখন তাহার পতনের ভয় থাকে না। বিবাহিত নরনারী এই দণ্ড বা লাঠির সাহায্যে অনেক পাপ প্রলোভনরূপ হিংস্র জন্তুকে বা পাপ-বুদ্ধি নিজসংসারাক্রমণকারীকে অনায়াসে বিতাড়িত, দূরীভূত ও পরাভূত করিতে সমর্থ হন।

"দণ্ড" অর্থে যখন দমন বা শাসন হয়, তখন বিবাহিত

(১) "ভিদ্যতে হৃদ গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়।"

নরনারী ইহার সাহায্যে আপনাদিগকে যথেচ্ছাচার হইতে দমন ও শাসন করিতে সামর্থ্যলাভ করেন, এবং এই বিবাহ-দণ্ড উভয় জীবনকে দমিত ও শাসিত করিতে ও রাখিতে সম্পূর্ণ সাহায্য করে।

"দণ্ড" অর্থে যখন শিক্ষা হয়, তখন ইহা উভয় জীবনকে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া কত প্রকার শিক্ষাই প্রদান করে, এবং সেই শিক্ষার সাহায্যে নরনারীগণ পরম শিক্ষিত ও শিক্ষিতা হইয়া নিজ সন্তান-সন্ততিগণের চক্ষুতে আদর্শ-চরিত্র হইয়া তাহাদেরও পরম শিক্ষার কারণ ও কেন্দ্র হন।

"দণ্ড" অর্থে যখন "সোজা হইয়া দাঁড়ান" হয়, তখন এই বিবাহই নরনারীকে ইহার সাহায্যে এই সংসারে সোজা হইয়া দাঁড় করাইয়া থাকে। ইহার অভাবে সাধারণতঃ সোজা হইয়া দাঁড়ান সম্ভবপর হয় না, এবং অনেক সময়েই সুবক্র থাকিয়া কুরূপ ও নিন্দাভাজন হইতে হয়।

"দণ্ড" অর্থে যখন যুদ্ধ হয়, তখন ইহার সাহায্যে নর-নারী আপন ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে পরাভূত ও আপনাদিগের বশীভূত রাখিয়া আত্ম-সংযমলাভে পরম সুখলাভ করেন, এবং এই বিবাহ-যুদ্ধ ভিন্ন অনেকেই তাহাদের দ্বারা পরাভূত হইয়া, ও তাহাদের বশীভূত থাকিয়া, অসংযম ও ব্যভিচারহেতু পরস্পর অতি ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন।

"দণ্ড" অর্থে যখন "ব্যূহ বিশেষ" হয়, তখন এই ব্যূহ যে কত দুর্ভেদ্য বা অভেদ্য তাহা বুঝা যায়। এই ব্যূহ ভেদ

করিতে গেলে ভেদপ্রয়াসী অভিমন্যুর মরণ নিশ্চিত হয়।

"দণ্ড" অর্থে যখন সৈন্য হয়, তখন এই সৈন্যসাহায্যে জীবন-সংগ্রামে ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধে অনায়াসে জয়লাভ করা যায়।

"দণ্ড" অর্থে যখন কোণ হয়, তখন এই কোণে ধ্যানস্থ হইয়া বসিলে ইহপরকালের সদ্গতি লাভ করিতে পারা যায়।

"দণ্ড" অর্থে যখন মন্থান বা মন্থনদণ্ড হয়, তখন এই দণ্ডের সাহায্যে ও সদ্ব্যবহারে সংসার-সাগর-মন্থনদ্বারা অমৃত লাভ হয়, এবং কুব্যবহারে হলাহল উত্থিত হয়।

"দণ্ড" অর্থে যখন "যুদ্ধযাত্রার আজ্ঞা" হয়, তখন এই আজ্ঞা পাইয়া যুদ্ধের সৈনিকগণ যুদ্ধে যেরূপ সাহস, সামরিক আইন ও শাসনের বশীভূত থাকার গুণ, ও শত সহস্র কষ্ট-বিপত্তির সম্মুখীন হইবার গুণ শিক্ষা ও প্রদর্শন করেন, বিবাহিত নরনারীও সেই গুণরাশি অর্জ্জনের ক্ষমতালাভ করিবার উপদেশ ও অবসর প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ রণসজ্জা ও বিবাহ-শয্যা—এই উভয় ব্যাপার সম্বন্ধে দেহ ও মন প্রস্তুত করার অনেক বিষয়ের মিল আছে।

বিবাহ যে দণ্ডই হউক, এই দণ্ডনীতি শিক্ষা করিলে নর-নারী—স্বামী-স্ত্রী তাঁহাদের সংসার-রাজ্য শাসন সম্বন্ধে সমস্ত নিয়মে ও উপদেশে অভ্যস্ত হইয়া উভয়েই পরম সুখে কালাতি-পাত করিতে সমর্থ হন।

বিবাহ-দণ্ড সংসারের ও সমাজের মেরু-দণ্ড। শৃঙ্খলা-বদ্ধ অস্থি বা মেরুদণ্ড দেহকে পরিচালিত করে, এবং সে শৃঙ্খলা

নষ্ট হইলে, অর্থাৎ মেরু-দণ্ড ভগ্ন হইলে, যেমন দেহ অচল ও নষ্ট হয়, বিবাহ-মেরুদণ্ডও সেইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সমাজ-দেহকে পরিচালিত করে, এবং সে মেরুদণ্ড ভগ্ন হইলে সমাজ-দেহ বিশৃঙ্খল, অচল ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুসমাজ ও বর্ত্তমান তথাকথিত হিন্দুসমাজ তুলনা করিলে, বা অপর দেশের ও জাতির বিবাহ-প্রথা ও আচার-পদ্ধতি তুলনা করিলে সহজেই ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে হিন্দু-বিবাহ এক ধর্ম্মমূলক সংস্কার। অপর সকল দেশের বিবাহ চুক্তিমূলক; স্বামী গ্রাসাচ্ছাদনের ভরণ-পোষণের ভার লইবেন, ও স্ত্রী তজ্জন্য তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইবেন, মূলতঃ এইপ্রকার চুক্তিতে উভয়পক্ষ সম্মত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর উচ্ছিষ্টভোজন বৌদ্ধ, খৃস্টান ও মুসলমানদিগের বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ।

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধগণের বিবাহ কালে স্ত্রীপুরুষ একত্রে বসিয়া এক পাত্র হইতে ভোজন করিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করে।

চীনদেশে ও জাপানদেশে একটী লেবু বা অন্য কোন ফলের এক অর্দ্ধেক পুরুষ স্ত্রীর মুখে ধরিয়া ও অপর অর্দ্ধেক স্ত্রী পুরুষের মুখে ধরিয়া খাওয়াইলেই তাহাদের বিবাহ হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হয়।

জাপানে জাতীয়সুরা—শাকীপূর্ণ পানপাত্র হইতে উভয়ে পান করিয়া থাকেন। "আজি হইতে একত্রে সুখ দুঃখ ভোগ করিবেন"—ইহাই তদ্দারা সূচিত হয়। জাপানদেশীয় বিবাহে

"শাকী"-পানই বিবাহের মূল অনুষ্ঠান।

মুসলমান-বিবাহে স্ত্রী বিবাহ-চুক্তি স্বীকার করিবার পর উভয়ে একাসনে বসিয়া এক পাত্র হইতে পরস্পরের মুখে খাবার দ্রব্য তুলিয়া দিতে হয়, এবং তাহাতে বিবাহ সিদ্ধ হয়।

খৃষ্টানদিগের মধ্যে বিবাহ-চুক্তি-স্বীকার এবং গির্জ্জায় পুরোহিতের দ্বারা মন্ত্র পাঠ ও পরস্পর মুখ চুম্বন দ্বারা বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

উচ্ছিষ্টভোজন করাইয়া উচ্চ স্তর বা শ্রেণী হইতে নিম্নে আনিয়া নিজের সমান করা বুঝাইতে পারে।

ঐ সকল বিবাহে সংস্কারমূলক কিছুই দৃষ্ট হয় না। হিন্দু-বিবাহের ন্যায় সংস্কারমূলক না হইলে বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় বা চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে।

হিন্দুর ব্রাহ্মবিবাহে মন্ত্রাদিপাঠ ও কন্যাদান ভিন্ন এক আসনে বসিয়া উভয়ে একই ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধন, এবং একযোগে সুসন্তান-কামনা ও পরস্পরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়; এবং তদ্দ্বারা স্ত্রীপুরুষের যে সম্মিলন বা একীকরণ, তাহা একই ধর্ম্মসাধন, একই লক্ষ্যস্থাপন ও একই প্রকার প্রতিষ্ঠা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সেহেতু হিন্দুদিগের সংস্কার-মূলক একীকরণ প্রকৃত একীকরণ, এবং সেই হেতু হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী সম্বন্ধস্থাপন। এ সংযোগে বিয়োগ নাই; এ "সাত পাক" চৌদ্দ পাকেও ফিরে না বা নষ্ট হয় না; ইহা ইহকালপরকাল-স্থায়ী—অনন্তকালব্যাপী। পৃথিবীতে আর কোনও দেশে বা

জাতির মধ্যে বিবাহ-বন্ধন এমন দৃঢ়, দূরগত ও পবিত্র হয় না।

যজুর্ব্বেদমতে পাণিগ্রহণের একটী মন্ত্রে আছে—"আমি লক্ষ্মীহীন, তুমি লক্ষ্মী; তোমা বিনা আমি শূন্য। তুমি আমার লক্ষ্মী। আমি সামবেদ, তুমি ঋক্‌বেদ; আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী। আমরা উভয়ে মিলিয়াই পূর্ণ।"

আর্য্যদিগের এই মহান্ ও গভীর ভাব য়িহুদীদিগের শাস্ত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে, ও সেই শা হইতে মুসলমান ও খৃষ্টান-শাস্ত্রেও সংক্রমিত হইয়াছে। উহারা সকলেই স্বীকার করে যে আদিমপুরুষের দেহ হইতে স্ত্রীদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেহেতু বিবাহ-বন্ধন দ্বারা স্ত্রীপুরুষের যে পুনরায় একীকরণ বা পূর্ব্বের দুই ঘুচাইয়া পুনরায় এক করা হয়, তাহার আভাসও উহাদের বিবাহব্যাপারে দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের শিক্ষায় রামপ্রসাদ মহাশাক্ত হইয়াও গাহিয়াছিলেন ঃ—

"নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী।"

রসিকপ্রবর রস আস্বাদন করিবার জন্য নিজ দেহ হইতে আধা ভাগ করিয়া রাধা-অঙ্গ সৃষ্টি করিয়া জগতে প্রেম-শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে—প্রথম অংশ—নবম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যেরূপ মধ্যে মধ্যে অবতার হন, লক্ষ্মীও সেই সময় তাঁহার সহায় হইয়া অবতীর্ণা হইয়া থাকেন। বিষ্ণু যখন বামন অবতার হইয়াছিলেন, তখনও

লক্ষ্মী পুনরায় কমলে উদ্ভূতা হন। বিষ্ণু যখন পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হন, তখনও লক্ষ্মী পুনর্ব্বার ধরণীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী শ্রীরামঅবতারে সীতারূপে, ও শ্রীকৃষ্ণঅবতারে রুক্মিণীরূপে, ও অন্যান্য অবতারেও বিষ্ণুর সহায় হইয়া অবতীর্ণা হন। বিষ্ণু যখন দেবরূপে অবতীর্ণ হন তখন লক্ষ্মী দেব-দেহ ধারণ করেন; এবং তিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইলে, ইনিও মানবীরূপে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বিষ্ণু যেরূপ দেহ অবলম্বন বা স্বীকার করেন, লক্ষ্মীও আত্মদেহ তদনুরূপ করিয়া থাকেন।"

সাধারণ নরনারী—স্ত্রী-পুরুষের—জন্মও সেইরূপ ভাবেই হইয়া থাকে।

দেহ ধারণ করিলেই দেহী—স্ত্রীপুরুষ—দুইভাগে অবস্থিত হন ও আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্ সেই দুইভাগ পরিণয়-বন্ধনে পতি-পত্নীরূপে একে পরিণত হয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজী উপন্যাস-লেখিকা মিস্ করেলি তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তকে ঐ ভাব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

হিন্দুর বিবাহে সেজন্য কাহার কে পতি বা পত্নী হইবেন, তাহা নির্ণয় করার কত বিধিব্যবস্থা আছে। জন্মগ্রহণ করিলেই তিথি নক্ষত্র আদি দেখিয়া রাশিচক্রদ্বারা জাতকের গণ, শারীরিক মানসিক গঠন, ও গুণাগুণ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে। নরনারী দেব, নর ও দেবারি বা রাক্ষসগণভুক্ত হন। দেবগণে দেবগণে, নরগণে নরগণে ও রাক্ষসগণে রাক্ষসগণে সাধারণতঃ মিলন উত্তম হইতে পারে। তাহার পর দেবগণ নরগণে মধ্যম

মিল হইতে পারে; কিন্তু দেবগণে দেবারিগণে বা নরগণে দেবারিগণে মিলন অধম হইয়া প্রায় বিয়োগ ও দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

স্ত্রীদেহের গঠনাদি দৃষ্টে সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ সূচিত হয়। পত্নী, পতির ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষলাভের মূল কারণ। পতির অতুল রূপ থাকিতে পারে, সর্ব্বত্র জয় থাকিতে পারে, বিশ্বব্যাপী যশঃ থাকিতে পারে, তাঁহার কেহ শত্রু না থাকিয়া তিনি অজাতশত্রু হইতে পারেন; কিন্তু পত্নী মনের মত না হইলে, তাঁহার সাংসারিক অপর শত সহস্র সুখ ও উন্নতির পথ মুক্ত থাকিলেও তাঁহার অনন্ত দুঃখের পথও মুক্ত হয়, ও তিনি পরম অসুখী বলিয়া আপনাকে বোধ করেন। সেইজন্য হিন্দু-ভক্ত বা সাধক এ সংসারে সকল সুখে সুখী হইবার জন্য ভগবতী জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করেন—(১) "হে মাতঃ, আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী মনোরমা ভার্য্যা আমাকে দিউন; আমাকে রূপ, জয়, যশঃ ও শত্রুনাশ প্রদান করুন।" সেইজন্য স্বামীর মনোবৃত্তি-অনুসারিণী ভার্য্যা নিরূপণ জন্য পাত্রী মনোনয়ন করার পক্ষে শাস্ত্রে এত বিধিব্যবস্থা আছে।

মনু বলিয়াছেন—হংস বা হস্তীর ন্যায় মৃদুগমনশীলা, সূক্ষ্মলোমকেশ, ও দন্তশ্রেণীযুক্তা ও কোমল ও অবিকল অঙ্গবিশিষ্টা স্ত্রীই বিবাহে প্রশস্তা।

---

(১) "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীং
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।
শ্রীশ্রীচণ্ডী: অর্গলাস্তোত্র।

শাতাতপ বলিয়াছেন—হংসের স্বরের ন্যায় স্বরযুক্তা, মেঘবর্ণা, ঈষৎ রক্তবর্ণআভাযুক্ত নয়নবিশিষ্টা কন্যাই গৃহস্থের সুখবৃদ্ধির কারণ হয়। যাহার রক্তপদ্মাভ চরণতল ভূমিতে সংলগ্ন থাকে, সেই স্ত্রীই শ্রেষ্ঠা। সুকেশী, সুদন্তা, সুশীলা, শোভনগতিযুক্তা, এবং যাহার লোম সকল সূক্ষ্ম, ভ্রূযুগল ও দন্তশ্রেণী সুদৃশ্য, এবং যাহার চক্ষু পদ্ম-পাপড়ির ন্যায় আয়ত, এবং যাহার কটিদেশ বোল্‌তার বা সিংহের মত সরু, সেই স্ত্রী সুলক্ষণসম্পন্না ও বিবাহযোগ্যা।

মনু আরও বলিয়াছেন কপিল বা পিঙ্গল-বর্ণা, অধিক অঙ্গুলিযুক্তা, অতি লোমাবৃতা, বাচালা, রোগিণী, এবং গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ভিন্ন নদী-নাম্নী, এবং মাধবী তুলসী ভিন্ন বৃক্ষ-নামিকা, এবং রেবতী, রোহিণী ও অশ্বিনী ভিন্ন নক্ষত্রনাম্নী, এবং মাতৃ-নাম্নী, পক্ষিনাম্নী বা ভীষণনাম্নী কন্যা বিবাহের অযোগ্যা।

কৃত্যচিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে যে টেরা ও বিড়ালাক্ষী, দুঃশীলা, হাস্যকালে যাহার গণ্ডদেশে গর্ত্ত বা ডোব হয়, সেই স্ত্রী বন্ধ্যা। ধৃষ্টা, কুদন্তা এবং যাহার কটিদেশ স্থূল বা যাহার পদ লোমযুক্ত, সে নারী বিবাহের অযোগ্যা।

আধুনিক সমাজে কেবলমাত্র পাত্রীর শারীরিক সৌন্দর্য্যে ও যৌতুকসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ বিবাহ যে কত কুফল প্রসব করিতেছে, তাহা সকলেই ভুক্তভোগী হইয়া হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। সংসার-সুখে অশেষভাবে সুখী হইবার উপায় হিন্দুশাস্ত্রকারগণ অতুল দয়া প্রকাশ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা-

দের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া, তাঁহাদের প্রদর্শিত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করিয়া, হিন্দুজাতি আজি চারিদিকে এত অবসন্ন। পাত্রপাত্রীর শুভাশুভ সম্বন্ধে ৮ প্রকার যোটক বিচার আছে—(১) বর্ণকূট, (২) বশ্যকূট, (৩) তারাকূট, (৪) যোনিকূট ইত্যাদি। নক্ষত্রবিশেষে জন্মিলে ঘোটক, মহিষ, সিংহ, হস্তী, মেষ, বানর, সর্প, হরিণ, কুক্কুর, গো, ব্যাঘ্র, বিড়াল, ইন্দুর ও নকুল যোনি হয়। মনুষ্য জাতির চরিত্রে সর্পের ন্যায় খল এবং কোন অপকার না করিলেও দংশন দ্বারা প্রাণনাশ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত, সিংহব্যাঘ্রাদি জন্তুর ন্যায় হিংস্র এবং মেষের ন্যায় নিরীহ ও উপরোক্ত অন্যান্য জন্তুর আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহে বিভিন্নপ্রকৃতির স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া যে অনেক সময় খাদ্যখাদক সম্বন্ধ বা অহিনকুলবৎ সর্ব্বদা কলহ ও মারামারি করার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা দেখা যায়। শাস্ত্রকারগণ সেই হেতু প্রকৃতির মিলনাদি বিচার করিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করার উপদেশ দিয়াছেন। সে উপদেশ অমান্য করিয়া সর্ব্বদা কুফল ফলিতেই দেখা যাইতেছে। প্রকৃতিগত বিভিন্নতাসত্ত্বেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে সতীত্বের গুণ-বিকাশের অবসর কোথায়? প্রকৃতি বা স্বভাবের নিকট কর্ত্তব্য-বুদ্ধির পরাজয়ই অধিক সময় দেখা যায়। পরন্তু জাগতিক ব্যাপারেও ঐরূপ অমিল ও অযোগ্য বিবাহের পর পাত্রের অমঙ্গল বা মৃত্যু হইলে, ঐ বধূকে “অলক্ষণা” বিবেচনায় তাহার বাল-বৈধব্যের কঠিনতম অনিষ্টের সহিত শাশুড়ি ননদআদির নিকট অশেষ অনাদর, অপমান, গঞ্জনা বা বর্জ্জনও মিশ্রিত হইয়া

সেই নববধূর জীবন দুঃসহ হইতে দেখা যায়। একটি ফুট-ফুটে টুকটুকে ছোট বৌ ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিবার ইচ্ছায় কেবল রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, পরিণামে অনেক সময় ঘর অন্ধকার হইয়া অনেক জীবনের সুখশান্তিদীপ নিবিয়া যে অনেক দিক্ অন্ধকারময় হয়, তাহার পরিচয় ও প্রমাণ অনেক সংসারেই দেখা যায়। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ এত থাকা সত্ত্বেও তাহার পালন ও আদর না করিয়া অনেক দুর্গতি হইলেও, কালের গতিকে শাস্ত্রে সম্মান ও বিশ্বাস সহজে আসিতে চাহিতেছে না। তখন অদৃষ্টের উপর গালিপাড়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। "ভাগ্য" বা "অদৃষ্টের" ন্যায় গালি খাইবার এমন শান্ত, নীরব পাত্র আর নাই।

জীবেব সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধানের জন্যই শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র না মানিয়া কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানকালে এত অমঙ্গলের সৃষ্টি। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিয়াও যদি কোনরূপ অমঙ্গল হয়, তখন নিয়তি বা বিধিলিপির শরণ লওয়াই উচিত। নিয়তিই ভগবানের ইচ্ছা। সু বা কুকর্ম্ম অনুসারে মঙ্গলময় বা অমঙ্গলময় ফললাভ ঘটিয়া থাকে সত্য,—সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে সত্য—তপস্যায় বরলাভ ঘটিয়া থাকে সত্য ; কিন্তু নিয়তি বা ভগবদিচ্ছাই সর্ব্বশেষ ফলদাতা। সেই ইচ্ছাবশেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপূ ঠিক তপস্যা করিয়াও অমর হইবার বর-লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মনুষ্যশক্তির উপর ঐ ভগবদিচ্ছা বা শক্তি সকল সময়েই যে কার্য্য করিতেছে তাহা বুঝা যায়। আপাতদৃষ্টিতে আমরা যাহাকে মঙ্গল বা অমঙ্গল বিবেচনা করি,

তাহাই প্রকৃত মঙ্গল বা অমঙ্গল নহে। সেইরূপ মঙ্গলের মধ্যে শত শত অমঙ্গলের বীজ, এবং সেই অমঙ্গলের মধ্যেও শত শত মঙ্গলের বীজ, লুক্কায়িত থাকে বা থাকিতে পারে। আমাদের প্রকৃত মঙ্গল বা অমঙ্গল সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতাই জানেন, ও তিনিই আমাদের কর্ম্মানুসারে ইচ্ছামত ফল দান করেন। তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করার সাধ্য কাহারও নাই। অদৃষ্ট—দৈব—বিধিলিপি বা নিয়তি, ভগবানের ইচ্ছা। আইনকর্ত্তারও নিজ কৃত আইন মানিয়া চলিতে হয়। তাহা না হইলে জগতের পিতা-মাতার পুত্র—সিদ্ধিদাতা গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গিয়া তাহাকে গজানন হইতে হইত না। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম রাবণ বধের জন্য। গুরু বশিষ্ঠদেব যে লগ্নে তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে স্বামী-স্ত্রী—সীতারামের জীবনে বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ছিল না। বিচ্ছেদ বা সীতাহরণ না হইলে রাবণ-বধ হয় না। সেইজন্য সেই ভগবদিচ্ছায় কার্ত্তিকেয় বিবাহ-সভায় নর্ত্তন দ্বারা সভাসদ্গণকে বিমোহিত রাখিয়া বিবাহের সে লগ্ন উত্তীর্ণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এবং যে লগ্নে বিবাহ হইলে বিচ্ছেদ বা সীতাহরণ বা রাবণ-বধ হইবে, তাহারই সংঘটন করিয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও সেই নিয়তির বশীভূত জীবন যাপন করিয়া কত কান্নাই কাঁদিয়া গিয়াছেন। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় প্রকৃত কোন অমঙ্গল হয় না—তাহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না এবং যাহা কিছু হয় তাহাই মঙ্গলের জন্য, —এই বিশ্বাস ও নির্ভর একমাত্র শান্তি-নিকেতন। রূপ গোস্বামীর মতে ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরই পরম পুরুষকার।

সধবা ও বিধবা জীবন।

এই সংসারের অসারত্ব বুঝাইবার জন্য এবং স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য পুরুষের মধ্যে যতী বা ত্যাগী সন্ন্যাসীর চিত্র ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং নারীর মধ্যেও ঐ চিত্র রাখার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি হিন্দুবিধবার পবিত্র মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। এ চিত্র আপাতদৃষ্টিতে বড় কঠোর ও বড়ই পক্ষপাত-দুষ্ট বলিয়া অনেকের হৃদয় স্পর্শ করিয়া করুণরসের উদ্রেক করে, এবং সে চিত্র সমাজ-পট হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য কত চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইতেছে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেন হইতেছে না ? মানুষের শত চেষ্টাতেও যখন কার্য্য সফল হয় না, তখন নিয়তি বা ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? হিন্দু-বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালন ও ইন্দ্রিয়সংযম যাঁহাদের অসাধ্য, তাহারা ঐ গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারেন। জোরজবরদস্তিটা সমাজ-শাসনের অতি হীন অঙ্গ। যাঁহারা ঐরূপ শাসনে নিজেদের বা সমাজের কোন হিত নাই মনে করিয়া সে শাসনের বশীভূতা না থাকিতে চাহেন, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। যাঁহারা তলাইয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহারা দেখেন যে ঐ কঠোরতার নিম্নস্তরে মনুষ্য-জীবন সফল করার উপায়—মুক্তিলাভের—অনন্ত সুখের প্রস্রবণ অতি গুপ্তভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এ পৃথিবীতে সুখের সহিত দুঃখ ও দুঃখের সহিত সুখ চিরদিনই বিজড়িত আছে। অমিশ্রিত সুখ বা দুঃখ জগতে নাই। সকল ইষ্ট-

লাভের সহিত কোনও অনিষ্ট, ও সকল অনিষ্টের সহিত কোনও ইষ্ট মিলিত হইয়া রহিয়াছে। এমন লাভ নাই যাহার সহিত লোকসান নাই; এমন লোকসান নাই যাহার সহিত লাভ নাই, বুদ্ধিমান্ তাহা বুঝিতে পারেন। বৈধব্য-জীবন ঘুচাইয়া পুনবায় সধবারূপে জীবন যাপন করিতে গিয়া ও সংসারে পুনরায় সধবা-জীবনে সুখী হইবার চেষ্টার পর প্রকৃত সুখী কি হইতে পারেন? পুনরায় বিধবা হইতে কি দেখা যায় না? সকল বিধবার জীবনই কি বড় দুঃখের? সকল সধবার জীবনই কি বড় সুখের? পতি-সঙ্গে আমিষ-আহারে ও পেড়ে সাড়ি ও সিন্দুর শাঁখায় কি সব সুখ নিহিত? সধবার মধ্যে কি দুঃখী নাই? তাহাদের মধ্যেও ত অনন্ত দুর্গতি, দুঃখ ও দৈন্য দেখা যায়। তবে? কুপতি, কুপুত্র, কুকন্যা,--রোগ, শোক, দৈন্য, হাহাকার ত সধবা-জীবনেরও নিত্য সহচর। যে নারী ঐরূপ কুপতি, কুপুত্র, কুকন্যা ও সন্তান-সন্ততির নিত্য রোগ, শোক, দৈন্য হেতু অশেষ দুর্গতি ও দুঃখ পাইলেন না, সেরূপ বিধবা কি সংসারে বড়ই অসুখী? বোধ হয় নহে।

বাহিরে চাক্‌চিক্য থাকিলেই সকল ধাতু স্বর্ণ হয় না। বাহ্যসুখের আবরণে সুখ নাই। মনের সুখশান্তিই প্রকৃত সুখশান্তি। কিন্তু সেরূপ সুখশান্তি কি বিরল নহে? তাহা কি সধবাদিগেরই একচেটিয়া? বোধ হয় নহে।

যে বৈধব্য-জীবনে ইন্দ্রিয়-সংযম ও মনঃ-সংযমের এত অবসর,—আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন যে বৈধব্য-জীবনে এত সহায়ক—সে জীবনে এক দিক্ ঘোর অন্ধ-

কারময় হইলেও সকল দিক্ অন্ধকারময় নয়। চঞ্চল মনকে সুস্থির করিবার উপায় দুইটি—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। শ্রীগীতায় (ষষ্ঠ অধ্যায়, ৩৫ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"হে মহা-বাহো অর্জ্জুন ! মন যে দুর্নির্ব্বার ও চঞ্চল, ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস দ্বারা ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে পারা যায়।" বৈধব্য-জীবনে সংসারে বৈরাগ্য সহজেই হয়, এবং শাস্ত্র-নির্দ্দেশমত জীবন যাপন করিয়া মনঃ সংযমের অভ্যাস লাভ করিবার অবসরও যথেষ্ট থাকে। সেরূপ জীবন কি যথার্থই ঘৃণ্য ? সংসারে এত অনুরাগযুক্ত ও মনঃসংযমের এত অনভ্যাসযুক্ত সধবার জীবনই কি ধন্য ? বোধ হয় নহে। বিষয়-প্রবৃত্তির বশে পুনঃ পুনঃ সংসার-পথে যাতায়াতই কি পরম সুখকর ও আরাধ্য ? নিবৃত্তি-মার্গে যাতায়াত শেষ করার পথ কি পরম অসুখকর ও ত্যাজ্য ? বোধ হয় নহে।

যে পুত্রকে প্রসবকাল হইতে কত অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিয়া—কত বিষ্ঠামূত্রপরিষ্কারের কষ্ট স্বীকার করিয়া রোগে অনিদ্রা অনাহারের অশেষ ক্লেশ পাইয়া- কত কষ্টে বড় করিয়া—"মানুষ" করিয়া- -দেখা যায় অমানুষ হইয়াছে, পুত্রবধূর পক্ষ লইয়া সেই পুত্র যখন মাতার সহিত অভদ্রোচিত দুর্ব্ব্যব-হার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, যখন কত আশা করিয়া বাঁধা সেই ঘর হতাশ-অনলে পুড়িয়া যায়,– সেই দুর্ব্বিসহ হতাশ ও অস-ম্মান অপমানের তপ্তশ্বাসের মধ্যে সেই সধবা পুত্রবতীর দুরবস্থা দেখিলে– অপুত্রবতী বিধবাকে অধিকতর ভাগ্যবতী বলিয়া মনে

করা যায় না? কোন বিধবা কি সেই সধবা পুত্রবতীর সহিত নিজ ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন? বোধ হয় নহে।

যদি কোন নর-পশু স্বামী, লম্পট পরপুরুষের হস্তে আপন স্ত্রীর দেহ বিক্রয় করিয়া, সেইরূপ লব্ধ অর্থে আপন উদর পূরণ ও সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই কলঙ্কিনী সধবা-জীবনের নরক-চিত্রের সহিত তুলনায় নিষ্পাপ স্বাধীন বিধবার জীবন কি স্বর্গের চিত্র নহে? মাত্র সধবাত্বই নারী-জীবনে আকাঙ্ক্ষার বস্তু নহে; সতীত্ব বা নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই নারী-জীবনে একমাত্র অতীব আদরের বস্তু। অসতী সধবা অপেক্ষা সতী বিধবা কি পূজ্যা নহেন? অসতী সধবার পাপ অসতী বিধবার পাপ অপেক্ষা শত গুণে নিন্দনীয় ও ক্ষমার অযোগ্য নহে কি? কারণ উহা কি সমাজের অধিকতর অমঙ্গলের কারণ নহে?

যদি কোন পাপাচারিণী সধবা নিজ সধবাত্বের দোহাই দিয়া, নানা পাপ-জলপানে উদর পূর্ণ করত কালে সেই পাপ-জল উদরে সাকার বরফ-মূর্ত্তি ধারণ করিলে, নিজ পতি-সূর্য্যের কিরণে সেই বরফ গালাইয়া জলে পরিণত করেন, বা সেই জল বাষ্প-রূপে উড়াইয়া দেন, এবং অবস্থাবিশেষে, সেই গর্ভের পিতৃত্ব নিরীহ নিজ স্বামীর স্কন্ধে চাপাইয়া ঘোর কপটতা ও সমাজ-হানিকর আচরণ করেন, তবে সে পাপিষ্ঠার সহিত কোন নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা বিধবা কি আপন ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন? ঐরূপ সধবার পাপ-জীবনের দুর্ভাগ্য কি পবিত্র বিধবা-জীবনের দুর্ভাগ্য অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক নহে? চরিত্রশীলা হিন্দু-বিধবার জীবন কি সমাজের অশেষ কল্যাণ-

কর নহে ? সমাজে হিন্দু-বিধবার চরিত্র-রক্ষা কি অসম্ভব ? কখনই নহে।

নিশ্চয়ই বিধবা ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র জীবন সমাজের আদর্শ। বিধবা চরিত্রহীনা হইয়া বহু-ধবা হইয়া সমাজের কণ্টক-স্বরূপ থাকার অপেক্ষা, পুনরায় এক-ধবা বা সধবা হওয়া ভাল। কিন্তু অনেক বিধবাই বিশুদ্ধ জীবন যাপন করেন, এবং তাঁহাদের জন্য অনেকের চক্ষুতে জল দেখা গেলেও, তাঁহাদের চক্ষে পুনর্ব্বিবাহের জন্য জল পড়ে না। সেই বিশুদ্ধ-চরিত্রা সমাজের অশেষ কল্যাণকারিণী বিধবাগণের জন্যই হিন্দুর সদাচার ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম এখনও লোপ না পাইয়া এখনও পুরোহিত বাড়ীর মধ্যে যাইতে পাইতেছেন। তাহাদের অভাবে বোধহয় সমুদায় ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ পাইবে। সেইজন্যই বোধহয় ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে না ও একেবারে লোপ পাইবে না।

কন্যা বিধবা হইলে— বিশেষতঃ বালিকা বয়সে হইলে, পিতামাতার পক্ষে তাহা শক্তিশেল হয়। সে শেল বক্ষ বিদীর্ণ করে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাও ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত হয় না। বোধহয় বিধবা কন্যার সহিত পিতামাতাও কুপ্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, ইহা ভগবানের ইচ্ছা হয়, ও সেই জন্যই ঐরূপ কারণ সংঘটিত হয়। পরন্তু সংসারে আর্ত্ত বা কাতর পুণ্যবশেই হয়। আর্ত্তি বা কাতরতা না দিলে সংসার-মদিরার নেশা ছুটে না— মোহ কাটে না। তাই ভগবান্ শ্রীগীতায় (সপ্তম অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে)

বলিয়াছেন—'হে অৰ্জ্জুন! চারি প্রকারের সুকৃতিশালী বা পুণ্যবান্ লোক আমার ভজন করে; (১) আর্ত্ত, (২) জিজ্ঞাসু, (৩) অর্থপ্রার্থী এবং (৪) জ্ঞানী।"

ভগবান্ এমনই ঈর্ষাপরবশ প্রেমিক যে তাঁহাকে ডাকাইবার জন্য—সংসার-ঘুমের ঘোর ভাঙ্গাইয়া জাগাইয়া দিবার জন্য—তিনি ফুলের মত কোমল প্রাণ হইলেও বজ্র অপেক্ষা কঠিন হইয়া কত প্রাণে কত শক্তিশেলই হানেন। তাঁহার ইচ্ছায় আবার গন্ধমাদন হইতে বিশল্যকরণীও আসিয়া সেই ক্ষতে প্রলেপ পড়ে। সেহেতু আর্ত্তি সকল সময়ে অমঙ্গলই সূচনা করে না। বৈধব্য-জীবনের কঠোরতার মধ্যে কত সুখ শান্তি পাইবার ও আত্মোন্নতিসাধন করিবার সুযোগ বিদ্যমান থাকে। ঐ অবস্থা না হইলে সে সুখশান্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

শাশ্বতধৰ্ম্মগোপ্তা সনাতন পুরুষের সনাতনহিন্দু-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণের প্রণালী অদ্ভুত; কালচক্রে আবার তাহার কতই প্রকারান্তর দৃষ্টিগোচর হয়; দৃষ্টিও কত প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন, দৃষ্টির আবরণও কত প্রকার দিয়াছেন। মনুষ্যের জীবন—বিশেষতঃ সনাতন ধৰ্ম্মের উপাসক হিন্দুর জীবন—যে অলীক স্বপ্ন মাত্র নহে, তাহা যে জাগরণের জন্যই, তাহা যে কালনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার জন্য—এবং এই জগৎ বা জাগতিক ব্যাপার সকল বাহ্যদৃষ্টিতে যাহা, অন্তর্দ্দৃষ্টিতে যে প্রকৃত তাহা নহে, ইহা ভগবৎকৃপায় সে দৃষ্টিলাভ হইলেই, জানিতে, বুঝিতে বাকী থাকে না।

পতি-গঙ্গা।

কলিযুগে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠতম তীর্থ, ইহা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। কাশীখণ্ড—ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে "সত্য যুগে তীর্থ সর্ব্বস্থানেই ছিল। ত্রেতা যুগে পুষ্কর পরম তীর্থ; দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ, এবং কলিযুগে কেবল গঙ্গাই তীর্থ।" "সত্যযুগে ধ্যান বা ঈশ্বর চিন্তা বা আত্মজ্ঞান মোক্ষের উপায়, ত্রেতা যুগে উহা ও তপস্যা, দ্বাপরে ঐ দুইটি ও যজ্ঞ, এবং কলিযুগে কেবল গঙ্গাই মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়।" "কলিকালে কলুষিতচিত্ত, পাপদ্রব্যরত, বিধিহীনক্রিয়াযুক্ত ব্যক্তিগণের গঙ্গা বিনা আর গতি নাই।" স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে—"কলিকালে বিশ্বেশ্বরই পূজ্য দেবতা, কাশীধামই আশ্রয়, ভাগীরথী গঙ্গাই তীর্থ এবং দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

সেহেতু এই ঘোর কলিতে (মাত্র পাঁচ হাজার বর্ষে যেরূপ ঘোর হইয়াছে, বাকি চারি লক্ষ সাতাইশ হাজার বর্ষে যে কি অঘোর- বিঘোর—বীভৎস হইবে তাহা অনুমানেরও অতীত) হিন্দুনারীর পতিই গঙ্গা। সেই পতিরূপ গঙ্গাই তাহার এক মাত্র গতি ও মুক্তির উপায়। এই কলিকালে ধার্ম্মিকদিগের বিশেষ সুবিধা; পাপী দেখিলে কেবল সেই পাপীকে পরিত্যাগ করিলে চলে; সত্যযুগের ন্যায় পাপীর যে দেশে বাস, সে দেশত্যাগের দরকার হয় না; ত্রেতাযুগের ন্যায় সে গ্রামত্যাগের দরকার নাই; দ্বাপর যুগের ন্যায় পাপীর বংশমাত্রই ত্যাগের দরকার নাই। এখন সেই মাত্র পাপীকেই ত্যাগ করিলেই চলে যে ধর্ম্মকর্ম্মের ফললাভজন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কত

বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন তাহার জন্য মন্ত্র অহোরাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুযোগ অন্বেষণকারীর এ সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নহে। তাই বলি- হে ভারতললনাকুল! আত্মদান অপেক্ষা দান নাই—আত্মবলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি আর নাই। এই কলি কালে একবার আপনারা আপনাদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব ভুলিয়া এই পতি-গঙ্গায় আত্মসমর্পণ করুন। পূর্ব্বকালের সতী-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আর একবার আপনারা সমস্বরে - তার- স্বরে সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া বলুন---

"ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে।"

অর্থাৎ হে পতিদেব! ত্রিভুবনে তুমিই আমার সার, তুমি পৃথি-বীর শোভাময় হার; আমি পৃথিবী ছাড়া নহি, তুমি আমারও কণ্ঠহার হও। এ সংসারে তুমিই আমার গতি।

পুনরায় আর একবার বলিতে আরম্ভ করুন -

"তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।"
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীনস্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ॥

অর্থাৎ হে স্বামিন্! তোমার তীরই বৈকুণ্ঠ, তোমার তীরের নিকটও বৈকুণ্ঠ; যে তোমার তীরে বা নিকটেও থাকিতে পারে, সে সশরীরে বৈকুণ্ঠেই বাস করে। তোমার এই জলে কচ্ছপ কিম্বা মৎস্য হইয়া থাকাও ভাল: তোমার তীরে দুর্ব্বল শরট বা কেঁকলাস হইয়া থাকাও ভাল; অথবা তোমা হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে দরিদ্র চণ্ডাল হইয়া থাকাও ভাল, কিন্তু

তোমা হইতে দূর দেশে নৃপতিবংশাবতংস—রাজচক্রবর্ত্তী হওয়াও ভাল নহে ; অর্থাৎ তোমার গৃহে দাসীবৃত্তিও শ্রেয়ঃ, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া পিত্রালয়ে বা অন্যত্র রাজসুখও তুচ্ছ।

পুনরায় একবার বলুন—

"ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে।"—হে হৃদয়নাথ! তোমার চরণে ইন্দ্রমুকুটও লুণ্ঠিত হয় ; তোমার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ ভালবাসার তুলনায় ইন্দ্রত্বও তুচ্ছ।

আর একবার স্মরণ করুন—মনে রাখুন—

"যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবন্তি সদা সুখমুক্তিঃ।"

অর্থাৎ এই পতি-গঙ্গায় ভক্তি যাঁহাদের বিদ্যমান, পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ও মুক্তি তাঁহাদের করতলগত।

এই পতিগঙ্গাভক্তির খরস্রোত পুনরায় এই ভারত-মরুভূমিতে প্রবাহিত করুন। জননীগণ! সতীত্বের রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ধরায় বিচরণ করুন ; আবার সতীত্বে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করুন ; নিজের জীবন ধন্য করুন, পতির জীবন ধন্য করুন ; জগৎকে ধন্য করুন, দেশকে ধন্য করুন। জগতের চক্ষুতে আবার আপনাদিগের গতপ্রায় গৌরব অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহতভাবে রক্ষা করুন,—আবার ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন। আবার নিষ্কলঙ্ক সতীতেজে জগৎ আচ্ছন্ন করুন, জগৎ আবার স্তম্ভিত হইয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী আপনাদিগের পাদপদ্মে মস্তক অবনত ও লুণ্ঠিত করুক।

মাতৃগণ! ভুলিবেন না, আপনাদের এ পতি-গঙ্গার উদ্ভবও সেই হরি-পাদপদ্ম হইতে,—এ গঙ্গাও "পারাবারবিহারিণী"—

ভবপারাবারের একমাত্র কাণ্ডারী। এ গঙ্গাও সেই মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর দ্বারা ধৃত। এ গঙ্গাও "কল্পলতামিব ফলদাং লোকে" অর্থাৎ ইহলোকে কল্পতরুর ন্যায় ফলদান করিতে পারে। হইতে পারে এ গঙ্গায় পাশ্চাত্যশিক্ষার কুসংসর্গে—স্বধর্ম্মে অনাস্থা ও পরধর্ম্মে আস্থা আদি কলুষ-কালিমার তীরস্থ কল-কারখানার দূষিত ও অপবিত্র ধারা আসিয়া পতিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কি গঙ্গাজল কখনও অপবিত্র হয়? এ জলের পবিত্রতা নষ্ট করিবার সাধ্য কিছুরই নাই। বরং যতই অপবিত্র হউক না কেন, ইহার সংস্রবে তাহা পবিত্রীকৃত হইয়া যায়। এ জল বহু বৈজ্ঞানিক বহু প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন পৃথিবীর যাবতীয় নদীজল অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। এ জল যতদিন রাখুন, ইহাতে দূষিত বীজাণু বা কীট জন্মে না। সুতরাং এ জলের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান না হইয়া, শাস্ত্রবচনে আস্থা ও সম্মান দেখাইয়া, ইহা আবার শিরোধার্য্য করুন। দেখিবেন—

"গঙ্গাস্তবমিমমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং।"

যিনি অমল—পবিত্র—এই পতি-গঙ্গাস্তব নিত্য পাঠ করেন, তিনি ভূলোক, ভুবর্লোক কেন, সত্যলোক পর্য্যন্ত জয় করেন।

পুনরায় প্রত্যক্ষ করিবেন—

"যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।"

অর্থাৎ এই পতি-গঙ্গার সুবিমল ভক্তি-ধারা যাঁহাদের হৃদয়ে প্রবাহিত, তাহারা ইহকালে অশেষ সুখভোগ ও পরকালে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

জননীগণ! সুখের আশায় ত কত আয়াস প্রয়াস পাইয়া

থাকেন, কিন্তু তৃপ্ত মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় ক্রমাগত দূর হইতে দূরেই সরিয়া যায় হস্তগত বা ভোগ্য হয় না—সুখ ত পাওয়া যায় না, একবার পতি-পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলুন—

'আমি সকল দুয়ার ঘুরিয়া ফিরিয়া
তোমার দুয়ারে এসেছি।
সকলের কাছে লাঞ্ছিত হ'য়ে
তোমারে ভালবেসেছি।'

দেখিবেন সুখ-শান্তি হৃদয়ে ধরিবে না, উথলাইয়া পড়িয়া দেশে বহিয়া যাইবে। সকল অশান্তি জ্বালা পলাইয়া যাইবে, বিমুক্তি করতলগত হইবে।

মরমে মরমে বুঝিবেন

"সঙ্গাস্মোরমিদং প্রবসারং বাঞ্ছিতফলদং বিদিতমুদারং।"

এই পতি-সঙ্গাস্মৃতি ও ভক্তি ভবসংসারে সার বস্তু, আর সকলই অসার, ইহা অতীব শ্রেষ্ঠ বস্তু—এবং অভীষ্ট বা অভিলষিত ফলপ্রদানে জগৎবিখ্যাত। ইহা অতীব ললিত—অতীব মধুর অতীব সুন্দর। শাস্ত্রের শিক্ষায় ভ্রম নাই, ভক্তিশাস্ত্রের ফল অভ্রান্ত সত্য। বিশ্বাস করুন--প্রতারিত হইবেন না। অতীত সতী-জীবনই তাহার সাক্ষী, ধর্ম্ম তাহার সাক্ষী—ধর্ম্মের জয় ভিন্ন পরাজয় অসম্ভব

হিন্দু পতি-পত্নী।

হিন্দু স্ত্রীর চক্ষুতে স্বামী মানুষ নহেন—স্বামী দেবতা। এই পতি-পদে দেবতার ন্যায় পূজা-দান সতী-নারীর জীবনের এক-মাত্র ব্রত বা ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। যে স্ত্রী

স্বামী-সেবাই পরমধর্ম্ম এই জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাহার শরণাগত হইয়া স্বামীকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা তুষ্ট ও তৃপ্ত রাখেন, সেই স্বামী এই সংসারের সর্ব্ব ভয়—সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি দিতে পারেন। কারণ স্বামীই তখন স্ত্রীর নিকট স্বয়ং ভগবান্ হইয়া থাকেন। ইহা শাস্ত্র সঙ্গত। সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা শ্রীগীতায় (১৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন- "সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার আশ্রয় লও; আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।" পতিব্রতা রমণীর নিকট পতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ও পতি-সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুতরাং পুরুষ শাক্ত, বৈষ্ণব—যে মতাবলম্বীই হউন,—যে দেবদেবীকেই ইষ্টজ্ঞানে আরাধনা করিয়া নিজের মুক্তির পথ প্রশস্ত করুন,—সাকার নিরাকার যে ভাবের উপাসকই হউন, সাধ্বী স্ত্রীর পতিই ইষ্টদেবতা—পতিই গুরু; পতিই তাঁহাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিদানে সমর্থ। স্ত্রীর আত্মাকে স্বামী বিবাহ দ্বারা আত্মসাৎ করেন, এবং বিবাহ-মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীর আত্মার শক্তি, আশ্রয়-স্বরূপ পতির আত্মার শক্তিতে মিশিয়া গিয়া পুরুষকে পূর্ণতা লাভ করায়; এবং বিবাহের পর সেইজন্য স্ত্রীর আর স্বতন্ত্রতা থাকে না, এবং ব্রত যজ্ঞ উপবাসাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান যাহা কিছু, স্বামীই করেন, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপা স্ত্রী তাঁহার কৃত সুকর্ম্মসমূহের অংশীদারভাবে তাহাদের ফল প্রাপ্ত হন। পতি-পদই সতীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রাপ্তির প্রস্রবণ। পতির পক্ষে ভব-রোগ-শান্তির জন্য ভব-বৈদ্য ভগবানের যে কোন রূপ বা

যুক্তির শরণাগত হইয়া তিনি রোগমুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু পত্নীর পক্ষে নিজ স্বামী ভিন্ন অন্য "ভব-বৈদ্য" আর নাই। পত্নীর ভব-রোগ পতি-ভব-বৈদ্য ভিন্ন অপর কোন দেবতা সারাইতে পারেন না; সে ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা স্বামী ব্যতীত অপরে জানেন না। স্ত্রীর নিকট স্বামীই ঈশ্বর। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং"। পতি-রূপ ভগবান্ তুষ্ট থাকিলে সমগ্র জগৎ তুষ্ট থাকে। পতি-সেবা-পরায়ণা সতীর দেহ আদি মহাভক্ত মহারাজ অম্বরীশের ন্যায় ভগবানের সুদর্শন চক্র সতত রক্ষা করিতেছে। ব্যাধগীতা আদিতে তাহার অনেক উদাহরণ আছে।

মহামায়া ভগবতী—নিজমূর্ত্তি—মাতৃমূর্ত্তি—মাতৃজাতি নারী-জাতির প্রতি অশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াই তাহার পরিত্রাণের জন্য পতিকেই একমাত্র কর্ত্তা করিয়া দুর্গম পথকে সুগম করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "দেবী চৌধুরাণীতে" তাহার আভাস দিয়াছেন। "প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই তাই বলিতেছ। স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।' * * * * বয়স্যা বলিল—'শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেননা, তার রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।' এ যুবতী ভবানী-ঠাকুরের চেলা—কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্মপ্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পুরিতে পারি না, কিন্তু সান্তকে পারি। তাই

অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎ-পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।'

স্বামীকে "প্রথম সোপান" বলিয়াছেন, যেন দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি সোপান আরও আছে। স্ত্রীর পক্ষে "ঈশ্বরে আরোহণের"—মুক্তিরাজ্যে প্রবেশের—স্বামী ভিন্ন দ্বিতীয় সোপান বা দ্বার আর নাই; স্বামীই প্রথম ও শেষ—অদ্বিতীয় সোপান বা দ্বার। যে স্বামী তাঁহার "হৃৎপিঞ্জরে" শিক্ষা দীক্ষা আদি দ্বারা সেই অনন্ত ভগবানকে অন্তর্যুক্ত করিয়া বা অনন্তভবেই পূরিয়াছেন,—জ্ঞান-সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ যাঁহার হৃদয় আলোকিত করিয়াছে,—ভক্তি-চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ যাঁহার হৃদয়-শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, আন্তরিক সেবা ভক্তি দ্বারা স্ত্রী স্বামীর সেই হৃদয়-দ্বার কিঞ্চিৎমাত্র খুলিতে পারিলেই তাঁহার সেই হৃদয়ের ধনে ধনী হইবেন—তাহাতে বিচিত্রতা কি? ইহা কিন্তু অনায়াসসাধ্য নহে। স্বামীর কত আয়াস-লব্ধ ধন,—স্ত্রীরও কত আয়াস-লব্ধ ধন। স্বামী বহুলায়াসসাধ্য জ্ঞান লাভের দ্বারা জগৎস্বামীর অস্তিত্বে নিজ অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া যে ধনলাভ করিয়াছেন,—"যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" সূত্রে যে আত্মজ্ঞানধন লাভ করিয়াছেন,—স্ত্রী আপন স্বামীর অস্তিত্বে নিজ অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া সে ধনের অংশ পাইয়া থাকেন। আত্মদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; কি মানুষের

কাছে, কি ভগবানের কাছে—আত্মবলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি। ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ভাব বা পাপ-বেদীর সম্মুখেও যখন ঐ আত্মদান ঘটে, তখন তাহাও অসচ্চরিত্র নরনারীর মধ্যে অনেক সময় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া থাকে। সে দানের মূল্য সৎ অসৎ সকল লোকই হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোহিত হয়। তবে সৎভাবে—সাধুভাবে—ধর্ম্মসঙ্গতভাবে সে দানে যিনি দাতা, সে বলিদানে যিনি বলী, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে দান ও বলির দক্ষিণা বা পুরস্কারও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—দেবতা-দুর্ল ভ। তাহার মহিমা বর্ণনাতীত।

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় (সপ্তম অধ্যায়ে ২১।২২ শ্লোকে) বলিয়াছেন—"যে যে ভক্ত দেবতারূপ আমার যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই সেই ভক্তে সেই সেই মূর্ত্তি-বিষয়ক তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি। সেই ভক্ত সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধনা করে; এবং সেই সেই দেবতার অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমা কর্ত্তৃক বিহিত সেই সকল কামনা বা সিদ্ধি সেই সেই দেবতাবিশেষ হইতে লাভ করে।"

তিনি শ্রীগীতায় (নবম অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে) আরও বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধাযুক্ত ও ভক্ত হইয়া যাঁহারা অন্য দেবতাও ভজনা করেন, তাঁহারা আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক, অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক বিধি বিনা) ভজনা করেন।"

সুতরাং সাধ্বীস্ত্রীর পক্ষে দেবতাজ্ঞানে পতিভক্তি ও সর্ব্বান্তঃকরণে পতিসেবা সর্ব্বফলপ্রাপ্তির হেতু; ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না; উহা শাস্ত্রসঙ্গত।

সতীত্ব।

মনুষ্য-জীবন কর্ত্তব্য-কার্য্যের সমষ্টি। কর্ত্তব্য অর্থে করণীয়—যাহা করা উচিত। আপনার প্রতি, অপরের প্রতি ও জগতের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন জন্যই মনুষ্য-জন্ম-গ্রহণ।

বিবাহ-বন্ধনের পর, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কি, তাহা শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই নির্দ্দেশ অনুসারে চলিলেই উভয়ের জীবনধারণের উদ্দেশ্যই সফল হয়। ব্রহ্ম-আকাশে উড়িয়া যাইবার জন্যই হিন্দু-নরনারীব এই সংসার-কর্ম্মভূমিতে আগমন। স্বামী ও স্ত্রী একই পক্ষীর দুইখানি পক্ষ; এক পক্ষে ভর দিয়া উড়া যায় না; উভয় পক্ষ সবল সুস্থ ও পরস্পরের সাহায্যকারী না হইলে ও থাকিলে কার্য্য হয় না। সুতরাং কোনও এক পক্ষ যদি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া অপর পক্ষকে কর্ত্তন করিয়া বা বাদ দিয়া উড়িতে যান, তবে পতন অনিবার্য্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে---

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়ানাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কার্য্য না করা হেতু ও শাস্ত্রগর্হিত কার্য্য করা হেতু, এবং ইন্দ্রিয়-সংযম না করা হেতু মনুষ্যের পতন হয়। সেহেতু পতন হইতে রক্ষা পাইতে হইলে স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষই সবল, সুস্থ ও সতত পরস্পরের সহায়ক হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রীলোকের মনের ও দেহের স্বাভাবিক কোমলতা ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলতা থাকায় বৃক্ষ লতা ও পশুপক্ষী আদির মধ্যেও স্ত্রীজাতির পুরুষের অধীনতা ও স্বতন্ত্রতা লাভের

অনুপযুক্ত ভাব স্বাভাবিক। এজন্য মনু শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং॥"

অর্থাৎ স্ত্রীজাতি বাল্যে ও কৌমারে বা বিবাহের পূর্ব্বে পিতামাতা আদি গুরুজনগণের, বিবাহের পর যৌবনে স্বামীর, ও বার্দ্ধক্যে ও বিধবা হইলে পুত্রাদি অভিভাবকগণের বশীভূতা হইয়া থাকিবেন। তিনি কখনই স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বাধীনতা-অবলম্বন করিবেন না।

বিবাহের পর স্ত্রীজাতির যে সকল নাম হয়, তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে অনেক সময় তাঁহাদের স্বরূপ বা কর্ত্তব্য সূচিত হয়। যথা—

বধূ—বধূ অর্থে সূচিত হয় যিনি সেবাশুশ্রূষা ও গৃহকর্ম্ম দ্বারা পতিকে বন্ধন বা বশীভূত করেন; সেইজন্যই বধূ নাম হয়।

ভার্য্যা—ধারণীয়া বা ভরণীয়াভাবে পুরুষের আশ্রয়ে থাকেন বলিয়া ভার্য্যা নাম হয়।

স্ত্রী—পতির দোষ থাকিলে বা দেখিলে তাহা আচ্ছাদিত বা ঢাকিয়া গোপন রাখেন বা তাহা প্রকাশ করিয়া স্বামীর গৌরবের হানি করেন না বলিয়া স্ত্রী নাম হয়।

পত্নী—বিবাহিতা স্ত্রী; বিবাহিতা না হইলে পত্নী বলে না।

ধর্ম্মপত্নী—ধর্ম্মের সহায়তার জন্য যিনি পত্নী, বা যিনি পতির ধর্ম্মসাধনের সহায়তাকারিণী, তিনি ধর্ম্মপত্নী। "প্রথমা

ধর্ম্মপত্নী চ দ্বিতীয়া রতিবৰ্দ্ধিনী।" অর্থাৎ প্রথমা স্ত্রীই ধর্ম্ম-পত্নী, অপর স্ত্রী রতিবৰ্দ্ধিনী।

সহধর্ম্মিণী—অর্থাৎ সহধর্ম্মচারিণী, ভর্ত্তার সহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারিণী। শাস্ত্রসঙ্গতভাবে সন্তানোৎপাদন ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত। "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।" পুত্র উৎপাদনের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন, এবং পিণ্ডপ্রাপ্তির জন্যই পুত্রের প্রয়োজন। পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্র নাম।

পতিব্রতা—বিবাহের সময় যে উভয় পক্ষের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ উভয়ের আত্মা বা হৃদয় একতাসূত্রে আবদ্ধ হইল, উভয়ের কর্ত্তব্য পালন দ্বারা উভয়ের সহায়তা করিতে হইবে ইত্যাদি, তাহা যিনি লঙ্ঘন করেন না, তিনি পতিব্রতা।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

> "পারুষ্যাণি চোক্তা যা দৃষ্টা বা ক্রুদ্ধচক্ষুষা।
> প্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা॥"

অর্থাৎ স্বামী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধভরে চাহিলে বা রূঢ়-বাক্য প্রয়োগ করিলেও যে নারী স্বামীর উপর ক্রোধ না করিয়া হাস্যমুখে শান্তনয়নে চাহিয়া থাকেন, তিনিই পতিব্রতা নারী।

সাধ্বী—

> পতিং যা নাভিচরতি মনোবাক্‌কায়সংযতা।
> সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে স্ত্রী সংযতা থাকিয়া মন বা চিন্তাদ্বারা, বাক্যদ্বারা, কায় বা নিজ শরীরদ্বারা স্বামীর প্রতিকূল আচরণ করেন না,

সাধুগণ তাঁহাকে সাধ্বী বলেন। পুরুষের পক্ষে পিতৃলোক-আদি প্রাপ্তি যেরূপ কাম্য, নারীর পক্ষে পতিলোক বা ভর্তৃ-লোকপ্রাপ্তিও সেইরূপ কাম্য। পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী পতি-লোক বা ভর্ত্তৃলোক পাইবার অধিকারিণী হন।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥"

অর্থাৎ যে পতিব্রতা রমণী স্বামীর দুঃখে দুঃখ, ও স্বামীর সুখে সুখ অনুভব করেন, এবং স্বামী বিদেশে থাকা কালে মলিন ও কৃশ ভাব ধারণ করেন বা ভোগ-সুখ ত্যাগে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহাকে সাধ্বী বলে।

মনু (৫ম অধ্যায়, ১৫৪ শ্লোক) বলিয়াছেন -

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিত।
উপচর্যাঃ স্ত্রীয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ ॥"

অর্থাৎ পতি চরিত্রহীন, কামপ্রবৃত্ত, গুণহীন বা বিদ্যাবুদ্ধি-বিহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী পতিকে সতত দেবতার মত সেবা করিবে।

জায়া—

'পতি ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহজায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ ॥" বা
"তজ্জায়া জায়াভাতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ।"

অর্থাৎ যাহাতে মনুষ্য অপত্যরূপে জন্মে। ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয় এবং পুত্র রক্ষিত হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে পুত্র-

রূপে জন্মগ্রহণ করে। এইজন্য পণ্ডিতগণ ভার্য্যাকে জায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জামি, জামী বা যামি, দার, উঢ়া প্রভৃতি শব্দেও এরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থও আছে।

বিবাহ -অর্থে পরস্পরের মিলন। বিবাহ ও উদ্বাহ আদি শব্দের যোগার্থ দ্বারাও স্ত্রীর আত্মাসহ মিলিত হইয়া স্বামীর আত্মার উর্দ্ধগতি বা ঈশ্বর-সন্নিধানে গমন সূচনা করে, এবং বিবাহ দ্বারা উভয়ের আত্মার মিলনবোধক "দম্পতি" বা "জায়াপতি" ইত্যাদি নাম প্রদত্ত হয়।

প্রাচীনকালে এই সতী-ধর্ম্ম কোন বই পড়িয়া শিখিতে হইত না। ইহা পুঁথিগত বিদ্যা বা ধর্ম্ম নহে। তখন বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাগণ বাল্যকালের ব্রত নিয়মাদি পালন করিত, ও নিজ পিতামাতা প্রভৃতির ধর্ম্ম-জীবন চাক্ষুষ দেখিয়া, এবং স্বীয় সুকর্ম্মজনিত সুস স্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহারাও ঐ সকল আদর্শ দেখিয়া সতী-ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতেন, এবং তাহা পালন করিতেন। ঐরূপ সতীধর্ম্মপালন তখন স্বভাবেই হইত; তজ্জন্য কোন চেষ্টা বা বিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন ছিল না। অসতী কাহাকে বলে তাহা জানাও সম্ভব ছিল না; —যেদিকে চাহিতেন, আত্মীয়া পবিত্রা সতীগণের ছবি দেখিতে পাইতেন। যৌথপরিবারে কত আত্মীয়া থাকিতেন, সকলেই সতী-সাধ্বী—পতিব্রতা রমণী ছিলেন। তাঁহাদের জীবন্ত—জ্বলন্ত ছবিই বালিকার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত এবং সেই সদ্-দৃষ্টান্ত পরম শিক্ষক ছিল। সুদৃষ্টান্ত অপেক্ষা সুশিক্ষক আর

নাই, এবং কুদৃষ্টান্ত অপেক্ষা কুশিক্ষকও আর নাই। সুতরাং সেকালে কুদৃষ্টান্ত চক্ষুতে পড়ার অবসর কম ছিল। যে অবরোধ-প্রথার কতই কদর্থ করা হয়, এবং পুরুষের ন্যায়পরতার অভাব ও অত্যাচারমূলক বলিয়া কথিত হয়, সেই অবরোধ-প্রথা কত কুদৃষ্টান্ত হইতে বালিকা ও রমণীগণকে যে রক্ষা করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সৎ অর্থে যাহা আছে বা সত্য বুঝায়। সাধারণতঃ সৎ শব্দে উত্তম, শোভন বা ভাল বুঝায়। পুরুষ "সৎ" বা "অসৎ" বলিলে নানা ভাবের গুণ বা দোষ সূচনা করে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে "সৎ" বা "অসৎ" শব্দ প্রয়োগ করিলে যে "সতী" বা "অসতী" শব্দ হয়, তাহাতে বিশেষ একটি গুণ বা দোষ সাধারণতঃ বুঝাইয়া থাকে। সেহেতু সতী স্ত্রী অর্থে সাধ্বী পতিব্রতা রমণী বুঝায়, এবং অসতী অর্থে পরপুরুষগামিনী,—কুলটা বা বেশ্যা বুঝায়।

১। (ক) অতীত আদর্শ নারী।

১। সতী দেবী।

সতী শব্দ যাঁহার নাম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে,—হিন্দু-নারীর সতীত্ব-কিরণ যাঁহার সূর্য্যসম অঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে পূর্ণ বিমল আলোকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে,—যে আলোক কখনও নির্ব্বাপিত বা নিস্প্রভ হইবে না বলিয়া এই ভারতবর্ষে সকল স্থানে ব্যাপৃত থাকিয়া সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিতেছে ও সতীত্বের জ্বলন্ত চিত্র ভারত-মহিলার হৃদয়ে ফুটাইয়া রাখিয়াছে,—সেই শিবজায়া সতীই অতীতে ভারতের প্রধান আদর্শ ছিলেন বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ মনুকন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে ষোলটী অপরূপ সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা উৎপন্ন করেন। তাহার মধ্যে ১৩টী ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে, একটী যাবতীয় পিতৃগণকে ও অন্য একটি মহাদেবকে সম্প্রদান করেন। মহাদেব সতীনাম্নী দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

কথিত আছে পূর্ব্বকালে বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞে দেবগণ, সানুচর মুনিগণ ও অগ্নিগণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। সেই সময় প্রজাপতি দক্ষ সেই সভায় গমন করেন। সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে দেখিয়া নিজ নিজ আসন হইতে অগ্নিসহ উত্থিত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। কেবল ব্রহ্মা ও শিব নিজ নিজ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না। দক্ষ লোকগুরু ব্রহ্মাকে নমস্কার

করিয়া তাঁহার আদেশ লইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। শিব তাঁহার জামাতা হইয়াও তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন না দেখিয়া তিনি ক্রোধভরে তাঁহাকে অনেক কটূক্তি করেন, এবং ক্রোধে জলস্পর্শ করিয়া শিবকে দেবতাদিগের যজনসময়ে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইবার অভিশাপ দেন। শিবের অনুচরগণের প্রধান—নন্দীশ্বর—দক্ষকে ও যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ সভায় থাকিয়া দক্ষের বাক্য অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অভিশাপ দেন। তাহাতে ভৃগু ব্রহ্মদণ্ডরূপ কঠোর অভিশাপ দেন। মহাদেব পরস্পর ঐরূপ শাপে সকল পক্ষের বিনাশ বিবেচনা করিয়া নিজ অনুচরগণের সহিত বিমনস্কভাবে তথা হইতে প্রস্থান করেন। তৎপরে বিশ্বস্রষ্টাগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হরির পূজা করিয়া সেই যজ্ঞের সহস্র বৎসর কাল সম্যক্-প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেন, এবং পবিত্র প্রয়াগতীর্থে যজ্ঞান্ত স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন।

শ্বশুর দক্ষ ও জামাতা শিবের মধ্যে কলহ চলিতে লাগিল। পরে ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির অধিপতি করিলে দক্ষের অত্যন্ত অহঙ্কার জন্মিল। তিনি ঐ গর্ব্বজন্য রুদ্রসহ ব্রহ্মনিষ্ঠ-দিগকে অগ্রাহ্য করিয়া “বাজপেয়” যজ্ঞ দ্বারা যাগ সমাপন করিয়া “বৃহস্পতি” নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃগণ ও দেবতাদিগের পূজা হইল, এবং তাঁহাদের পত্নীগণও নিজ নিজ স্বামীর সহিত পূজিতা হইলেন। খেচরগণ আকাশে বিচরণ করিতে করিতে ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন শুনিয়া সতী ঐ যজ্ঞের বিষয় জানিতে পারেন।

ঐ যজ্ঞস্থলে সমাগত আত্মীয় আত্মীয়া ও অন্যান্য নিমন্ত্রিতাগণকে এবং ঐ যজ্ঞকার্য্য দেখিবার জন্য তাহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য হইল। অনন্তর তিনি শিবকে তাঁহাকে লইয়া ঐ যজ্ঞে গমন করার জন্য অনুরোধ করিলেন। শিব তাহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবং ইতঃপূর্ব্বে দক্ষ তাঁহাকে যে সকল কুকথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে তাঁহার সম্বন্ধবশতঃ সতী পিতার নিকট সম্মান ও আদর পাইবেন না. এবং স্বামিদ্বেষী ব্যক্তি পিতা হইলেও তাঁহার মুখ দেখা সতী স্ত্রীর উচিত হয় না, এবং সম্মানিত ব্যক্তির আত্মীয়গণের নিকট অসম্মান ও পরাভব সদ্যই মরণের নিমিত্ত কল্পিত হয়, ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিলেন। সতী মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং বুদ্ধি বিমূঢ় হইয়া পড়ায় একাকী পিতৃগৃহে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। পরে শিবানুচরগণ বৃষেন্দ্রকে অগ্রে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং সতীকে সেই বৃষে আরোহণ করাইয়া দক্ষের আলয়ে লইয়া গেলেন। সতী পিত্রালয়ে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু দক্ষ সতীকে দেখিয়াও কোন প্রকার আদর-যত্ন করিলেন না। সতীর জননী ও ভগিনীগণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষের ভয়ে তাঁহার সমাদর করিলেন না। সতী দেখিলেন, সেই যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রের অংশ নাই, দক্ষ রুদ্রকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। স্বামীর ও নিজের এই অপমানে তিনি অতিশয় কোপান্বিতা হইলেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া এরূপ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল, যেন তাহার দ্বারা সমস্ত লোক দগ্ধ

ও ভস্মসাৎ হইয়া পড়ে। সতীর ক্রোধাবেশ হইবামাত্র দক্ষ-বিনাশার্থ তৎক্ষণাৎ সতীর তেজে কতকগুলা ভূত সমুত্থিত হইল কিন্তু দেবী তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পিতাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তাঁহার শিবদ্বেষের নিন্দা করিলেন, এবং শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। দক্ষের দেহ হইতে নিজ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহা অতি কুৎসিতবোধে সেই জনকের সম্মুখেই তাহা বিসর্জ্জন করিবার জন্য- "দাক্ষায়ণী" নাম লোপ করার জন্য ও তাহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন অঙ্গ পরিত্যাগ করার জন্য সমাধিস্থ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহ সমাধি-সমুৎপন্ন অনল দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইল ; সতী দেহত্যাগ করিলেন। সতীর অনুচরগণ স্ব স্ব অস্ত্র উত্তোলন করিয়া দক্ষ-বধার্থ উত্থিত হইল। তখন ভৃগুমুনি--যে মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞবিঘ্ন-কারীগণকে বিনষ্ট করা যায়, সেই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণা-গ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, সহস্র সহস্র ঋভু নামক দেবতা-গণ দলবদ্ধভাবে উত্থিত হইয়া সতীর অনুচরদিগকে প্রহার দ্বারা বিতাড়িত করিলেন।

শিব সতীর দেহত্যাগ ও অনুচরগণের পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধভরে একটি জটা মস্তক হইতে উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, ও তাহা হইতে মহাকায় বীরভদ্র উৎপন্ন হইলেন। শিব তাঁহাকে যজ্ঞসহ দক্ষকে বিনাশ করিতে আদেশ করিলেন। বীরভদ্র সেই আদেশমত শিবানুচরগণসহ দক্ষ-যজ্ঞে গমন করিয়া যজ্ঞ ধ্বংস ও দক্ষের মুণ্ড দেহ হইতে ছিন্ন করিলেন এবং তাহা দক্ষিণাগ্নিতে

আহুতিরূপে অর্পণ করিয়া যজ্ঞশালা দগ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তভাবে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৃষ্টি ধ্বংস হয় দেখিয়া বিষ্ণু স্বীয় চক্র দ্বারা ঐ মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই ভারতবর্ষে যে যে স্থানে সতীর সেই শরীরাবয়ব পতিত হইয়াছিল, সেই স্থান পীঠস্থান হইয়া রহিয়াছে। পীঠস্থানের সংখ্যা—৫১টি।

দক্ষনন্দিনী সতী এই প্রকারে আপনার পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে গৌরী-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু উগ্র তপস্যা দ্বারা প্রিয়তম পতি শিবকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সতী-চরিত্র ভারতে সতীত্বের উজ্জ্বল আদর্শ। ভারতের নানা স্থানে সেই সতীদেহের অংশসকল পতিত হইয়া তাহা মহাপুণ্য তীর্থে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ঐরূপ কোন পীঠ-স্থানে গমন করিলে হিন্দু নরনারীর মনে স্বতঃই কি এক অপূর্ব্ব দেবভাব উদিত হয় না? মনে হয় না কি সেই দেবী—যিনি স্বামীর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া—যে দেহ ও যৌবন এত প্রিয়—এত আদরের বস্তু—তাহা তুচ্ছজ্ঞানে বিসর্জ্জন করত পতিভক্তির পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন? তাঁহার মহিমা এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তিনি জগতের নমস্য, উপাস্য ও অনুকরণীয়? নিশ্চয়ই মনে হয়। সেইজন্য, সেই দেবভাব উদ্দীপনার জন্যই, তীর্থ-ভ্রমণ ধর্ম্মজীবন-লাভের অন্য-তম উপায় বলিয়া কথিত হয়। ভারতের দুর্দ্দিনে সে আকাশে

কালক্রমে ধর্ম্মে সংশয় ও অনাস্থারূপ কালরাত্রি সমাগত হইলেও, ঐ সকল পীঠস্থান এখনও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির ন্যায় সে আকাশে ক্ষীণালোক বিতরণ করত সতীধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিতেছে। ইহা ভারতের উপর সেই জগজ্জননীর কৃপা বিতরণ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

আধুনিক বৃহস্পতিগণ পিতামাতা ও পতি প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি দেবতাজ্ঞানে ভক্তিপূজা সম্বন্ধে সমালোচনায় শতমুখ হন। ধৃষ্টতার আধিক্যবশতঃ অনেকে আবার পদে পদে দেব-চরিত্র সমালোচনা যে আপনাদের অধিকারের বহির্ভূত, তাহা বিস্মৃত হইয়া সে সমালোচনাও করিয়া থাকেন। সেই ভাবে সতীর পতিনিষেধ না শুনিয়া পিতৃগৃহে গমন দূষণীয় হইয়াছিল বলেন। তাহার একমাত্র উত্তর এই হইতে পারে যে,—পতির নিষেধ না শুনিবার ফল—আত্মনাশ, পিতৃনাশ, যজ্ঞ-নাশ, ধর্ম্মনাশ, সর্ব্বনাশ। ইহাও সতীর আদর্শ চরিত্র হইতে শিক্ষা হইতে পারে।

২। অরুন্ধতী।

অরুন্ধতী দেবীকে সতীশিরোমণি বলে। ইনি কর্দ্দম মুনির কন্যা ; দেবহূতি ইহার মাতা ; ইনি বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী। ইনি পতিব্রতার কর্ম্মফলে জগতে সতীশিরোমণি হইয়া অশেষ যশোভাজন হন ; বহুকাল স্বামীর সহিত ইহলোকে অবস্থান করিয়া, পরে স্বামী বশিষ্ঠদেবের সহিত নক্ষত্রলোকে অবস্থান করিতেছেন।

আহুতিরূপে অর্পণ করিয়া যজ্ঞশালা দগ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তভাবে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৃষ্টি ধ্বংস হয় দেখিয়া বিষ্ণু স্বীয় চক্র দ্বারা ঐ মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই ভারতবর্ষে যে যে স্থানে সতীর সেই শরীরাবয়ব পতিত হইয়াছিল, সেই স্থান পীঠস্থান হইয়া রহিয়াছে। পীঠস্থানের সংখ্যা—৫১টি।

দক্ষনন্দিনী সতী এই প্রকারে আপনার পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু উগ্র তপস্যা দ্বারা প্রিয়তম পতি শিবকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সতী-চরিত্র ভারতে সতীত্বের উজ্জ্বল আদর্শ। ভারতের নানা স্থানে সেই সতীদেহের অংশসকল পতিত হইয়া তাহা মহাপুণ্য তীর্থে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ঐরূপ কোন পীঠস্থানে গমন করিলে হিন্দু নরনারীর মনে স্বতঃই কি এক অপূর্ব্ব দেবভাব উদিত হয় না? মনে হয় না কি সেই দেবী—যিনি স্বামীর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া—যে দেহ ও যৌবন এত প্রিয়—এত আদরের বস্তু—তাহা তুচ্ছজ্ঞানে বিসর্জ্জন করত পতিভক্তির পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন? তাঁহার মহিমা এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তিনি জগতের নমস্য, উপাস্য ও অনুকরণীয়? নিশ্চয়ই মনে হয়। সেইজন্য, সেই দেবভাব উদ্দীপনার জন্যই, তীর্থ-ভ্রমণ ধর্ম্মজীবন-লাভের অন্যতম উপায় বলিয়া কথিত হয়। ভারতের দুর্দ্দিনে সে আকাশে

কালক্রমে ধর্ম্মে সংশয় ও অনাস্থারূপ কালরাত্রি সমাগত হইলেও, ঐ সকল পীঠস্থান এখনও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির ন্যায় সে আকাশে ক্ষীণালোক বিতরণ কবত সতীধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিতেছে। ইহা ভারতের উপর সেই জগজ্জননীর কৃপা বিতরণ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

আধুনিক বৃহস্পতিগণ পিতামাতা ও পতি প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি দেবতাজ্ঞানে ভক্তিপূজা সম্বন্ধে সমালোচনায় শতমুখ হন। ধৃষ্টতার আধিক্যবশতঃ অনেকে আবার পদে পদে দেব-চরিত্র সমালোচনা যে আপনাদের অধিকারের বহির্ভূত, তাহা বিস্মৃত হইয়া সে সমালোচনাও করিয়া থাকেন। সেই ভাবে সতীর পতিনিষেধ না শুনিয়া পিতৃগৃহে গমন দূষণীয় হইয়াছিল বলেন। তাহার একমাত্র উত্তর এই হইতে পারে যে,—পতির নিষেধ না শুনিবার ফল—আত্মনাশ, পিতৃনাশ, যজ্ঞ-নাশ, ধর্ম্মনাশ, সর্ব্বনাশ। ইহাও সতীর আদর্শ চরিত্র হইতে শিক্ষা হইতে পারে।

২। অরুন্ধতী।

অরুন্ধতী দেবীকে সতীশিরোমণি বলে। ইনি কর্দ্দম মুনির কন্যা ; দেবহুতি ইহার মাতা ; ইনি বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী। ইনি পতিব্রতার কর্ম্মফলে জগতে সতীশিরোমণি হইয়া অশেষ যশোভাজন হন ; বহুকাল স্বামীর সহিত ইহলোকে অবস্থান করিয়া, পরে স্বামী বশিষ্ঠদেবের সহিত নক্ষত্রলোকে অবস্থান করিতেছেন।

সতীত্ব।

"নিমিত্তনিদান" গ্রন্থে কথিত আছে যে, নক্ষত্রলোকে সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যে অরুন্ধতীর উদয় হয়, এবং যাঁহার পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে, তিনিই ঐ নক্ষত্র দেখিতে পান না। হিন্দু-বিবাহে কুশণ্ডিকার সময় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বর নববধূকে ঐ অরুন্ধতী তারা দর্শন করাইয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অরুন্ধতী যেরূপ পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্যারূপে যশস্বিনী হইয়াছিলেন, এই নববধূও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই-রূপ পতিব্রতাধর্ম্মপালন করিয়া পাতিব্রত্যফলভোগ করিবেন।

"হরিবংশে" চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় আদিতে কথিত আছে,—পূর্ব্বে উমাদেবী পুণ্যকব্রত করিয়া স্বীয় সখীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তথায় অদিতি প্রভৃতি দক্ষসূতাগণ, লোকমধ্যে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাতা শচীদেবী এবং রোহিণী-আদি, গঙ্গা-সরস্বতি আদির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, লোপামুদ্রা ও যাহারা নিজ তেজোদ্বারা জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, সেই সতীসকল, মঙ্গলময়ী গিরিকুমারীগণ, সুব্রতা হুতাশনসুতাগণ, বহ্নিপ্রিয়া স্বাহা, যশস্বিনী সাবিত্রী দেবী প্রভৃতি, এবং দেবী অরুন্ধতী গমন করেন, এবং পুণ্যকসকলের শুভবিধির বিষয় জানিতে পারেন। উহাতে কথিত হইয়াছে, পুণ্যকব্রতনিবহের প্রবর্ত্তন বিষয়ে সতীদলের মধ্যে ধর্ম্মগুণান্বিতা অদিতি ইন্দ্রানী ও দেবী অরুন্ধতী কীর্ত্তনীয়া হইবেন।

উক্ত পুণ্যকব্রতে সতীধর্ম্মের আদর্শ কি মহান্, তাহা অরু-ন্ধতী দেবীকে বলা হইয়াছে। উহাতে কথিত আছে—

"সতীত্ব ও ধর্ম্মাচরণ যাঁহার নিয়ত অভীপ্সিত, তাঁহার পক্ষেই

পুরাণে পুণ্যকবিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে; কারণ, যাহারা অসতী, দান, উপবাস, সদনুষ্ঠিত ধর্ম্মকার্য্য ও পুণ্যকসকল তাহাদের পক্ষে নিষ্ফল। ব্যভিচারদোষে পুণ্যকফল নষ্ট হয়, সুতরাং যাহারা ব্যভিচারদুষ্টা অথবা ভর্ত্তাকে বঞ্চনা করে, তাহারা পুণ্যকফল প্রাপ্ত না হইয়া নরকে গমন করে। যাঁহারা স্বামী ভিন্ন অপর কাহাকেও জানেন না,—ধর্ম্মে যাঁহাদের একান্ত শ্রদ্ধা এবং সতীপথই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, সেই সুশীলা পতি-দেবতা সাধ্বীরাই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। অপিচ যাঁহারা বাক্‌দুষ্টা নহেন, শৌচযুক্তা ধৃতিমতী, শুভব্রতা ও নিয়ত সাধু-বাদিনী, তাঁহারাই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ভর্ত্তা দীন-দশাপন্ন, ব্যাধিত অথবা পতিত হইলেও, স্ত্রীর তাঁহাকে কোন-রূপেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। পতি নির্গুণ অকার্য্যকারী অথবা পতিত হইলেও সতী স্ত্রী তাহাকে ও আপনাকেও তারিতে পারে! পণ্ডিতগণ বেদে বাক্‌দুষ্টা স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, কিন্তু যোনিদুষ্টার কোন প্রায়-শ্চিত্তই নাই, তাহাকে চিরকালের জন্য অধঃপতিতা বলিয়াই জানিবে। যে স্ত্রী সাধুদিগের গতি কামনা করে, তাহার পক্ষে পতির ইচ্ছানুসারেই ব্রত ও উপবাসাদি করা কর্ত্তব্য; যে স্ত্রী যোনিদুষ্টা সে পুনঃপুনঃ তির্য্যগ্-যোনিতেই প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং সহস্র কল্পান্তরেও সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না। যদি কোন অসতী স্ত্রী কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, সে নিতান্ত দুর্ম্মেধা ও কুক্কুরাশনা হয়। সাধুরা ভর্ত্তাকেই স্ত্রীদিগের দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ভর্ত্তা যাহার উপর তুষ্ট, সেই ধর্ম্ম-

চারিণী সতী। যাঁহাদের মন সদ্‌ভাবসহকারে পতিকেই ব্যবস্থিত এবং যাঁহারা বাক্য দ্বারা অথবা মনোদ্বারা পতিকে অতিক্রম করেন না, পুণ্যকর্ম্মগণ কর্ত্তৃক পুণ্যকবিধিতে তাঁহাদেরই পুণ্যকফল উদাহৃত হইয়াছে।”

তৎপরে সতী স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া দিবসের মধ্যে উক্ত ব্রত ও উপবাসাদি পালনের জন্য কি কি কার্য্য কি কি ভাবে করিবেন, তাহা বর্ণিত আছে।

উহার একটি মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

“আমি যেন ভর্ত্তার কল্যাণকারিণী হই, ধনের অপব্যয় না করি, গুণশালিনী, পতির সহিত ধর্ম্মযুক্তা ও বরহেতু স্বামীর দাসী সদৃশী হই। কর্ম্ম, মন অথবা বাক্যদ্বারাও কখন যেন পতিকে অতিক্রম না করি, এবং রুষ্টা হইলেও যেন তাঁহার বশবর্ত্তিনী থাকি। আমি যেন সপত্নীদিগের উপরে থাকিয়া মনোহররূপশালিনী, সুভগা, পুত্রবতী, অন্নাদি-দানে মুক্তহস্তা, গুণবাদিনী এবং সর্ব্বপ্রকারে অদরিদ্রা হই। আমার পতি যেন সুমুখ, মৎপ্রতীক্ষ, নিত্যমস্তক্ত, মন্মতি ও মদ্‌গতি হন; আমাদের উভয়ের প্রীতি যেন চক্রবাকমিথুনের অনুরূপা হয়, এবং মনোবিরাগ না হইয়া যেন মঙ্গলই হইতে থাকে। যাহারা পতিভক্তি দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করত পিতা ও ভর্ত্তা উভয়ের কুলকেই পবিত্র করেন, এবং যাঁহাদের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ধৃত হইয়া আছে, আমি যেন সেই উত্তমা সাধ্বীগণের লোকে গমন করি। যাঁহারা আমার সাক্ষিত্বে নিযুক্ত আছেন, সেই ভূমি, বায়ু, জল, আকাশ, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি মহান্ অহঙ্কার ও

মুনিগণ যেন আমার ব্রত ও ভক্তিকে স্মরণ করেন। যে প্রাণি-কর্ম্মনিরত সত্ত্বাদি অভিমানী জরায়ুজাদিসম্বন্ধ ভূতগ্রামকর্ত্তৃক দেহীদিগের এই ভৌতিক বিধি আরব্ধ হইয়াছে, এই সর্ব্বসংস্থ ভূতগণ আমার আচরিত ব্রত ও ভক্তির সাক্ষী থাকুন। পুণ্যের সাক্ষী চন্দ্র ও আদিত্য, যম, দশদিক্ ও আমার মন, মদীয় ব্রত, ও নিশ্চয়ের বিষয়ে সাক্ষী থাকুন।"

এই সতী-ধর্ম্মমন্ত্র যে কত গভীর, গূঢ় ও উন্নতিকারক অর্থ হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা বলা যায় না। সতীত্ব ধর্ম্মের আকরে যে কত অমূল্য মণিমাণিক্য নিহিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হায়! আজ কাচের অন্বেষণেই অনেকে ব্যস্ত; প্রকৃত কাঞ্চন বা মণি খুঁজে কে? নকলেই প্রায় সকলে মুগ্ধ, আসলের আদর কোথায়? তাই নাট্যকার খেদে ও ক্ষোভে বলিয়াছেন—

কি দিন প'ড়েছে বিষম কাল।
যে দিকে চাই খালি জাল॥

জাল কর্ত্তা জাল গিন্নি, শালগেরাম আর পীরের ছিন্নি,
গলায় পৈতে দিয়ে মুচি চালাচ্ছে বামনী চাল॥ ইত্যাদি।"

ভগবতী উমাদেবী অরুন্ধতীকে পুণ্যকব্রতকথার মধ্যে কহিয়াছিলেন যে, নারী নিজ শরীর শোভা স্বামীর তৃপ্তির জন্যই কামনা করেন। অঙ্গের শোভাসম্পাদন জন্য আজ জগৎ লালায়িত। কত সুগন্ধি তৈল সাবান আদি এই দেহ-শোভাসম্বর্দ্ধনী দেবীর বেদির সম্মুখে নিয়ত বলি পড়িতেছে; অথচ প্রকৃত শোভা লাভ হইতেছে না। সতী স্ত্রী উক্ত পুণ্যক-

ব্রতে কথিত বিধিনিষেধ দ্বারা কেশ, শিরোরোগ শূন্য মস্তক, ভ্রূ, কর্ণ, নাসিকা, নয়ন, ওষ্ঠ, দন্ত, মুখমণ্ডল, স্তন, কৃশোদর, হস্ত, নিতম্ব, সুস্বর বা বাক্যের মধুরতা ও চরণ, অর্থাৎ সর্ব্বগাত্রের অতুল সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং শুভবন্ধুমতী ও ভর্ত্তার প্রণয়িণী হইয়া সপত্নীদিগের উপর আধিপত্যলাভ করিতে পারেন। আজকাল কেশতৈলের ত বহুল প্রচার ও ব্যবহার হইতেছে; রন্ধনে অগ্নিতাপে শিরোরোগের অভিযোগ ত ঘরে ঘরে শুনা যায়। সে অবস্থায় উক্ত পুণ্যকব্রতে যে নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পালনে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? উহাতে আহার ঔষধ দুইই হইতে পারে। ফললাভ মনোনত যদি নাও হয়, তাহা হইলেও বর্ত্তমানে কেশ ও মস্তক জন্য যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা মন্দ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। দেবী ভগবতী বলিলেন—"হে বরে অরুন্ধতি! যে পুণ্যকব্রত-সমূহ দ্বারা শরীর পরসুখপ্রাপ্তিযোগ্য হয়, তুমি ইহাদের সহিত তাহা শ্রবণ কর। হে শুচিব্রতে! যে পতিব্রতা স্ত্রী কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস বা ফলমূল ভোজন করত ব্রাহ্মণকে এক ভোজন প্রদান করেন, এবং শুক্লবস্ত্রপরিধান করত শুভাচারসমন্বিতা হইয়া সম্বৎসর কাল গুরু ও দেবগণকে পূজা করিয়া দ্বিজাতিকে গোপুচ্ছরজ্জুরচিত চামর ও ধ্বজ ও যথাশক্তি মিষ্টান্ন প্রদান করেন, তাঁহার কেশকলাপ কুটিলাগ্র, তরঙ্গায়মান ও শ্রোণি-দেশাবলম্বী হয়, ও তিনি ভর্ত্তার প্রিয়তমা হন। যে সতী স্ত্রী স্বীয় মস্তককে পরসুখপ্রাপ্তিযোগ্য করিতে চাহেন, তিনি শ্রীফল ও দুগ্ধমিশ্রিত আমলক দ্বারা মস্তক প্রক্ষালন করিবেন, এবং

গোমূত্র ভক্ষণ ও শিরঃস্নানে মিশ্রিত করিবেন। হে বরবর্ণিনি! কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশীতে এইরূপ বিধি আচরণ করিলে বৈধব্য-বর্জ্জিতা, সুভগা ও বিজ্বরা হয়, ও তাহার শরীর কখনও শিরোরোগ দ্বারা সন্তপ্ত হয় না।"

আজকাল অনেক পিতামাতা কন্যাকে সৎপাত্রগতা করার জন্য শিক্ষার মধ্যে সঙ্গীতশিক্ষা প্রদান করেন। সুতরাং কন্যার সুস্বর লাভ জন্য তাঁহারা কন্যাকে উক্ত পুণ্যকব্রতনির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন করাইয়া দেখিতে পারেন। উহাতে উক্ত হইয়াছে—"যে সতী স্ত্রী বাক্যের অতিশয় মধুরতা কামনা করে, সে সংবৎসর অথবা এক মাসও লবণ বর্জ্জন করিবে, ব্রাহ্মণকে সদক্ষিণ লবণ দিবে; তাহা হইলেই সেই বরবর্ণিনীর বাক্য শ্রুত বাক্য অপেক্ষা শতগুণ মধুর হয়।"

ভগবতী উমাদেবী অরুন্ধতীকে ঐ ব্রত সম্বন্ধে আরও বলিয়াছিলেন--"হে কল্যাণি! যে পতিব্রতা স্ত্রী কর্কশ বাক্য দ্বারা সকলের মর্ম্মচ্ছেদিকা, বুধবারে ভোজনবর্জ্জিতা ও রুক্ষভাষিণী না হয়, এবং নিয়ত শেষভোজনা, শৌচান্বিতা, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা-নিরতা, ভর্ত্তৃদেবতা এবং সত্যধর্ম্মগুণান্বিতা হয়, হে সতি! তাহার ব্রত বা উপবাসের আবশ্যক কি?"

তৎপরে বিধবাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"হে সুমধ্যমে সতি! যদি কোন সতী স্ত্রী দৈবযোগে বিধবা হয়, তাহার পক্ষে পুরাণে যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। হে শুভে! বিধবা স্ত্রী সাধুদিগের ধর্ম্ম স্মরণ করত সঙ্কল্প দ্বারা মৃণ্ময় বা চিত্রস্থ পতি-প্রতিকৃতি স্থাপন করত

পূজা করিবে। সেই সুব্রতা নারী ব্রত উপবাস বিশেষতঃ ভোজন কালে সেই প্রতিকৃতির স্থানেই নিয়ত অনুজ্ঞা লইবে। যে বিধবা পতিকে অতিক্রম না করে, সেই পতিব্রতা শাণ্ডিলীর ন্যায় ভর্তৃলোকে যাইয়া সতত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে।”

দেবী পার্ব্বতী এই পুণ্যকব্রত করিয়া বিষ্ণু হইতে অভিন্ন গণেশকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠদেবের যোগ্যা স্ত্রী দেবী অরুন্ধতী। জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম আদিতে অসামান্যা না হইলে, বশিষ্ঠদেবের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার ন্যায় অতি প্রবল ও অতি বিরল সৌভাগ্য অর্জ্জন করা অসম্ভব। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অবতার আদর্শ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ-দেব; তাই শত পুত্রশোকরূপ অতি নিদারুণ পরীক্ষায় অরুন্ধতী দেবী স্বামীর সহিত স্বামীর ন্যায় অচল অটল থাকিয়া অশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; ও তাই তিনি এক্ষণে সতী-শিরোমণি ও প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। তাহার সমগ্র গুণরাশি বর্ণনা করা ক্ষুদ্র মনুষ্যের অসাধ্য। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট আকাশতলের একটি নক্ষত্রের, বা সাগরকূলের এক কণা বালুকার, বা নিভৃত প্রান্তরে আপনি প্রস্ফুটিত একটি অতি ক্ষুদ্র পুষ্পের সমস্ত গুণ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব। সকলই যেন অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ। মনুষ্য, নিজ শক্তি অনুসারে তাহা হইতে অশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া, ও সেই সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্ত জ্ঞানময়কে অনন্ত দয়াময় বলিয়া উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারে। তিনি তাঁহার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহার সৃষ্ট

এই জগতে মনুষ্যকে উপলব্ধি করাইবার জন্য জগতের প্রতি পদার্থে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাই তাঁহার নাম অস্তি প্রিয় ও ভাতি;—তাই তিনি সচ্চিদানন্দ ;—তাই তিনি অনন্ত দয়াময় ; তাই তিনি জীবের প্রতি অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

৩। সীতাদেবী।

লোকমাতা কমলা বিষ্ণুরূপী শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় সহায় হইয়া সীতারূপে ভারতে অবতীর্ণা হন। সীতা অর্থে লাঙ্গল-পদ্ধতি বা লাঙ্গলের রেখা। মিথিলারাজ রাজর্ষি জনক পুত্র-কামনায় যজ্ঞের ভূমি খনন করিবার কালে লাঙ্গলের ফলাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া লাঙ্গল পদ্ধতি বা রেখার নামে ঐ কন্যার নাম সীতা রাখিয়া তাহাকে কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়াছিলেন। সেহেতু তাঁহার অপর একটি নাম জানকী।

সীতাদেবী রূপে ও গুণে অসামান্যা ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাতিব্রত্য ব্রত স্মরণ করিলে অধুনা উপকথা বলিয়াই মনে হইতে পারে। বাস্তব জগতে সে দৃশ্য অতীব বিরলহেতু পাশ্চাত্য দেশে সে চরিত্রচিত্র কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মিকীর উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে সে পবিত্রতম চিত্র স্বপ্নের অগোচর হইলেও, এই পুণ্যভূমি ভারতের গগনতলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও যাইবে। সীতারূপা লোকমাতা লক্ষ্মীর নিজ প্রতিকৃতি ভারত-ললনাকে অলৌকিক শিক্ষাদান পৃথিবীর মধ্যে অপর দেশে

প্রকৃতই অসম্ভব। সতীধর্ম্মের জ্বলন্ত জীবন্ত ছবি ভারতে চির অঙ্কিত রাখার জন্যই সীতাদেবীর ভারতে আবির্ভাব। মা আমার চিরদুঃখিনীভাবেই এই ধরায় জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। মা আমার চিরদুঃখিনী সাজেই সাজিয়া গিয়াছেন। জীবন-রঙ্গালয়ে এ অভিনয় কত সুন্দর, কত শিক্ষাপ্রদ, কত সুখ-কর, কত মনোহর, কত পবিত্র তাহা লেখনী-মুখে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এ সংসার অনিত্য,—মনুষ্যজীবন মাত্র পরীক্ষা শ্রেণী,—এই মনুষ্যলোকে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীর স্বরূপমূর্ত্তি নারী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের পতিরূপ দেব-তার কায়মনোবাক্যে পূজা ও সেবা করাই সনাতন ধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি প্রকট হইয়াছিলেন। সংসার-কাননে কি ভাবে জীবনযাপন করিলে,—শত সহস্র দুঃখের মধ্যেও সতীধর্ম্ম পালন কি ভাবে করিলে—মনুষ্য জন্মগ্রহণ সফল হয়,—তাহাই তিনি নিজ জীবনের পদে পদে দেখাইয়া উচ্চতম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আদর্শ সতীনারীর প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাই অমর কবি বাল্মিকীর রচনায় দীপ্ত দিবা-করের আলোকের ন্যায় ভারত-গগণে চিরকাল দেদীপ্যমান রহিয়াছে ও রহিবে। এ লীলা সেই দ্বিতীয় যুগে—ত্রেতাযুগে —কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়া গেলেও, সূর্য্যের ন্যায় লোক-প্রকাশক ভাবেই তাহা এক্ষণেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এবং যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পরযুগে অর্থাৎ তৃতীয় বা দ্বাপরযুগে ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া নরাবতার অর্জ্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (নবম অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে) "অনিত্যং

অসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্” অর্থাৎ “অনিত্য অসুখ-কর ইহলোকে আসিয়া আমার ভজনা কর” বলিয়া জগৎকে যে শিক্ষা—যে অমূল্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সীতাদেবী সেই শিক্ষা নারীগণকে দিবার জন্য—জীবনে কি ভাবে সেই শিক্ষামত কার্য্য করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য—ইহধামে আসিয়াছিলেন। নিজ জীবনে পদে পদে অতি দুঃসহ শোক-দুঃখের মধ্যেও কি লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া নারীগণ চলিবেন, তাহাই নিজে দেখাইয়া অতুলনীয় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতই দয়াময়ী মা ভগবতীর ভারতের প্রতি দয়া অতুল। তাই তিনি নারী-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আসিয়া, নারীজাতির আদর্শ রাখিতে অশেষ ক্লেশ সহ্য করার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। পদে পদে শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই জগতে জন্মগ্রহণ বা জীবনধারণ অনিত্য; এই লোক—ইহলোক—অসুখকর বা শতসহস্রদুঃখে পূর্ণ;—সংসারের যাবতীয় বস্তু ও ব্যাপার অনিত্য, অস্থায়ী—আজ আছে কাল নাই,—“কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনই নাই”; —সুতরাং এই অনিত্য দুঃখের সংসারে—এই অনিত্য জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্-রূপ পতির ভজনা কর;—পতিই সতীর পরম দেবতা;—তাঁহার পূজা ও সেবা করাই নারীর পরম ধর্ম্ম;—সংসারের দুঃখে বিচলিত হইয়া কর্ত্তব্যপথ হারাইও না,—ভ্রান্ত সুখের অন্বেষণে অভ্রান্ত পতি-সেবা-সুখ ও ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইও না;—রাজদুহিতা হইবার সুখও অনিত্য,—সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের পুত্রবধূ বা রাজমহিষী হওয়ার সুখও অনিত্য,

—জীবনই অনিত্য ; সুতরাং তাহার মধ্যে চৌদ্দ বৎসরও অনিত্য ও তুচ্ছ, সে সময়ের রাজরাণীর সুখে সুখী বোধ করা বা বন-গমনের দুঃখভোগ করা উভয়ই সমান অনিত্য ও তুচ্ছ ;—দুর্ব্বৃত্ত দ্বারা লাঞ্ছিতা—অপহৃতা হইলে—লঙ্কেশ্বরের ন্যায় তাহার অতুলবিভবের প্রলোভনও তুচ্ছ ও অনিত্য,--সতীধর্ম্ম পালনই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় ও সুখকর ; সে ধর্ম্মে থাকিলে দুঃখ-রজনী প্রভাত হইবেই ও তাহাও অনিত্য ; এ নারী-জীবন-তরির কর্ণধার স্বামীই একমাত্র লক্ষ্য, ও তিনিই অনায়াসে বা আয়াসসাধ্য হইলেও সে আয়াস স্বীকার করিয়া এ জীবন-তরি অকুলপাথার হইতে চিরশান্তিময় কূলে পঁহুছাইয়া দিতে পারেন, —স্বামী-দেবতার অসাধ্য কিছুই নাই। স্বামী দ্বারা পরিত্যক্তা হইলেও স্বামী রাজধর্ম্ম—প্রজারঞ্জন ও পালন জন্য কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যাহা করিবেন তাহা কখনই দোষাবহ নহে ;—সেই বুদ্ধিবশে চালিত হইয়া নিজপ্রাণে সন্দেহের লেশমাত্র না থাকিলেও রাজকর্ত্তব্যপালন জন্য অনল-পরীক্ষায় অনলকুণ্ডে সমর্পন বা বনবাসে পরিত্যাগ করিলেও তাহা নিন্দনীয় নহে,—ইত্যাদি জ্বলন্তভাবে জগৎকে দেখাইয়া নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম অতি নির্দ্দোষ-ভাবে—পবিত্রভাবে—নিঃস্বার্থভাবে—নিষ্কামভাবে পালন করিয়া পুনরায় অমরধামে—নিজ আবাসে—বৈকুণ্ঠে—চলিয়া গিয়াছেন। মা'র জগতের, মা'র এ ভারতের প্রতি, হিন্দুনারীর প্রতি, এই অসীম দয়ার বিষয় স্মরণ করিলে নয়ন কি অশ্রুপূর্ণ হয় না ? ভক্তিভরে বলিতে কি ইচ্ছা হয় না—

" কলাতীতা ভগবতী স্বয়ং সীতেতি সংজ্ঞিতা।

তৎপরঃ পরমাত্মা চ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ ?॥”

দেবর্ষি নারদের ন্যায় সেই পরমপিতা পরব্রহ্ম দয়ার অবতার সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে স্তবে বলিতে ইচ্ছা হয় না।

“জগতামাদিভূতা যা সা মায়া গৃহিণী তব ?।”

সীতারামলীলা কি সেই মায়াধীশ ও মহামায়ার অলৌকিক লীলা নহে? সামান্য মানুষ মানুষী কি সেই ত্যাগের—সেই কর্ত্তব্য পালনের আদর্শ দিতে পাবে?

“মিথিলাধিপতেঃ কন্যা যা উক্তা ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সা ব্রহ্মবিদ্যাবতরৎ সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥”

ইহা কি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না? সুরগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অবতীর্ণা হইয়া মা আমার কি অভূতপূর্ব্ব আদর্শ রাখিয়া যান নাই? যাহা এক্ষণে কল্পনায় আনা সুকঠিন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়া যাওয়া কি সামান্যা মানুষীর কার্য্য? মহামায়া—ব্রহ্মবিদ্যা—মানুষী-তনুস্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই, সেই অলৌকিক সতীত্ব-দৃষ্টান্ত ভারতের ভাগ্যে দেখা সম্ভব হইয়াছিল। একদিন এমন ছিল, যখন ভারতের সৌভাগের অন্ত ছিল না। আর আজ? সতীত্বের পূর্ব্ব আদর্শ বিস্মৃত হইয়া আজ ভারতের দুর্ভাগ্যেরও অন্ত নাই।

“সীতা রামময়-জীবিতা।” মন প্রাণ দেহ সবই রামময়। লঙ্কা হইতে হনূমান্ সংবাদ আনিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—“দেখিয়া আসিলাম শূন্যদেহ পড়িয়া রহিয়াছে; মন-প্রাণ-আত্মা সব আপনার পাদপদ্মে সমর্পিত। যম আসিয়া প্রাণ-

হীন শূন্য দেহ দেখিয়া লইতে পারিতেছেন না।" এ চিত্র মানস-পটে অঙ্কিত করিলেও জীবন ধন্য হয়।

মহামায়া ভগবতী মানব-দেহে সীতারূপে সংসার-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া মায়াবীর ছলনায় পড়িয়াছিলেন—এই ছবি দেখাইয়া এক অভিনব লীলা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। স্বর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা—রাজ-চক্রবর্ত্তী দশরথের গৃহে যাহা ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে ঐশ্বর্য্যের যে সীমা ছিল না, তাহা তাঁহার সাধারণ প্রজাগণের ঐশ্বর্য্যের কথা পড়িলেই বুঝা যায়। রাজা দশরথের রাজত্বকালে প্রজাগণ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিয়া নিত্য নিত্য ঐ স্বর্ণপাত্র পরিত্যাগ করিত। শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইলে প্রজাগণ প্রত্যহ ভোজনান্তে স্বর্ণপাত্র পরিত্যাগ করিতে না পারায়, এক একদিন অন্তর পরিত্যাগ করিত। ইহাতে অনুমিত হইয়াছিল রাজ্য ক্রমে নির্ধন হইতেছিল। বোধ হয়, লক্ষ্মীর প্রতি অনাদর দেখাইলে নারায়ণও নিস্তার পান না, তাই রাম-রাজ্যেও ধন-হ্রাস প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহা হউক, সেই অতুল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ করিয়া যিনি সাররত্ন পতি-বত্ন সার করিয়া তাঁহার সঙ্গে বনবাসিনী হইয়াছিলেন, একটা "স্বর্ণ-মৃগ" তাহার নিকট কিছুই লোভনীয় বস্তু ছিল না। তবে তাহা পাইবার জন্য কেন শ্রীরামচন্দ্রকে ও পরে লক্ষ্মণকে পাঠাইলেন, ও রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলেন ?

মা আমার ভারতললনাগণকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন—

"হে সতীগণ ! এই সংসার-অরণ্যে আসিয়া যেন তোমরা স্বর্ণরূপ মৃগ অন্বেষণে তোমাদের পতিগণকে উত্তেজিত করিয়া

গহনতর স্থানে প্রেরণ করিও না। এ সংসার-কাননে আমি সীতা তোমাদের মন-স্বরূপ। মনের স্বামী রামরূপ বৈরাগ্য, ও বৈরাগ্যের চির-অনুচর সহোদর লক্ষ্মণরূপ বিবেক। স্বর্ণরূপ-মৃগ পাপ-প্রলোভন। পাপ-প্রলোভন মনে উদিত হইলেই, এবং তাহাতে বিমোহিত হইলেই, প্রথমে বৈরাগ্যকে বিদায় দিতে হইবে; তৎপরে সঙ্গে সঙ্গে বিবেককেও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। স্বর্ণমৃগরূপ অসার সুখের লালসায় মনের এই সকল রক্ষককে পরিত্যাগ করিলে, পাপরূপ রাক্ষস রাবণ নিশ্চয়ই মনকে অপহৃত করিয়া তাহার দুর্ভেদ্য পুরীতে লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখে। তখন মনের পূর্ব্ব অলঙ্কার—ঐশ্বর্য্য সকল—একে একে পতিত হইয়া যায়। বিবেক-লক্ষণ মন-সীতার পদের অলঙ্কার—নূপুর—মাত্র চিনিতে পারেন; কারণ মনের পদের গতিই তিনি সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতে অভ্যস্ত থাকেন। পাপাপহৃত মন বাহ্যতঃ অশোক-কাননে--বস্তুতঃ শোক-কানন মধ্যে-অবরুদ্ধ থাকিয়া পাপের উত্তেজনারূপ চেড়িদল দ্বারা নিয়ত নিপীড়িত ও অশেষ দুর্গতিগ্রস্ত হয়। পরে পূর্ব্বকৃত পুণ্যরূপ বিভীষণের বন্ধুতায়,—মহাবিক্রম সদ্‌গুরু মহাবীরের সাহায্যে—-গুরু-অনুগ্রহরূপ সৈন্যদলের আনুকূল্যে,—-ভীষণ যুদ্ধের পর,—যে যুদ্ধে বৈরাগ্য বিবেককেও মধ্যে মধ্যে পরাভূত ও বন্দী হইতে হয়,—বিবেককে মোহ-মেঘনাদের শক্তিশেলে জর্জ্জরিত হইতে হয়,—পাপপুরী হইতে মন উদ্ধার পাইয়া আবার পূর্ব্ব গৌরবে মণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু পাপ-সংসর্গ এতই ভীষণ ও নিন্দনীয় যে, বৈরাগ্য তাহাকে মধ্যে মধ্যে ত্যাগ

করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলেন, বা বনবাসে প্রেরণ করেন ; পরে মনের বল-রূপ সন্তান—লব ও কুশের দ্বারা—বৈরাগ্য ও বিবেক তাহার শক্তি ও সতীত্ব স্বীকার করিয়া, আবার তাহার আদর করিতে বাধ্য হন।"

এ শিক্ষার যে আজ অতি প্রয়োজন, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? সীতাদেবীর আদর্শ-চরিত্রে শিক্ষার সীমা নাই। শিক্ষার তিনি রত্নাকর। তাঁহার জীবন-রত্নাকরে নিমজ্জিত হইলে কত রত্নই লাভ করা যায়। কেই বা ডুবে ? কেই বা প্রকৃত রত্ন চায় ? কেই বা তাহা আর চিনে ? নকল-আদর্শ যে আসল-আদর্শকে ঢাকিয়া চক্ষুকে বিকৃত করাইয়াছে ! জানি না, —কিসে,—কবে, সে বিকৃতি—সে ছানি, হিন্দু নরনারীর চক্ষু হইতে অপসারিত হইবে ! কোন্ মহাপুরুষ—মহাস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ—সে অস্ত্রোপচার করিতে সমর্থ হইবেন।

যে অগণিত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল সীতা-হৃদয়-গগনকে বিভূষিত ও আলোকিত করিত, তাহা এক জনে—মানুষীতে সম্ভব হয় না।

পাঞ্চজন্য শঙ্খ হৃষীকেশেই শোভা পায় ; জানকীও পাঞ্চ-জন্য শঙ্খের ন্যায় ; তাই তিনি জানকীনাথের নিকটেই শোভা পাইয়াছিলেন। তাহার ফুৎকারে সে শঙ্খে পৃথিবীব্যাপী যে সুমধুর ধ্বনি উঠিয়াছিল,—তাহা মহাব্যোমে এখনও যেন বিদ্য-মান রহিয়াছে। শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইলে এখনও যেন সেই বজ্রগম্ভীর নিনাদ শুনিতে পাওয়া যায়। সতীত্বের এরূপ বিজয়-ঘোষণা জগতে আর কোথাও শ্রুত হয় নাই।

সতীত্ব:

আদর্শনারীর সৃষ্টি আদর্শ-পুরুষের জন্যই হয়। তাই আদর্শ-পুরুষ—পুরুষোত্তম—শ্রীরামচন্দ্র আদর্শনারী সীতার চরিত্র লক্ষ্মণের নিকট বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রামা
রঙ্গে সখী লক্ষণ! সা প্রিয়া মে॥" (রামায়ণ)

অর্থাৎ "হে লক্ষ্মণ! সেই প্রিয়া আমার রাজকার্য্যে মন্ত্রী, সাংসারিক কার্য্যে দাসী, ধর্ম্মকার্য্যে পত্নী, ক্ষমায়—সহিষ্ণুতায়—সর্ব্বংসহা ধরিত্রী, স্নেহে মাতা, শয়নে রামা ও রঙ্গে সখী ছিলেন।"

বাস্তবিকই ধরিত্রী-কন্যা সীতাদেবী ক্ষমায়—সহিষ্ণুতায়—নিজ মাতা ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বংসহার সর্ব্বগুণ দেখাইয়াছিলেন। এ আদর্শ জগতে অতীব দুর্লভ। বাহ্যতঃ এত অনাদর,—এত বনবাস, অনল-পরীক্ষাদি সত্ত্বেও পতির প্রতি অটুট প্রাণ-ভরা ভক্তি, প্রাণ-ঢালা ভালবাসা দেখাইবার যে আদর্শ কত উচ্চস্তরের মানবীতে সম্ভব, তাহা ধারণা করিবার মস্তিষ্ক জগতের আর কোন দেশের কোন জাতির নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সীতাদেবীর শত সহস্র গুণরাশির একটি গুণের কণামাত্র পাইলে, বর্ত্তমান যুগে নারীর জীবন ধন্য হয়, এবং তাঁহার পতির জীবনও সঙ্গে সঙ্গে ধন্য হইয়া যায়। সীতাদেবীকে মানবী ভাবিলে তাঁহার চরিত্র-মহিমার ইতি করা যায় না। মনে হয় মানবীতে এত গুণ সম্ভব কি? তাই সেই

বৈকুণ্ঠ-বাসিনী নারায়ণী জ্ঞান করিলে তাঁহার পতিভক্তি—গতি-সর্ব্বস্বতায় অসম্ভবও সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। সেই সীতা-সূর্য্য ভারত-গগনে অস্তমিত হইলেও, অদ্যাপিও তাহার কিরণজাল একেবারে অস্তমিত ও অন্তর্হিত হয় নাই; এখনও, ঐ দেখ, রামায়ণ-পশ্চিম-গগনে তাহা দীপ্ত রহিয়াছে।

যে সময় সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে অত্রিমুনির আশ্রমে উপনীতা হন, সে সময়ে অত্রি-মুনি-পত্নী বৃদ্ধা অনসূয়া দেবীর সহিত তাঁহার কথোপকথনে সতীত্ব-ধর্ম্মের প্রগাঢ় শিক্ষা আছে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ১১৭।১১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—"বৃদ্ধা তাপসী সেই স্বামী-সহধর্ম্মচারিণী মহাভাগা সীতাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—'হে জানকি! তুমি ভাগ্যবশতঃই জ্ঞাতি স্বজন সম্মান সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করত পিতার আদেশে বনবাসী পতির সহ অনুগমন করিতেছ। পতি নগরেই থাকুন বা বনেই বাস করুন, অনুকূলই হউন বা প্রতিকূলই হউন, ভর্ত্তাই যাহাদিগের পরম প্রিয়তম, সেই সমস্ত নারীদিগের জন্যই মহোদয় লোক সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, যথেচ্ছাচারী বা ধনহীন যেরূপই হউন, সৎস্বভাবা নারীগণের তিনিই পরম দেবতাস্বরূপ। হে বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনা করিয়া পতি হইতে পরম হিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পতিই ইহলোক ও পরলোকের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠানস্বরূপ; কামাসক্ত-হৃদয়া, অসতী

কামিনীগণ—যাহারা কেবল ভরণ-পোষণার্থই ভর্ত্তাকে ভর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষ গুণ অবগত না হইয়াই স্বেচ্ছাচরণ করে। জানকি! যাহারা উক্ত প্রকার অসদ্‌গুণযুক্তা নারী, তাহারা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্টা হয় এবং অযশ লাভ করিয়া থাকে। আর যে সকল স্ত্রী তোমার ন্যায় সদ্‌গুণসমূহে বিভূষিতা এবং যে সকল রমণী উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোকসকলের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা পুণ্যশীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি এইরূপ পতির প্রতিপালিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সতীত্ব-সমন্বিত ও শুদ্ধাচারবশবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও, তাহা হইলেই অক্ষয় যশঃ ও অশেষ ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে!"

মহামায়া সীতাদেবী নিজ মায়ায় বৃদ্ধা তাপসী অনসূয়া দেবীর নিকট স্বরূপ লুকাইয়া ঐ সকল উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে তাপসী অনুসূয়া প্রবল তপোবলসম্পন্না ছিলেন,—পূর্ব্বে দশ বৎসর কাল নিরন্তর অনাবৃষ্টি হইলে যিনি মন্ত্রসিদ্ধি-প্রভাবে ফলমূলের সৃষ্টি করিয়া এবং সেই আশ্রমে জাহ্নবীকে আবাহন করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক ঋষিগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন,—যিনি উগ্র তপস্যা ও কঠোর নিয়মনিবহে অলঙ্কৃতা হইয়া দশ সহস্র বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন,—যাঁহার সুকঠোর ব্রতদ্বারা বিঘ্নসমুদায় নিবৃত্ত হইয়াছিল এবং যিনি দেবকার্য্যহেতু এক রাত্রিকে দশ

রাত্রি-পরিমিত করিয়া প্রভাত হইতে দেন নাই,—তিনিও মহামায়ার মায়ার প্রভাবে তিনি স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাঁহার স্বরূপ ধরিতে পারেন নাই। ধরা না দিলে এ ধরায় তাঁহাকে কি ধরা যায়? যাহাহউক, মা আমার সর্ব্বজ্ঞা এবং তাহার আভাস দিয়া উত্তর করিয়াছিলেন—"আর্য্যে! আপনি যাহা শিক্ষা দিতেছেন, তাহা আপনাতে অসম্ভব নহে। এক মাত্র পতিই যে নারীর গুরু, তাহা আপনি যেরূপ বলিলেন, আমিও সেইরূপ জানি।" মা জানকি! তুমি না জান কি? কত সহস্রবর্ষব্যাপী কঠোব তপস্যার ফলেও কি তাপসী অনসূয়া দেবীর ও তাপস অত্রিমুনির তোমাদের স্বরূপতঃ দেখিবার ও চিনিবার অধিকার হয় নাই? তাই বলে মহামায়ার লীলা বুঝা ভার।

দেবর্ষি নারদ একদা রামসীতাব নিভৃত মন্দিরে উপস্থিত হইলে তাঁহারা দেবর্ষিব যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলেন,—"আমরা সংসারী, আপনার মত মহাপুরুষের দর্শন বহু ভাগ্য ও বহু পুণ্যবশতঃ হইয়া থাকে।" তাহাতে দেবর্ষি শ্রীরামচন্দ্রকে বলেন যে, "যে জগৎমোহিনী মায়া প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি জগৎ প্রসব করিতেছেন, যখন সেই মহামায়া তোমার গৃহিণী—'সা মায়া গৃহিণী তব'—তখন তোমার মত সংসারী আর কে আছে?"

দেবর্ষি চিনিতেন, মহর্ষি বাল্মিকী ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি কয়েক জন ঋষিও চিনিতেন। সকলের নিকট তাঁহারা ধরা দেন নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যাঁহারা বনগমন করেন, তাঁহাদের

মধ্যে সীতাদেবীকে বর্ণনা করিবার কালে মহাকবি বাল্মিকী রামায়ণে লিখিয়াছেন—

'রামস্য দয়িতা ভার্য্যা নিত্য প্রাণসমা হিতা।
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্ম্মিতা॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীনামুত্তমা বধূঃ॥"

অর্থাৎ রামের প্রণয়িণী ভার্য্যা, নিত্য প্রাণসমা হিতকারিণী, জনকের কুলে জাতা, মূর্ত্তিমতী দেবমায়া, সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা, নারীগণের শিরোমণি সীতা।"

সীতাকে দেবমায়ার ন্যায় নির্ম্মিতা বা গঠিতা, অর্থাৎ দেব-মায়া বা মহামায়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দেবমায়া বা মহামায়ার লীলা তাই এত অদ্ভুত—এত দুর্ব্বোধ।

শাস্ত্রে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার অর্থাৎ প্রবাসী-পতিবিরহিতা নারীর কর্ত্তব্য বা অবস্থা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহেবাসং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥"

অর্থাৎ তিনি ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, সমাজে উৎসবদর্শন, হাস্য ও পরগৃহে বাস ত্যাগ করিবেন। "প্রোষিতে মলিনা কৃশা" অর্থাৎ তিনি মলিন ও কৃশা হইবেন।

সীতাদেবী লঙ্কায় প্রকৃত প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কবিবর বাল্মিকী তাঁহার সেই অবস্থা রামায়ণে লিখিয়াছেন—

"দশগ্রীবস্তু বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষসীগণৈঃ।
দদর্শ দীনাং দুঃখার্ত্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে॥

অসংবৃতায়ামাসীনং ধরণ্যাং সংশিতব্রতাং।
ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনস্পতেঃ ॥"

অর্থাৎ—"রাবণ রাক্ষসীগণদ্বারা সুরক্ষিতা সীতাকে সমুদ্রমধ্যে অবসন্ন পোত বা নৌকার মত দীন ও দুঃখার্ত্ত দেখিল। তিনি সংশিতব্রতা অর্থাৎ ব্রতনিয়মচারিণী হইয়া আস্তরণহীন ভূমিতে বা মাটিতে উপবিষ্টা রহিয়াছেন; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন বনস্পতি বা সুবৃহৎ বৃক্ষের একটি শাখা ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত রহিয়াছে।"

বিশাল সমুদ্রমধ্যে অর্দ্ধমগ্ন বা মগ্নপ্রায় পোতের দুর্দ্দশার চিত্র, এবং গগনস্পর্শী পাদপের ছিন্ন শাখার দীন চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিতে পারিলে, সেই সময়ের মলিনা ও কৃশা, - দীনহীনা, দুঃসহশোকাকুলা সীতাদেবীর মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যেন সতীধর্ম্মের শাস্ত্রব্যবস্থা মূর্ত্তিমতী হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন!

সে আদর্শচিত্র আজ কোথায়? তাহার শতসহস্র ভাগের এক ভাগ দেখিতে পাইলেও নয়ন জুড়াইয়া যাইত। এই নিষ্কাম সতীধর্ম্মের স্বল্পমাত্রও মহৎ সংসার-ভয় হইতে ত্রাণ করে। ভগবান্ শ্রীগীতায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ দিবার কালে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪০ শ্লোকে) —"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" অর্থাৎ এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগধর্ম্মের অণুমাত্রও মহৎভয়—এই সংসার-ভয় —হইতে পরিত্রাণ করে। সীতাদেবী নিজ জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়—পদে পদে—এই নিষ্কাম সতীধর্ম্মের সমুজ্জ্বল চিত্র

জগতের সম্মুখে ধরিয়া গিয়া অনুপম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ আদর্শ শূকরীপালে মণিমুক্তা নিক্ষেপের ন্যায় নিষ্ফল বা বৃথা যেন না হয়—এইরূপ আশা করা অস্বাভাবিক নহে।

"সতীত্ব সোণার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এ হেন রতন॥
রাজরাজেশ্বরী যদি এ ধন হারায়।
শূকরী সমান সবে ঘৃণা করে তায়॥"

সতীশিরোমণি সীতাদেবী এই শিক্ষার জলন্ত চলচ্চিত্র নিজ জীবনে প্রতি পদে দিয়া গিয়াছেন। হায়! এখন কি শূকরীপালে সে রত্ন ছড়ান হইতেছে? শূকরীকে ঘৃণা মনুষ্যেই করে, শূকর কখনও ঘৃণা করিতে পারে না। শূকরের নিকট শূকরী আদরেরই বস্তু। তাই কি আজকালকার অসতী শূকরীগণ ঘৃণিতা নহে? তাই কি আজ ভদ্রসমাজের বহির্ভূতা পতিতা কলঙ্কিনী নারীগণের চরিত্রেও বিষধর ভুজঙ্গমগাত্রের মসৃণতা ও বর্ণবিচিত্রতা আদি গুণের ন্যায় গুণ সকলের উল্লেখে তাহাদের চরিত্র-মাধুর্য্য দেখিতে ও দেখাইতে এত উপন্যাস এত যত্নে রচিত ও আদরে পঠিত হইতেছে? কত অবিদ্যাই বিদ্যা বলিয়া বাহির ও জাহির হইতেছে? তাই কি আজ রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতার রত্নের আকরে সতীরত্ন আর না পাইয়া কৃত্রিম চাকচিক্যশালী অতি নিকৃষ্ট বস্তুও প্রকৃত রত্ন বলিয়া অনুমিত ও হিন্দুসমাজের কণ্ঠে আদরে ধৃত হইবার উপদেশরাশি লিখিত ও পঠিত হইতেছে? মা ধরিত্রীনন্দিনি! আর একবার তোমার জননীকে দ্বিধা বিভক্ত হইতে বলিয়া

সতীত্ব।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে তাঁহাব উদরসাৎ করাইয়া এ ভারতের নাম লোপ কর মা! আর না মা! আর না; অসহ্য! অসহ্য!! তোমার আদর্শের সতীত্ব-রাজসিংহাসনের এত অমর্য্যাদা আব দেখাইতে দিও না মা! যদি সেই সিংহাসন প্রকৃতপক্ষে শূন্যই হইয়া থাকে, তবে সে শূন্যতা দূব করিবার জন্য—সে সিংহাসন পূর্ণ করিবার জন্য—দেবীব স্থলে অসতী দানবীর আসন তথায় পাতিতে দিও না মা! রক্ষা কর মা! রক্ষা কর। নিস্তারিনি! তুমি ভিন্ন ভারতেব বর্ত্তমান সতীত্ব-দীনতা, আদর্শহীনতা হইতে ভারতকে আর কে নিস্তার করিবে মা? নিস্তার কর মা! নিস্তার কর। স্বর্গকে আর অধিকতর ঘোর নরকে পরিণত হইতে দিও না মা! নারকীয় কীটদলের উৎসাদন সাধন কর মা! ধৃষ্টতার বিনষ্ট সীমাচিহ্নটির পুনঃস্থাপন কর মা! অসতীত্বের এ অমানিশা প্রভাত হউক মা! ব্যভিচাবের ভেরিবাদক পেচক-পেচকীদলের এ বিকট চিৎকার নিস্তব্ধ হউক মা! আবাব সতীত্ব-তপন ভারত-গগনে উদিত কর মা! আবার সতীতেজে ভারতকে পূর্ব্ব মত পূর্ণভাবে আলোকিত কর মা! সতীত্বের সেই পূর্ব্ব আলোক এরূপ ভাবে একেবারে নির্ব্বাপিত করিও না মা! সদাচার সংযম আদি সদ্‌গুণরাশিকে এরূপে একেবারে নির্ব্বাসিত করিও না মা! ইচ্ছাময়ি মা! তোমার ইচ্ছা ভিন্ন তোমার এই সৃষ্টিতে ত কিছুই হয় না মা! আর একবার ভারতের প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত কর মা! আর এক বার ইচ্ছা কর মা! ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ থাকুক মা! হিমাচলকে আর কৃষ্ণসাগরে পরিণত করিয়া রাখিও না মা! সতীর জন্ম-

ভূমিকে আর অসতীর লীলাক্ষেত্র—প্রেতভূমি করিও না মা! বর্ত্তমান ঘোর তমোগুণের আর প্রশ্রয় দিওনা মা! প্রাসাদ-শিখরকে আর বজ্রাঘাতে ধূলিসাৎ করিও না মা! শ্রীক্ষেত্রকে এরূপ বিশ্রীক্ষেত্রে পরিণত হইতে দেখিলে কে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে মা? তাই বলি, কোপ সম্বরণ কর মা! প্রসন্না হও, মা বরদে! প্রসন্না হও! তোমার প্রসন্নতাই মুক্তির কারণ মা! তুমি একবার প্রসন্না হইয়া ভারতে সতীত্বের মুক্তি বিধান কর মা! অসতীত্বের—ব্যভিচারের—অসংযমের কঠিন নিগড় হইতে তোমার জন্মভূমি—ভারতভূমিকে মুক্ত কর মা! মুক্ত কর।

সীতাদেবী স্বামীর মঙ্গলেচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া লক্ষ্মণকে নিদারুণ বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া বড়ই ব্যথা দিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া আজীবন দারুণ দুঃখ-ভার বহন করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও জগতের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্মণ যখন তাঁহাকে বনে দিয়া আসেন, সেই বনে রাখিয়া আসিবার কালে তিনি বলিয়া দেন—"আমাকে স্বামী যখন ত্যাগ করিয়া বনবাসে পাঠাইয়াছেন, তখন আর আমি তাঁহার পত্নীত্বের দাবী করিতে পারি না, এবং আমি এখন তাঁহার একজন প্রজাভাবেই রহিব। কিন্তু তাঁহার প্রজাও তাঁহার পত্নীর অপেক্ষা অধিক প্রিয়; সেহেতু স্বামী যেন এখন আমাকে এক জন প্রজাভাবেই স্মরণ রাখেন।"

সতীত্বের এ গভীরতার তুলনায় মহাসাগরও গোষ্পদ সমান।

সতীত্বের এ উচ্চতার তুলনায় হিমালয়ও তৃণ সমান। সীতা দেবীর সতীত্বের গভীরতা ও উচ্চতা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়।

যেমন কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শনই, সেইরূপ সীতাচরিত্র-দর্শনই সীতাচরিত্র-দর্শনের ফল। উহা বর্ণনা করা বাক্যাতীত —সাধ্যাতীত।

৪। সাবিত্রী।

সতীকুল-চূড়ামণি সাবিত্রী মানবদেহেও দেবী ছিলেন। মানব-জীবন অনিত্য ও অসার,—সুখদুঃখও অনিত্য ও অসার এবং নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে আবদ্ধ ও চালিত হয়,—এবং পতিই পরম গুরু ও সতীধর্ম্মই সার ধর্ম্ম,—এই ধ্রুব বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধির বিপর্য্যয় করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সন্তান-সন্ততিহীন অশ্বপতি রাজার অনেক দেবারাধনার ফল এই কন্যারত্ন। অতীব আদরে পালিতা ও জ্ঞানশাস্ত্রে বিচক্ষণা হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পর, একদিন তিনি সখী পরিবৃতা হইয়া মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় রাজ্যচ্যুত বৃদ্ধ রাজা দমসেন, স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সত্যবানের সহিত বাস করিতেন। সাবিত্রী পরম সুন্দরী ছিলেন। সত্যবান্‌ও পরম রূপবান্ ছিলেন। সত্যবানের হীন অবস্থা দেখিয়াও সাবিত্রী তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতামাতা তাহা জ্ঞাত হইয়া রাজকন্যাকে ভিখারীর হস্তে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হন, কিন্তু তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও নিরস্ত করিতে পারেন নাই। পরে দেবর্ষি নারদ —ঐ সত্যবান্ অল্পায়ুঃ, আর এক বৎসর মাত্র বাঁচিবেন, সেই হেতু ঐ বিবাহ অনুচিত, এ কথা বলিলেও সাবিত্রী সত্যবান্‌কেই পতিত্বে বরণ করিতে স্থির করিয়া বলেন—"যদি বৈধব্য-যাতনা ভাগ্যে থাকে, তবে কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিবেন না, এবং এই অনিত্য সংসারে জীবন অনিত্য, মৃত্যুমুখে অগ্র-পশ্চাৎ সকলেই পতিত হইবেন ; শরীর উৎপত্তির সঙ্গেই মৃত্যুর উৎপত্তি : মৃত্যুকে ভয় করিতে নাই,—ধর্ম্মই মানবদেহধারণের সার ; ধর্ম্মপালন না করিলে নরকগমন করিতে হয়, এবং শারীরিক সুখদুঃখ মিথ্যা।"

তাঁহার দেহে এমন এক অপূর্ব্ব তেজঃ ছিল যে, তাহা দেখিয়া বিবাহার্থী রাজপুত্রগণ তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।

পরে সত্যবান্‌কে তপোবন হইতে আনাইয়া রাজা অশ্বপতি তাহার সহিত সাবিত্রীর বিবাহ দেন, এবং বিবাহের পর সাবিত্রী রাজভোগ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত তপোবনে গমন করেন, এবং তথায় কুটিরে অতি দরিদ্রজীবন যাপন করেন। সত্যবান্ বন হইতে ফলমূল ও কাষ্ঠাদি আনিয়া বৃদ্ধ পিতামাতা ও স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল। একদিন খাদ্যাদির অভাব হেতু দিবা অবসানে অসময়ে সত্যবান্ বনগমনে উদ্যত হইলে সাবিত্রী

তাঁহার অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার অনুগমন করেন। সত্যবান্ গহন বনে প্রবেশ করিয়া ফল আহরণের পর কাষ্ঠ আহরণের জন্য এক বৃক্ষের শুষ্ক শাখা ছেদন করিতে করিতে শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া নামিয়া আসেন। সাবিত্রী নিজ অঞ্চল পাতিয়া বৃক্ষতলে তাঁহার শয্যা করিয়া দেন, এবং আপন উরুদেশে তাঁহার মস্তক রাখিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পরে সত্যবানের প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে যমদূত সত্যবানের মৃতদেহ লইতে আসিয়া সাধ্বী পতিব্রতা রমণীর পবিত্রদেহনির্গত তেজঃপুঞ্জ দর্শনে তাহা স্পর্শ করিতে সাহস পাইল না। অনন্তর স্বয়ং যমরাজ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি শব ত্যাগ করিয়া অন্তরে দণ্ডায়মান হউন। পরে ধর্ম্মরাজ সত্যবানের জীবাত্মা বন্ধন করিয়া লইয়া চলিলেন। সাবিত্রী স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে করিতে তাঁহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যমরাজ সাবিত্রীকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও তিনি চলিতে থাকেন, এবং সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া যমরাজকে বলেন যে, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। সত্যবানের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। যমরাজ তাহা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া স্বামীর প্রাণ ব্যতীত অপর কোন বর গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বলেন। তাহাতে সাবিত্রী অপুত্রক পিতার পুত্রপ্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়া পিতৃকুল উদ্ধার জন্য বলিলেন। যমরাজ সে বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি

ধর্ম্মরাজের সৎসংসর্গ ত্যাগ করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ধর্ম্মরাজ তাহাতে প্রীত হইয়া স্বামীর জীবন ব্যতীত অপর কোন বর লইতে তাঁহাকে পুনরায় আদেশ করেন। তাহাতে সাবিত্রী শ্বশুরের অন্ধত্ব-মোচন জন্য প্রার্থনা করেন, ও সে বরও প্রাপ্ত হন। কিন্তু তথাপি পুনরায় সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকেন, এবং পতি ভিন্ন সংসার নিষ্প্রয়োজন, ও সংসার মায়ামাত্র ইত্যাদি বৈরাগ্যের কথা বলিতে থাকেন। যমরাজ সাবিত্রীর জ্ঞানগর্ভবাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ও অদ্ভুত পতিভক্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়া পুনর্ব্বাব বর লইবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু সাবিত্রী কোন কথা না বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে যমরাজ আরও দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বব লইবার জন্য আদেশ করেন। তখন সাবিত্রী পতি সত্যবানের ঔরসে তাঁহার গর্ভে একশত পুত্রের জন্ম হউক—এই বর প্রার্থনা করেন। যমরাজ তাহাতে প্রকারান্তরে পতির জীবন ভিক্ষা বুঝিয়া চিন্তিত হইলেন; কিন্তু সতীর মহিমা জগতে ঘোষিত হইবে বলিয়া পাতিব্রত্যের পুরস্কারস্বরূপ অসাধারণ কৃপা করিয়া সে বরও প্রদান করিয়া ফেলেন। তাহাতেই সত্যবান্ পুনর্জ্জীবিত হন। সে রাত্রি জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। যমরাজ উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন —"যাবজ্জীবন এই চতুর্দ্দশী রাত্রিতে ব্রত করিবে। এই চতুর্দ্দশীর নাম 'সাবিত্রী চতুর্দ্দশী' হইল। এই রাত্রিতে যে নারী ব্রত করিবে, সে তোমার ন্যায় সতী হইবে।"

পরে সাবিত্রী ও সত্যবান্ সে রাত্রি সেই বনে এক বৃক্ষে উভয়ে যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে তপোবনে প্রত্যাগমন করেন। সাবিত্রীর মুখে সকলে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হন।

ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে তাঁহার পতিব্রতা-ধর্ম্মের পুরস্কার দিয়াছিলেন। সতীত্ব-বলে সাবিত্রী পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন। সাবিত্রীর গর্ভে সত্যবানের ঔরসে একশত পুত্র জন্মে, ও সত্যবান্ প্রবল পরাক্রান্ত ঐ পুত্রগণ সহায় করিয়া পিতার নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করেন, ও পতিব্রতা সাবিত্রীর সহিত পঞ্চশতবর্ষ অশেষ সুখে রাজ্যভোগ করেন।

সতীধর্ম্মের মহিমায় মহিমান্বিত হইবার জন্য সাবিত্রীকে আদর্শ রাখিয়া শতসহস্রবৎসর কাল হিন্দুসাধ্বীগণ এখনও উক্ত সাবিত্রী চতুর্দ্দশীব্রত পালন করিতেছেন। সতীত্বের সে আদর্শ এখনও ভারতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে ও চিরকাল থাকিবে।

অধুনা অনেকে ইহা ঔপন্যাসিক কল্পনা ও অমূলক অপ্রকৃত কথা মনে করেন। মৃতব্যক্তি কখনও পুনরায় জীবিত হইতে পারে না—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, ও এই নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম হয় না, এই স্থির-সিদ্ধান্তবশে ঐরূপ মনে করেন। কিন্তু যদ্যপি যিশুখৃষ্ট বা ঐরূপ বিদেশী কোন মহাপুরুষ কোন মৃতব্যক্তির প্রাণদান করিয়াছিলেন বলিয়া বিদেশী ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহারা পাঠ করেন, তবে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে এরূপ মনে করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। ইহা অবশ্য কালেরই ধর্ম্ম বলিতে হইবে। যিনি বিশ্বনাথ সদাশিব,—বৈকুণ্ঠে নারায়ণ,—

গোলকে হরিহর,—কালমন্দিরে যমরাজ মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, —যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হইতেছে,—যিনি শক্তিনাথ, —তিনি দয়াপ্রকাশ করিলে, এ শক্তিপ্রকাশ অতি তুচ্ছ। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, প্রকৃতি যাঁহার অধীন, যাঁহার চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময়,—তিনি প্রকৃতির নিয়ম অতিক্রম করিবার শক্তিহীন হইতে পারেন না। প্রহ্লাদ অগ্নিতে ভস্ম হন নাই, — কোন প্রাকৃতিক নিয়মই তাঁহাকে নাশ বা বধ করিতে পারে নাই। সমুদ্রে প্রস্তর ভাসিয়াছে,—সমুদ্র উত্তালতরঙ্গভঙ্গি ও গর্জ্জন ত্যাগ করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়াছে। তপস্যার বলে গ্রহগণের গতিও স্থগিত হইত; অনিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি, দিব্যদৃষ্টিলাভ প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা ও শক্তি, নিজদেহ ত্যাগ করিয়া পরদেহে প্রবেশ ইত্যাদি ক্ষমতা, ভূগর্ভে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়া বহুকাল অবস্থিতি,—এই সমস্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধকার্য্য হইলেও তাহা ত ঘটিতে দেখা যায়। ভগবান্ ভক্তাধীন; ভক্তের জন্য তিনি কি না করিতে পারেন বা না করেন? তাই শ্রীগীতায় নিজেই বলিয়াছেন—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—অর্থাৎ "আমার ভক্তের বিনাশ নাই।" তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। কল্পতরু কি অভিলষিত ফলদানে কাতর হইতে পারেন? শিব কল্পতরু। সতীর জন্য শিব সকল মঙ্গল-বিধানই করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। নতুবা এ জগতে তাঁহার "শিব" বা মঙ্গলময় নাম হইবে কেন? আর তিনি যে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আশ্রিতে আশ্রয়দান যে পরম ধর্ম্ম; ঐ ধর্ম্মপালন যিনি শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন ও যাহার জন্য

তিনি তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে তাঁহার পরম আশ্রিত ও ভক্ত পাণ্ডবগণকে পর্য্যন্ত উৎকট পরীক্ষা করিতে ছাড়েন নাই, সেই পরমধর্ম্ম—ধর্ম্মস্বরূপ তিনি—ধর্ম্মরাজ হইয়া স্বয়ং না পালন করিয়া কি থাকিতে পারেন ?

শ্রীচণ্ডীতে আছে—" কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন " —অর্থাৎ " কুপিত কৃতান্ত দর্শন করিলে কে বাঁচিতে পারে ? " সেইরূপ বলা যাইতে পারে—প্রসন্ন ও সদয়মূর্ত্তি যমরাজের দর্শন পাইলে কে মরিতে পারে ? তাই কথায় বলে—" রাখে কৃষ্ণ মারে কে—মারে কৃষ্ণ রাখে কে ? "

ভক্তিবিশ্বাসকর্ত্তরির সুতীক্ষ্ণ ধারে ভবনিগড়ও কর্ত্তিত হয়। আজ সে তীক্ষ্ণধার নষ্ট হইয়া গিয়া আমরা কতই অধঃপতিত হইয়াছি ও হতাশ হইতেছি।

শ্রীগীতায় (চতুর্থ অধ্যায়, ৫০ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—" অজ্ঞ, জ্ঞানে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট, সংশয় বা সন্দেহপূর্ণ ব্যক্তি নষ্ট হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই। "

তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অবিশ্বাসী আমাদেরও বুদ্ধি নষ্টপ্রায় হইয়াছে। আমাদেরও সে জন্য ইহকালও নাই, পরকালও নাই, কোনও সুখই নাই। আমরা " অন্ধ বিশ্বাসের " বড়ই অপক্ষপাতী। যেন আমরা কত চক্ষুষ্মান্—যেন আমাদের অন্ধতা মোটেই নাই,—যেন আমরা সর্ব্বদর্শী। আগামী কল্য—বা জীবনের এক ঘণ্টা বা এক মিনিট পরে কি হইবে তাহা দেখিবার উপযুক্ত চক্ষুও আমাদের নাই, অথচ

যে লোকহিতকর নিঃস্বার্থপরোপকারী আর্য্যঋষিগণ সেই সত্যাদি যুগে—কত লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ থাকিয়া শাস্ত্রপ্রণয়ণ করিয়া আমাদিগের—তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য অকৃত্রিম স্নেহ ও দয়াপরবশ হইয়া—হিন্দুজীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন,—সেই সকল আপ্তবাক্যে বা ধ্রুবসত্য বেদবাক্যে—আমরা এখন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতে পারি না। অধঃপতনের দারুণ কারণ না থাকিলে কখনই এরূপ ভয়ানক অধঃপতন হইতে পারিত না।

আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের পরীক্ষামতে স্থিরীকৃত মৃতব্যক্তি পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিয়াছে,—এ দৃষ্টান্ত এ ঘোর কলিযুগেও একেবারে বিরল নহে। তুমি স্বেচ্ছায় অন্ধ হইয়া থাকিলে,—দেখিয়াও না দেখিলে,—চক্ষু জোর করিয়া মুদিত রাখিলে,—কে তোমায় দেখাইতে পারিবে? জাগিয়া ঘুমাইলে কে তোমায় জাগাইতে পারিবে?

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র এক কায়স্থ-যুবক যেরূপে যমালয় হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বহু বিজ্ঞ চিকিৎসকের সম্মুখেই ঘটিয়াছিল, এবং সেই নিক্ষেপের শব্দ পার্শ্বের বাটীতেও শ্রুত হইয়াছিল। ঐ ঘটনার অনেক প্রত্যক্ষদর্শী এবং সম্ভবতঃ সেই রোগী ও এক্ষণে নিরোগী ব্যক্তি-তাহা প্রমাণ করিতে পারেন।

অনেক জীবনেই ঐরূপ ঘটনা অনেক ঘটে ও দেখা যায়।

ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

সমাধিস্থ সাধুগণের বাহ্যতঃ মৃতাবস্থা ও পরে বাহ্যজগতে পুনরাগমন ভারতে ত নূতন নহে।

পাশ্চাত্যদেশীয় শিক্ষকগণ যদি আদর্শ হন,—তাহাদের বাক্য যদি বেদবাক্য ও অভ্রান্তসত্য হয়, তবে বলিতে পারা যায় যিনি জড়বাদী জগতের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি বলিয়া মনোনীত হইয়াছিলেন (যাঁহার তুলনায় আমাদের মনু মাত্র ৩টি ভোট ও বুদ্ধদেব মাত্র ৬টি ভোট ও অন্যান্য মহাপুরুষগণ অল্প ভোট পাইয়াছিলেন) সেই মহাকবি সেক্সপীর বলিয়াছেন :—

"There are more things in heaven and earth Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

অর্থাৎ—"হে হোরেসিও! স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক বেশী জিনিষ আছে, যাহা তোমাদের গর্ব্বস্থল দর্শনশাস্ত্রের ও স্বপ্নের অগোচর।"

এ উক্তি কবির প্রত্যক্ষদর্শন বা বিশ্বাসের ফল না বলিয়া কবির কল্পনা বলা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার শিক্ষাদান অধিকাংশই উহার বিপরীতভাবাপন্ন।

যে দেশ ইহকালসর্ব্বস্ব, যে দেশে পরকালের বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রকৃত কোন আদর নাই,—সে দেশে যে ঐ কবিশ্রেষ্ঠকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট দিয়া তাঁহাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া মনোনীত করিবেন, তাহা বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। যে দেশে যিনি যাহা দেখিতে পান,—ধর্ম্মের পরাজয় ও অধর্ম্মের জয়,—সতীত্ব আকাশ কুসুম,—তিনি

তাহাই বর্ণনা করিতে পারেন ; এবং সেই বর্ণনামত সেই দেশে ও সেই ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ভারতের ধর্ম্মশিক্ষা—সর্ব্বত্র সতীত্বের ও ধর্ম্মের জয়, এবং সর্ব্বত্র অধর্ম্মের পরাজয়। সুতরাং ভারতের নরনারীর নিকট তাঁহার লেখনিপ্রসূত ঐরূপ শিক্ষা অতি হেয়, ঘৃণ্য ও অনুদার বলিয়া বিবেচিত হওয়াই সঙ্গত।

ঐ দেশের শ্রেষ্ঠ কবি মিল্‌টন্ (Milton) তাঁহার "কোমাস্" (Comus) নামক পুস্তকে সতীত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সে শিক্ষা লয় কে ? তাহা সে দেশে মাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ঐ পুস্তকে একস্থানে লিখিয়াছেন "But unbelief is blind" অর্থাৎ "অবিশ্বাসী ব্যক্তির চক্ষু নাই— সে কিছুই দেখিতে পায় না।" অন্ধ হওয়া যে কি কষ্টকর, তাহা কবি পরে ভুক্তভোগী হইয়া জানিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম উপদেশে বিশ্বাস অভাবে যে অন্ধতা আনে, তাহা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্ধতা, তাহা তিনি লেখনিমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

শাস্ত্রে লিখিত আছে—"ন চ দৈবাৎ পরং বলং"—অর্থাৎ দৈববল অপেক্ষা অধিক বল জগতে আর নাই। সেই দৈববলে বলী হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। "Spanish Armada" বা স্পেনদেশীয় নৌবহরের আক্রমণ হইতে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে অব্যাহতি লাভ এবং আধুনিক সর্ব্বত্র জয়লাভ ইংলণ্ড দেশের সেই দৈববল বা কৃপা বলা যাইতে পারে। পবিত্র ভারতভূমির সুশাসনদণ্ড যাঁহার হস্তে অর্পিত রহিয়াছে, তাঁহাকে

ভগবানের ইচ্ছায় বা দৈববলে বলী—সর্ব্বত্রজয়ী—তাঁহার রাজ্যে সূর্য্যদেব অস্তগত হন না—দেখিয়া ভারত আনন্দ অনুভব করে সন্দেহ নাই।

সাবিত্রী সেই দৈববলে বলী—দৈবকৃপায় কৃপান্বিতা হইয়া যাহা করিয়া চির আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অসম্ভব বলিয়া সন্দেহ না করাই শাস্ত্রসঙ্গত। সতীতেজঃ মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সে সুধাবিতরণে মৃতের জীবনীশক্তিসঞ্চার বিচিত্র নহে।

হে হিন্দুললনাগণ! হে মাতৃগণ! দেবী সাবিত্রীর সেই আদর্শে আর একবার এই ভারতে আপনাদিগের সতীত্ব সুধাকরের মৃতসঞ্জীবনী সুধা গৃহে গৃহে বিতরণ করুন। আপনাদিগের পতিগণ ধর্ম্ম-জগতে মৃতপ্রায়,—জাগতিক ব্যাপারেও জীবন্মৃত। আর একবার তাঁহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করুন। সকলে সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করুন। পিতৃকুল,—শ্বশুরকুল,—ভব-সাগরের একুল ওকুল—ইহকাল পরকাল—সকল দিক্ উদ্ধার করুন। ভারত ধন্য হউক—ভারতের গৌরব-রবি আবার প্রাচ্যে—পূর্ব্বদিকে—উদিত হইয়া সমগ্র জগতে সতীতেজঃ বিকীর্ণ করুক। জগৎ ধন্য হউক,—জগৎ আপনাদের দৃষ্টান্ত আবার অনুকরণ করুক। ভারতে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইবেন না,—মনুষ্যজন্ম—নারীজন্ম—সার্থক করুন। ভবিষ্যৎ ভারতের আপনারাই জননী, আপনারাই তাহার অদৃষ্টবিধাত্রী।

জননীগণ! আপনারা সাবিত্রী হউন, পতিকে মিথ্যাবান্ না রাখিয়া সত্যবান্ করুন। আপনাদের চরিত্রবলে ভবিষ্যৎ

বংশে সচ্চরিত্র সুসন্তানের জন্মগ্রহণের পথ প্রশস্ত করুন। আপনাদিগের চরিত্রদোষে কুসন্তান জন্মাইবার পথ চিররুদ্ধ করুন—এই মিনতি।

৪। মৈত্রেয়ী।

প্রাচীনভারতে যে সকল সতীশিরোমণি নিজ নিজ জীবনে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন,—কায়, মন ও বাক্যে অপবিত্রতার কণামাত্র না থাকা,—এবং কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে পবিত্রতা রক্ষাই যে পতিব্রতার ধর্ম্ম,—এই মহা শিক্ষা যাঁহারা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ ও জীবন-বৃত্তান্ত প্রদান করা এক্ষেত্রে অসম্ভব। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের আত্মজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য-কাঞ্চনের সহিত সতীত্ব-মণির সংযোগ হইয়া অপরূপ নারীচরিত্র জগতে প্রতিভাত হইয়াছিল। ঐ সকল বিদুষীর মধ্যে গার্গী, লোপামুদ্রা, খনা, লীলাবতী, বিশ্ববারা ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে—রাজর্ষি জনকের রাজত্বকালে তাঁহার রাজধানী "জনকপুর" বিদ্যার আদরহেতু অনেক বিদ্বান ও বিদুষীর আবাসস্থল ছিল। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তথায় বেদ-বিদ্যাদান করিতেন। মিত্রনামক ব্রাহ্মণকুলতিলক রাজর্ষি জনকের প্রধান অমাত্য ছিলেন। বিদুষী মৈত্রেয়ী উক্ত রাজ-অমাত্য মিত্রের কন্যা ছিলেন।

বৈশম্পায়নের সুযোগ্য শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য পাণ্ডিত্যে অল্প

সতীত্ব।

ভগবানের ইচ্ছায় বা দৈববলে বলী—সর্ব্বত্রজয়ী—তাঁহার রাজ্যে সূর্য্যদেব অস্তগত হন না—দেখিয়া ভারত আনন্দ অনুভব করে সন্দেহ নাই।

সাবিত্রী সেই দৈববলে বলী—দৈবকৃপায় কৃপান্বিতা হইয়া যাহা করিয়া চির আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অসম্ভব বলিয়া সন্দেহ না করাই শাস্ত্রসঙ্গত। সতীতেজঃ মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সে সুধাবিতরণে মৃতের জীবনীশক্তিসঞ্চার বিচিত্র নহে।

হে হিন্দুললনাগণ! হে মাতৃগণ! দেবী সাবিত্রীর সেই আদর্শে আর একবার এই ভারতে আপনাদিগের সতীত্ব সুধা-করের মৃতসঞ্জীবনী সুধা গৃহে গৃহে বিতরণ করুন। আপনা-দিগের পতিগণ ধর্ম্ম-জগতে মৃতপ্রায়,—জাগতিক ব্যাপারেও জীবন্মৃত। আর একবার তাঁহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চা-রিত করুন। সকলে সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করুন। পিতৃকুল,—শ্বশুরকুল,—ভব-সাগরের একুল ওকুল—ইহকাল পরকাল—সকল দিক্ উদ্ধার করুন। ভারত ধন্য হউক—ভারতের গৌরব-রবি আবার প্রাচ্যে—পূর্ব্বদিকে—উদিত হইয়া সমগ্র জগতে সতীতেজঃ বিকীর্ণ করুক। জগৎ ধন্য হউক,—জগৎ আপনাদের দৃষ্টান্ত আবার অনুকরণ করুক। ভারতে জন্ম-গ্রহণের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইবেন না,—মনুষ্যজন্ম—নারীজন্ম—সার্থক করুন। ভবিষ্যৎ ভারতের আপনারাই জননী, আপনারাই তাহার অদৃষ্টবিধাত্রী।

জননীগণ! আপনারা সাবিত্রী হউন, পতিকে মিথ্যাবান্ না রাখিয়া সত্যবান্ করুন। আপনাদের চরিত্রবলে ভবিষ্যৎ

বংশে সচ্চরিত্র সুসন্তানের জন্মগ্রহণের পথ প্রশস্ত করুন। আপনাদিগের চরিত্রদোষে কুসন্তান জন্মাইবার পথ চিররুদ্ধ করুন—এই মিনতি।

৪। মৈত্রেয়ী।

প্রাচীনভারতে যে সকল সতীশিরোমণি নিজ নিজ জীবনে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন,—কায়, মন ও বাক্যে অপবিত্রতার কণামাত্র না থাকা,—এবং কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে পবিত্রতা রক্ষাই যে পতিব্রতার ধর্ম্ম,—এই মহা শিক্ষা যাঁহারা দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ ও জীবন-বৃত্তান্ত প্রদান করা এক্ষেত্রে অসম্ভব। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের আত্মজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য-কাঞ্চনের সহিত সতীত্ব-মণির সংযোগ হইয়া অপরূপ নারীচরিত্র জগতে প্রতিভাত হইয়াছিল। ঐ সকল বিদুষীর মধ্যে গার্গী, লোপামুদ্রা, খনা, লীলাবতী, বিশ্ববারা ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে—রাজর্ষি জনকের রাজত্বকালে তাঁহার রাজধানী "জনকপুর" বিদ্যার আদরহেতু অনেক বিদ্বান ও বিদুষীর আবাসস্থল ছিল। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তথায় বেদ-বিদ্যাদান করিতেন। মিত্রনামক ব্রাহ্মণকুলতিলক রাজর্ষি জনকের প্রধান অমাত্য ছিলেন। বিদুষী মৈত্রেয়ী উক্ত রাজ-অমাত্য মিত্রের কন্যা ছিলেন।

বৈশম্পায়নের সুযোগ্য শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য পাণ্ডিত্যে অল্প

বয়সেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারিণী গার্গী তাঁহার সহিত গভীরজ্ঞানগর্ভ বিষয় লইয়া তর্ক ও আলাপ করিয়া প্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী ত্রিশৎবর্ষীয় যুবা মহাপণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত গার্গীর শাস্ত্রচর্চ্চার সময় সেই বিদূষীর সহিত উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়া অল্প বয়সেই আত্মজ্ঞানলাভ জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন। যখন তঁাহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ, তখনও উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তিনি জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন এবং বিশ্বপ্রেমিকার স্বপ্ন-রাজ্যে বাস করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের অসামান্য জ্ঞানবত্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাকে এই স্থিরসঙ্কল্পে উপনীত করাইয়াছিল যে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী অথবা গার্গীর ন্যায় চিরব্রহ্মচারিণী হইবেন। তাঁহার পিতাও কন্যার ঐরূপ মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছিলেন; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য তখন বিবাহ করিয়া পত্নী কাত্যায়নীসহ বাস করিতেছিলেন দেখিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই।

কাত্যায়নী নিপুণা গৃহিনী ছিলেন এবং পতিসেবা দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিতেন বটে, কিন্তু বিদুষী না হওয়ায়, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া তাদৃশ সুখী হইতেন না।

কিছুদিন পরে যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী কাত্যায়নীর সম্মতি লইয়া মৈত্রেয়ীকে বিবাহ করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীদ্বয়কে লইয়া তপোগৃহে বসিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মকথায় ও উপদেশে সুখে কালাতিপাত করিতেন। মৈত্রেয়ী স্বামীর সহিত

ধর্ম্মসম্বন্ধে বাদানুবাদে গভীর তত্ত্বসকল মীমাংসা করিয়া লইয়া আত্মজ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত করত পরম সুখানুভব করিতেন। ধর্ম্মচিন্তাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল। তিনি কখনও জাগতিকভাবে যৌবনসুলভ পতিসহবাস কামনা করেন নাই। রাত্রিকালে শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে নিদ্রার সময় হইলে যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমা পত্নী কাত্যায়নীকে লইয়া শয়ন-গৃহে গমন করিতেন, এবং মৈত্রেয়ী সেই তপোগৃহেই থাকিয়া ভগবানের চিন্তা ধ্যান আদিতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত যাপন করিতেন।

যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের জীবন হইতে দেখা যায় যে, তিনি তাঁহাদের ধর্ম্মগুরুস্বরূপ তাঁহাদিগকে সৎশিক্ষা দ্বারা ভোগের স্থলে ত্যাগের শিক্ষা দিয়া অমৃত-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী স্বামীর ধর্ম্মালোচনায় সহ-ধর্ম্মিণীর অভাব পূরণ করিয়া তাঁহাকে পরম সুখী করিয়া-ছিলেন। কখনও তিনি আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সাধ করেন নাই। সেহেতু তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই। সতী নারীর পরমগুরু পতির নিকট সন্তান অপেক্ষা সহস্রগুণ আদরের ও প্রিয় বস্তু—সংসারে আত্মজ্ঞান ও অমৃতত্ব—লাভ করিয়া তিনি জীবন ধন্য করিয়া জগতে অলৌকিক আদর্শ ও অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে উদ্যত হন ও তাঁহার সম্পত্তি উভয় স্ত্রীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে চাহেন, তখন মৈত্রেয়ী বিষয় ও ধন আত্মোন্নতি ও

অমৃতত্বলাভের অন্তরায় জ্ঞাত থাকায় তাহা তুচ্ছবোধে গ্রহণ করেন নাই, এবং স্বামীর নিকট "অমৃতত্ব" লাভের জ্ঞান ভিক্ষা করেন। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দেন—"প্রিয়ে! কেহ কখনও পতির জন্য পতিকে ভাল বাসে না,—পতির মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছেন, সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই পতি এত প্রিয় বোধ হয়। কেহ কখনও পত্নীর জন্য পত্নীকে ভাল বাসে না,—পত্নীর মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছেন, ও সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই পত্নী এত প্রিয় বোধ হয়। যত কিছু দ্রব্য বল, তৎসমুদায়ের জন্য তাহারা প্রিয় বোধ হয় না,—তাহাদের মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই সেই সমুদয় দ্রব্যকে এত প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। প্রিয়ে! একমাত্র আত্মাই দর্শন, মনন, শ্রবণ ও ধ্যান করিবার বস্তু।"

স্বামীর নিকট এই আত্মজ্ঞানলাভশিক্ষাই মৈত্রেয়ীর স্বামীর সম্পত্তির কোন অংশ গ্রহণ না করার হেতু হইয়াছিল, এবং তিনি অবশিষ্ট জীবন নির্জ্জনবনবাসিনী হইয়া ভগবানের বা আত্মার ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ও পরে আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করত অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

সতী মৈত্রেয়ীর এই আদর্শ চরিত্র, দেহসর্ব্বস্ব, ইহকাল-সর্ব্বস্ব আধুনিক হিন্দু নরনারীর নিকট কি স্বর্গের ছবি বলিয়া মনে হয় না? সে ছবির আদর্শে কেহ কি আপন চরিত্র-চিত্র অঙ্কন জন্য তুলিকাধারণ করিতে চাহেন? ভোগসুখের

অস্থায়ী—অনিত্য—তুচ্ছ আনন্দের সহিত ত্যাগ-সুখের স্থায়ী—নিত্য—অপার আনন্দ—স্বর্গনরক ব্যবধানজ্ঞানে, সেই ত্যাগ-সুখলাভের স্পৃহা কি কাহারও হৃদয়কে বিচলিত করে? সপত্নী থাকা সত্ত্বেও পতিহস্তে পড়িয়া স্বামীকে বিন্দুমাত্র অসুখী করার কারণ জীবনে না দিবার যে মহিমা,—তাহা কি আধুনিক কালে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুকরণযোগ্য নহে? মৈত্রেয়ী-জীবনের ভাব-ধারার এক বিন্দু পাইলে বর্ত্তমান নারীকুল কি ধন্য হন না? নিশ্চয়ই হন।

মৈত্রেয়ী নারী হইয়াও দেহে আত্মবোধ করেন নাই। দেহ আত্মার আধার এই বোধে দেহধারণ করিয়া সেই পরমারাধ্য আত্মার পূজাই করিয়া গিয়াছেন। মন্দির মধ্যস্থিত দেব-বিগ্রহের পূজার জন্যই মন্দিরের আদর, তাহার জন্যই মন্দিরের সৌন্দর্য্যবিধান ও সংস্কার সাধিত হয়। দেববিগ্রহ বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য মন্দিরের পারিপাট্য সাধন করিলে যে দশা হয়, এক্ষণে কি তাহাই দেখা যাইতেছে না? "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"—অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনের প্রথম সহায় হেতু শরীর রক্ষা করা হয়। ধর্ম্ম ভুলিয়া নানা অধর্ম্ম সাধনের সহায়তার জন্য শরীর নহে। ধর্ম্মলাভের সহায়তার জন্য শরীর ধারণ ও রক্ষার প্রয়োজন; নতুবা অতি পবিত্র নারী-দেহ মাত্র শারীরিক সুখসম্ভোগ জন্য ও রাশি রাশি কুসন্তান উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ সৃষ্ট হয় নাই। যে পুষ্প দেবতার পূজার দ্রব্য, তদ্দ্বারা দানবের পূজা করিলে কি ঘোর দুঃখের বিষয় হয় না? দেহ-পরীক্ষা দ্বারা দেহ-জ্ঞান লাভ করিলে এই পঞ্চভূতের সমষ্টি—

রক্তমাংস-অস্থিবসাদিযুক্ত এই দেহ—যে অতি অপবিত্র, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পঙ্কে উৎপন্ন হইলেও—মূলে পঙ্ক থাকিলেও—পদ্ম দেব-পূজায়—দেব-পদে অর্পিত হয়। শাস্ত্রসঙ্গত উপায়ে এই দেহ-পদ্ম দ্বারা সেই পরমারাধ্য সর্ব্বতেজোময় ও সর্ব্ববীজময় ভাস্কররূপী পরম-পুরুষের পূজা করিতে পারিলে, তাঁহার কৃপা-করে এই দেহমধ্যস্থিত চতুর্দ্দল, ষড়দল, দশদল, দ্বাদশদল, ষোড়শদল, দ্বিদল ও সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত করার সন্ধান ও সাফল্যলাভ করিতে পারিলেই, মনুষ্য-দেহ-ধারণ সার্থক হইয়া যায়। বারম্বার এই মৃত্যু-সংসার-পথে আর যাতায়াত করিতে হয় না। নতুবা মদস্রাবী মদমত্ত হস্তীর ন্যায় নরনারী দেহ-পদ্ম বনে—এই সংসার-সরোবরে—অবগাহন করিয়া ক্রীড়া ও তাহা নষ্ট করিলে, এবং এই সংসার-সরোবরের তীরস্থিত ধূলি মাখিতে থাকিলে, মলিনত্ব আর কাটে ন ংসারের ধূলি-ধূসরিত-দেহ পুনঃ পুনঃ ধারণ করিতে হয়। দুর্লভমনুষ্য-দেহ ধারণের উদ্দেশ্য আর সিদ্ধ হইতে পায় না: অসিদ্ধিতেই শত শত জন্ম কাটিয়া যায়।

এই দেহ-পঙ্কজও দেব-পূজার জন্যই সৃষ্ট হয়। কলুষ-কালিমায়, পাপ-রক্তে সিক্ত করিয়া অপবিত্র ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কাম-পূজার জন্য নরনারীর দেহ সৃষ্ট হয় নাই। এ কুসুম কুসুমায়ুধের চির প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে নিয়ত আহুতি প্রদান করিবার জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই মায়াময় সংসার মায়ার আবরণে আবৃত। আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা সেই মায়ার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া যথার্থ দৃষ্টিলাভে সেই সত্যস্বরূপ নিত্যবস্তুর

উপলব্ধিই মনুষ্যদেহধারণের চরম উদ্দেশ্য। যথার্থ পাণ্ডিত্যও সেইজন্য আদরণীয়। যিনি যথার্থ পণ্ডিত,—যিনি প্রকৃত চতুর, —তিনি মায়ার প্রধান লালাক্ষেত্র—এই নরনারীদেহের এই মায়াচর্ম্মাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেখিয়া, এই নশ্বর দেহের প্রকৃত বা স্বরূপ জ্ঞান লাভ দ্বারা বিরতিলাভ করেন, ও পণ্ডিত-মূর্খগণই এই নরনারীদেহে রতি অনুভব করেন।

'অমেধ্যপূর্ণে ক্রিমিজালসঙ্কুলে
স্বভাবদুর্গন্ধবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥" —অর্থাৎ—

"কৃমিজাল ও অপবিত্রতায় পূর্ণ, স্বভাবতঃ অভ্যন্তরে দুর্গন্ধপূর্ণ, মলমূত্রভাণ্ড স্বরূপ এই দেহে মূঢ়গণই আদর করে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ইহাকে অনাদর করেন।" বাস্তবিকই যে নর নারী-দেহ-সৌন্দর্য্যে মানবগণ বিমোহিত,—যাহার জন্য নরহত্যা আদি, করিতেছে না এমন, পাপকার্য্যই নাই,—যে নধর-অধর-সুধা-লাভের জন্য লালসার উগ্র উত্তেজনায় মানব সর্ব্বদাই উত্তেজিত,—যে সঙ্গ-কামনায় কামাতুর মোহান্ধ হইয়া মহা অন্ধের ন্যায় পাত্রাপাত্রবোধে—হিতাহিতবোধে—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধে জলাঞ্জলি দিয়া নরপশুর অধম হইতেও মানব কুণ্ঠিত নয়, এরূপ সেই অপূর্ব্ব মোহিনীনারীদেহের বা মোহননর-দেহের সেই মায়া-আবরণ, সেই সূক্ষ্ম চর্ম্ম খানি সেই দেহ হইতে উন্মুক্ত করিয়া মানস-চক্ষে—মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া দেখুক,—দেখিবে কি ভয়ানক বিভৎস চিত্র! আর তাহা স্পর্শ করিতেও প্রবৃত্তি

থাকিবে না ; ঘৃণায়--লজ্জায়—ভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া পলায়ন' করিবে। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার বিশ্ববিমোহিনী লীলা দেখিতে পাইবে। সে দৃশ্য দেখিয়া নর-নারীর দেহ ভোগের বস্তু নহে, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগেরই বস্তু—ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর শিক্ষায় দেহস্থিত আত্মার পূজায় মনোনিবেশ করিয়া মানবজীবন ধন্য হইয়া যাইবে ;—এই অসার দেহ হইতেই সার হইতে সারবস্তুর উপলব্ধি হইবে। তখন এ দেহ থাকুক বা যাউক তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না—এই জ্ঞান হইবে।

"যংলব্ধা চাপরংলাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥"

—অর্থাৎ "যাহা পাইয়া, অপর লাভকে তাহার অপেক্ষা অধিক মনে করে না, এবং যে অবস্থায় থাকিয়া মহাদুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না—"এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও অবস্থা লাভ হইবে। সে জ্ঞান লাভ করিলে অপর কোন লাভই তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইবে না, এবং সে জ্ঞানে স্থিতি হইলে সংসারের দারুণ দুঃখেও বিচলিত করিতে পারিবে না।

ঐ ব্রাহ্মী স্থিতিলাভই—ঐ আত্মজ্ঞানলাভই মৈত্রেয়ীদেবীর "অমৃতত্ব" ও তাহাতেই তাঁহার এ মরজগতেও অমরত্ব। কীর্ত্তিই কীর্ত্তিমান্ ও কীর্ত্তিমতীকে যাবৎ জগৎ জীবিত রাখে। জীবন-সূর্য্য অস্তগত হইলেও তাহার সুচারু ছটা জগতে প্রকাশিত থাকে। মৈত্রেয়ী দেবীর "অমৃতত্ব" তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভান্তে দেহপাতে মুক্তি এবং তাঁহার দেবত্ব বা দেবভাবপ্রাপ্তি ও অক্ষয়

কীর্ত্তির পরিচয় এ জগতে বিতরণ করিতেছে। তাই বলে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" অর্থাৎ কীর্ত্তিই এজগতে কীর্ত্তিমান্ বা কীর্ত্তিমতীকে চিরজীবী—চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। দেবী-মৈত্রেয়ীর নাম তাই তাঁহার পতি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নামের সহিত চিরজড়িত থাকিয়া হিন্দুর হৃদয়ে চিরপূজিত রহিয়াছে ও রহিবে।

৬। লোপামুদ্রা।

আর্য্য ঋষিপত্নীগণ যেরূপভাবে নারীধর্ম্ম পালন করিয়া জীবন যাপন করিতেন, তাঁহাদের সেই স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যাবলী দেখিয়াই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ নারী-ধর্ম্মের কার্য্যাকার্য্যসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বিশুদ্ধ ভাষাসৃষ্টির পর ব্যাকরণের উৎপত্তি। আদর্শ সতী নারীগণ সেই দেব-ভাষা, ও শাস্ত্রকারগণ সেই দেবভাষার পারিপাট্য দেখিয়া সতীধর্ম্মের বিধিব্যবস্থারূপ ব্যাকরণের সৃষ্টি করেন।

স্বাভাবিকপ্রতিভাসম্পন্ন সুলেখকগণের রচনা ব্যাকরণের বিধিনিষেধ অতিক্রম করে না। নতুবা ব্যাকরণের নিয়ম সম্যক্ শিখিয়া তাঁহারা লিখিয়া যান নাই। ব্যাকরণের মিল না হইলেও সে সব লেখকের কোন অশুদ্ধিকে "আর্ষপ্রয়োগ" বলা হয়। লেখকের পর তবে সমালোচকের উৎপত্তি। সমালোচকের পর লেখকের সৃষ্টি হয় না। লেখক ও সমালোচকে অনেক প্রভেদ।

অগস্ত্য ঋষির পত্নী লোপামুদ্রার জীবনযাপনপ্রণালী হইতে উহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

সতীত্ব।

স্কন্দ পুরাণের—পূর্ব্বার্দ্ধে—চতুর্থ অধ্যায়ে সুরগুরু বৃহস্পতির মুখে অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রাসম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছিল—

বৃহস্পতি বলিলেন—"হে মহাভাগ অগস্ত্য! যাঁহার কথায় লোকের পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেই তোমার সহধর্ম্মিণী এই কল্যাণী পতিব্রতা লোপামুদ্রা তোমার দেহচ্ছায়ার তুল্য। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, শাণ্ডিল্যা, সতী, শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা ও স্বাহা,—পতিব্রতার মধ্যে এই লোপামুদ্রাকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন, তদ্রূপ অন্য কাহাকেও করেন না, ইহা নিশ্চয়। হে মুনে! তুমি আহার করিলে ইনি আহার করেন, তুমি অবস্থান করিলে ইনি অবস্থিতা হন, তুমি নিদ্রিত হইলে ইনি নিদ্রা যান, আবার তোমার পূর্ব্বে জাগরিতা হন। অলঙ্কারবিহীনা হইয়া কদাচ তোমাকে দর্শন দেন না; কার্য্যবশতঃ তুমি প্রবাসে যাইলে সকল প্রকার ভূষণ পরিত্যাগ করেন। তোমার আয়ুর্বৃদ্ধিকামনায় কখন তোমার নাম ধারণ করেন না এবং অপর পুরুষের নাম ত কদাচ গ্রহণ করেন না। তুমি ইঁহাকে বকিলেও ইনি উত্তর করেন না, তুমি পীড়া দিলেও ইনি প্রসন্নতা পরিত্যাগ করেন না। 'এই কর্ম্ম কর'—তুমি এই কথা বলিলে, 'স্বামিন্! ইহা করাই হইয়াছে মনে করুন'—এই প্রকার বলেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়া সত্বর আগমন করেন এবং বলেন 'নাথ! আমাকে কি জন্য ডাকিলেন—আদেশ করিয়া অনুগৃহীতা করুন।' বহুক্ষণ দ্বারে থাকেন না, দ্বারদেশে শয়নাদি করেন না, অনুমতি

ব্যতীত কাহাকেও কিছু দেন না। তুমি না বলিতেই স্বয়ং সমগ্র পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখেন; নিয়মোদক, কুশ, পত্র, পুষ্প, অক্ষতাদি, যে সময়ে যেটি আবশ্যক, তদনুসারে অবসর প্রতীক্ষা করত অনুদ্বিগ্ন হইয়া হৃষ্টচিত্তে তৎসমস্তই উপস্থিত করিয়া থাকেন। ইনি স্বামীর উচ্ছিষ্ট মিষ্ট, অন্ন ও ফলাদি সেবন করেন, স্বামিদত্ত বস্তু মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন; দেবতা পিতৃ, অতিথি, পরিচারকবর্গ, গো, এবং ভিক্ষুকগণকে অন্ন না দিয়া ইনি আহার করেন না। লোপামুদ্রা গৃহোপকরণ এবং অলঙ্কার বেশ গুছাইয়া এবং পরিষ্কার করিয়া রাখেন; ইনি কার্য্যকুশলা ও মিতব্যয়া; তোমার অনুজ্ঞা ব্যতীত ইনি উপবাস ব্রতাদি করেন না। সভাদর্শন এবং উৎসবদর্শন ইনি দূর হইতে পরিহার করেন। তীর্থযাত্রাদি করেন না কিম্বা বিবাহাদি দর্শনেও গমন করেন না। তুমি যখন সুখে নিদ্রিত বা সুখাসীন অথবা ইচ্ছামত কোন সন্তোষপ্রদ কার্য্যে আসক্ত থাক, তখন অন্তরঙ্গ কার্য্যেও ইচ্ছামত তোমাকে কদাচ উত্থাপিত করেন না; রজঃস্বলা হইয়া তিন দিন তোমাকে আপন মুখ দেখান না, যাবৎ স্নান করিয়া শুদ্ধ না হন, তাবৎ আপনার বাক্যও তোমাকে শুনান না। ঋতুস্নাতা হইয়া স্বামীরই (তোমারই) মুখাবলোকন করেন, কখনই অন্য কাহারও মুখ দেখেন না। তুমি স্থানান্তরে থাকিলে মনে মনে তোমাকে ধ্যান করত সূর্য্যদর্শন করেন। পতিদীর্ঘায়ুষ্কামা পতিব্রতা লোপামুদ্রা হরিদ্রা, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কজ্জল, কাঁচুলি, তাম্বূল, শুভ, মাঙ্গল্য আভরণ, কেশসংস্কার কবরীবন্ধন এবং কর্ণাদিভূষণ বর্জ্জন করেন না। এই সতী,

সতীত্ব।

রজকী, ধর্ম্মবিরুদ্ধ তর্ককারিণী, বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী ও দুর্ভাগার সহিত কদাচ সখিত্ব স্থাপন করেন না। পতিবিদ্বেষিণী রমণীর সহিত ইনি কখন আলাপ করেন না। একাকিনী কোথাও অবস্থান করেন না এবং বিবস্ত্রা হইয়া কখনও স্নান করেন না। সতী লোপামুদ্রা কখন উদূখল, মূষল, সম্মার্জ্জনা কিম্বা জাতার উপর অথবা হামানায় উপবেশন করেন না। ব্যবায সময় বা রতিকাল ভিন্ন কখন প্রগল্‌ভতা করেন না। পতির যাহাতে যাহাতে রুচি, ইনি তৎসমস্তই সর্ব্বদা ভালবাসেন। রমণী পতিবাক্য লঙ্ঘন করিবে না, ইহাই স্ত্রীলোকের ব্রত, ইহাই পরম ধর্ম্ম এবং ইহাই দেবপূজা। ক্লীব, দুরবস্থাপন্ন, ব্যাধিযুক্ত, বৃদ্ধ এবং সুস্থ বা দুঃস্থ—পতি যাহাই কেন হউক না, স্ত্রী পতিকে একেবারেই লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট থাকিবে, পতি বিষন্নবদন হইলে বিষণ্ণা হইবে; সতী নারী সম্পদ্‌বিপদে স্বামীর সমদুঃখ-সুখভাগিনী হইবে। ঘৃত, লবণ, তৈলাদি ব্যয় হইয়া গেলেও পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে 'নাই' বলিবে না এবং আয়াসকর কর্ম্মে পতিকে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থ-স্নানাভিলাষিণী নারী পতি-পাদোদক পান করিবে। একমাত্র পতি স্ত্রীজাতির পক্ষে শিব এবং বিষ্ণু অপেক্ষাও উচ্চ। যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রতোপবাস নিয়ম পালন করে, সে পতির আয়ুঃহরণ করে ও দেহান্তে নরকে যায়। যে নারী স্বামিকৃত ভর্ৎসনায় রোষপরবশ হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্যকুক্কুরী ও বন্যশৃগালী হয়। দৃঢ়সঙ্কল্পপূর্ব্বক পতিপদসেবা করিয়া ভোজন করা স্ত্রীলোকের উচিত। স্ত্রীলোক কখন উচ্চ আসনে বসিবে

-না বা পরগৃহে যাইবে না। লজ্জাকর বাক্য কদাচ বলিবে না, কাহারও অপবাদ করিবে না, কলহ দূরে পরিত্যাগ করিবে। গুরুজনসমীপে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না বা হাস্য করিবে না। যে দুর্ব্বদ্ধি রমণী ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া পাশবৃত্তিচরিতার্থ করে, সে পরজন্মে তরুকোটরবাসিনী ক্রূরা উলূকি (পেঁচা) হয়। যে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া স্বামীকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করে, সে পরজন্মে ব্যাঘ্রী বা মার্জ্জারী হয়। যে নারী পরপুরুষে কটাক্ষ করে, সে জন্মান্তরে কেকরাক্ষা (টেরা) হয়। যে রমণী স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া আপনি কেবল মিষ্টভোজন করে, সে জন্মান্তরে গ্রাম্যশূকরী অথবা আত্মবিষ্ঠাভোজী বাল্য (বাদুড়) পক্ষী হয়। যে স্ত্রী স্বামীকে তুই-তোকারী করে, সে জন্মান্তরে বোবা হয়। যে স্ত্রী সপত্নীর উপর সর্ব্বদা ঈর্ষা করে, সে পুনঃপুনঃ দুর্ভগা হয়। যে স্ত্রী পতির দৃষ্টিশক্তি আবরণ করিয়া পরপুরুষকে দর্শন করে, সে জন্মান্তরে কাণা, কুমুখী এবং কুরূপা হয়। যে স্ত্রী পতিকে বহির্ভাগ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া, প্রীতিসহকারে সত্বর জল, আসন, তাম্বূল ও ব্যজন ফেলাইয়া, পরে যথাসময়ে খেদনাশক উত্তম উত্তম প্রিয়বাক্য এবং পদসেবাদি দ্বারা পতিকে প্রীত করেন, তিনি ত্রৈলোক্যের প্রীতিকারিণী হন। পিতা পরিমিত সুখদাতা, পুত্রও পরিমিত সুখ প্রদান করে, আর স্বামী অপরিমিত সুখদাতা ; নারী সর্ব্বদা তাঁহাকে পূজা করিবে। স্ত্রীলোকের ভর্ত্তাই দেবতা, ভর্ত্তাই গুরু, ধর্ম্ম, তীর্থ এবং ব্রত ; অতএব স্ত্রীলোক সব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পতি-অর্চ্চনাই করিবে। যেমন দেহ জীবনহীন

হইলে তৎক্ষণাৎ অশুচি হয়, তদ্রূপ পতিহীনা নারী সুস্নাতা হইলেও সর্ব্বদা অশুচি। সকল অমঙ্গলের অপেক্ষা বিধবাই অধিক অমঙ্গলা। কোন কার্য্যারম্ভে বিধবা দর্শন করিলে, কোথাও কখন সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এক, মাতা ভিন্ন সকল বিধবাই অমঙ্গলা; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই সব বিধবার আশীর্ব্বাদও সর্পতুল্য বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। কন্যার বিবাহ সময়ে দ্বিজগণ, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, পতির জীবনে মরণে সহচরী হইবে। ছায়া যেমন দেহের, জোৎস্না যেমন চন্দ্রেব এবং সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগামিনী, রমণী তদ্রূপ পতির অনুগামিনী হইবে। যে নারী সহমবণোদ্দেশে গৃহ হইতে শ্মশানে সহর্ষে স্বামীর অনুগমন করে, নিঃসন্দেহ, তাহার পদে পদে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। যেমন আহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) সর্পকে বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করে, সতীও তদ্রূপ পতিকে যমদূতগণের হস্ত হইতে মোচন করিয়া স্বর্গে লইয়া যান। যমদূতগণ সতীকে দর্শন করিবামাত্র, সতীর পতি দুষ্কর্ম্মকারী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দূবে গমন করে। 'আমরা যমদূত, পতিব্রতাকে আসিতে দেখিয়া যেরূপ ভয় পাই, বহ্নি বা বিদ্যুৎ হইতেও আমাদের সেরূপ ভয় হয় না'—ইহা যমদূতেরা বলে। পতিব্রতা-তেজঃ দেখিয়া তপনও অতিমাত্র তাপিত হন, দহনও দগ্ধ হন, এবং সকল তেজঃপদার্থ কম্পিত হয়। মানবশরীরে যত লোম আছে তাবৎ অযুতকোটী বৎসর পতিব্রতা পতির সহিত আমোদ করত স্বর্গসুখ ভোগ করেন। যাঁহার গৃহে পতিব্রতা কন্যা বর্ত্তমান, সেই জনক-জননী ধন্য;

আর যাঁহার গৃহে পতিব্রতা পত্নী আছেন, সেই শ্রীমান্ পতিও ধন্য। পিতৃবংশীয়, মাতৃবংশায় ও পতিবংশীয় তিন তিন পুরুষ পতিব্রতার পুণ্যে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। দুশ্চারিণী রমণী আপনার চরিত্রদোষে পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং পতিকুল—তিন কুলই পাতিত করে, আর তাহারা নিজেও ইহপরকালে দুঃখ ভোগ করে। যে যে স্থানে ভূতলে পতিব্রতার চরণ স্পর্শ হয়, সেই সকল স্থানের ভূমিই মনে করেন,—'আমার এখানে কোন ভয় নাই, এখানে আমি পরম পবিত্র'। সূর্য্যচন্দ্রবায়ুও ভয়ে ভয়ে পতিব্রতাকে স্পর্শ করেন,—তাঁহাদেব উদ্দেশ্য আবাব স্ব স্ব পবিত্রতাসম্পাদন, অন্য কোন প্রকার নহে। জল সর্ব্বদাই পতিব্রতা-স্পর্শ অভিলাষ করে। পতিব্রতা-স্পর্শ হইলে জল মনে কবে—'আজ আমাদের জাড্য দূর হইল,—অন্যকে পবিত্র করিতে অদ্য হইতে সমর্থ হইলাম।' রূপলাবণ্যগর্ব্বিতা রমণী ঘবে ঘরে আছেন, কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রীলাভ কেবল বিশ্বেশ্বরের ভক্তিতেই হইয়া থাকে। ভার্য্যা গৃহস্থের মূল, সুখের মূল, ভার্য্যা ধর্ম্মফলপ্রাপ্তির মূল, এবং বংশবৃদ্ধির মূল। ভার্য্যার সাহায্যেই ইহলোক ও পবলোক জয় করা যায়; ভার্য্যাহীন ব্যক্তি দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য এবং অতিথিসৎকারেও অধিকারী নহে। যাহার গৃহে পতিব্রতা রমণী বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তিই যথার্থ গৃহস্থ; অপতিব্রতা রমণী রাক্ষসী জরার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পতিকে জীর্ণ করে। গঙ্গা-স্নানে শরীর যেমন পবিত্র হয়, পতিব্রতা স্ত্রীব শুভদৃষ্টিতে শরীর তদ্রূপ পবিত্র হইয়া থাকে। যদি দৈবাৎ স্ত্রী কোনরূপেই স্বামীর সহমৃতা না হইতে পারে, তাহাহইলেও তাহার বিশুদ্ধভাবে চরিত্র-

রক্ষা করা উচিত। কারণ, চরিত্রনাশে অধোগামিনী হইতে হয়, আর তাহার অকার্য্যের জন্য তাহার পিতামাতা এবং ভ্রাতৃবর্গ স্বর্গে থাকিলেও তথা হইতে চ্যুত হন, ইহার অন্যথা নাই। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্যব্রত পালন করে, সে পরলোকে পুনরায় স্বামীকে পাইয়া স্বর্গভোগ করে। বিধবার কবরীবন্ধন পতির বন্ধনের কারণ; এই জন্য বিধবা সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিযা রাখিবে। বিধবা অহো-রাত্রের মধ্যে একাহার করিবে, দুইবার আহার কখনই করিবে না।"

বৃহস্পতি, তাহার পরে হিন্দুবিধবা জীবনে কিরূপ ব্রত-নিয়মাদি পালন করিবেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিয়া বলেন—"বিধবা কখন কঞ্চুক বা রঙ্গিনবস্ত্র পরিধান করিবে না। পতিপরায়ণা বিধবা পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্য করিবে না, এবং আচারবতী বিধবাও মঙ্গলরূপিণী। এইপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণা পতিব্রতা বিধবাও কদাচ দুঃখ-ভাগিনী হন না এবং অন্তে পতিলোক লাভ করেন। গঙ্গার সহিত পতিব্রতা নারীর কোন ভেদ নাই; পতিব্রতা সাক্ষাৎ হরগৌরীর তুল্য; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিবে। হে পতি-পদ-নিহিত-নয়নে! মহামাতঃ লোপামুদ্রে! এই যে তোমার দর্শন পাইলাম, ইহা আমাদের গঙ্গাস্নানের ফল।"

এই প্রকারে পতিব্রতা রাজপুত্রী লোপামুদ্রার স্তবপ্রণাম করিয়া সর্ব্বার্থবিশারদ বৃহস্পতি প্রণামপূর্ব্বক অগস্ত্য মুনিকে বলিলেন—"তুমি প্রণব ও এই লোপামুদ্রা শ্রুতি; ইনি ক্ষমা ও তুমি স্বয়ং তপঃস্বরূপ; ইনি সৎক্রিয়া ও তুমি তাহার ফল; সুতরাং হে মহামুনে! তুমিই ধন্য! ইনি সাক্ষাৎ পাতিব্রত্য-

তেজঃ, তুমিও সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজঃ, তাহাতে আবার এই তপস্যার তেজঃ। তোমার অনায়াসসাধ্য নহে এমন কি আছে।” ইত্যাদি।

নারীধর্ম্ম বা সতীধর্ম্মের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য আদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বৃহস্পতির ঐ উক্তিতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণে সুরগুরু বৃহস্পতিকেও বুদ্ধিতে পরাস্ত করেন, এবং যাঁহারা বৃহস্পতির বহুসংস্করণরূপ বৃহস্পতির অবতারবিশেষ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গর্ব্বানুভব করেন, এরূপ মহাপণ্ডিত গণের উপস্থিতি অতি তীব্রভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহারা মনু, পরাশর, কি যাজ্ঞবল্ক্য আদি দ্বারা বা বেদপুরাণে কোন কথা বলা হইয়াছে বলিয়াই যে তাহা মানিতে হইবে, ইহা অসহ্য জ্ঞানে তাহা করেন না। তাঁহারা বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া মনের মত না হইলে কাহারও—কিছুরই—প্রাধান্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা স্বাধীনবুদ্ধিতে যাহা ভাল বুঝেন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই গ্রাহ্য করেন না। মনু প্রভৃতিও মানুষ, তাঁহারাও মানুষ; সুতরাং মানুষ হইয়া অবিচারিতচিত্তে অপর মানুষের কথা তাঁহারা মাথা পাতিয়া লইতে রাজি নহেন, এবং পূর্ব্বপুরুষগণ রাজি থাকা স্বীকার করিলেও তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তির প্রখরতা স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধিরূপ “পাইঘটি”তে একসের দুগ্ধ যে ধরেনা, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের কাছে সব সমান, কেহ ছোট বড় নাই। তাহাদের কাছে হাতিটাও জীব, আবার মশাটাও জীব; সুতরাং সব জীবই সমান। তাঁহাদের তর্কশাস্ত্রের যুক্তি বড়ই অদ্ভুত। যাহা হউক, তাঁহারা উক্ত সতী

ধর্ম্মের অনুমোদন করেন কি? করুন বা না করুন, উহাই শাস্ত্রোক্ত নারী-ধর্ম্ম বা সতীধর্ম্ম। তাহার অপালনে সমাজে যে শোচনীয় অবস্থা আনিয়াছে ও আনিতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যে সকল কারণে এই অবস্থা, সে সকল কারণ দূর না করিলে, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন স্বপ্নেরও অগোচর নহে কি?

৭। বেহুলা।

বেহুলা এই বঙ্গদেশের এক অতি উজ্জ্বল সতী-মণি। তাহার জ্যোতিঃ বহুশতাব্দী পূর্ব্বে বিকাশ হইয়া গেলেও দৃষ্টিবোধকারী গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া এখনও ক্ষীণ হইলেও দেখা যাইতেছে। তাঁহার পবিত্র জন্মভূমি এক্ষণে নির্দ্দেশ করা প্রায় অসম্ভব। নিছনীনগরী বেহুলার জন্মস্থান। ইনি একজন বণিকদুহিতা, সায় বণিকের ঔরসে অমলাসুন্দরীর গর্ভে বেহুলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনের বিশেষ ঘটনার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যৌবনে তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব বিকাশ পাইয়াছিল।

বেহুলা অপরূপ রূপবতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের সহিত শারীরিক সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য্য—সেই অলৌকিক কান্তি—কালে পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অতিপবিত্রভাব হইতে সমুদিত সেই হৃদয়-সৌন্দর্য্য জগৎকে বিমোহিত করিতেছে। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য অনিত্য—অস্থায়ী, ও তাহা সমসাময়িক

সমাজে আনন্দ বিধান করিতে পারে; কিন্তু সতী নারীর সুমহৎ প্রাণের অনুপম সৌন্দর্য্য নিত্য ও চিরস্থায়ী। একবার সে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইলে সমগ্র জগৎ তাহা ভোগ করিবার অধিকারী ও ধন্য হয়। প্রকৃত মহত্ব কখন লুকাইয়া থাকেনা; অগ্নি কখনও বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকেনা; তাহার বিকাশ কখনই অকীর্ত্তিত বা গুপ্ত থাকে না। দৈহিক অপরূপ লাবণ্যশালিনী কত মহিলাই ত এ সংসারে আসিয়া কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন, কিন্তু মানসিক অপরূপরূপলাবণ্য-শালিনা সতীর মহিমা কখনও বিলুপ্ত হয় না।

সেই সময়ে চম্পক নগরে চাঁদ সদাগর নামে অন্য এক ধনবান্ বণিক ছিলেন। তিনি পরম শৈব ছিলেন, কিন্তু নিজ উপাস্য-দেবতার কন্যা মনসা দেবীর শক্তি অস্বীকার ও তাঁহাকে কটূক্তি করিয়া তাঁহার সহিত চাঁদ সদাগরের চিরবিবাদ থাকিয়া যায়। তাহার ফলে তাঁহার বহু ধননাশ ও বহু পুত্রনাশ ঘটে। সেই চাঁদ সদাগরের ঔরসে ও সনকা সুন্দরীর গর্ভে নখিন্দর জন্মগ্রহণ করেন। বেহুলা ঐ নখিন্দরের পত্নী। ঐ চম্পক নগরে বেহুলা-জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়।

মনসাদেবীর সহিত বিবাদের ফলে নখিন্দর বিবাহরাত্রিতে অচ্ছিদ্র লৌহনির্ম্মিত বাসরগৃহে থাকা সত্ত্বেও সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। বিবাহ উৎসব ঘোর শোকবিষাদে পরিণত হয়।

বেহুলা সতীশিরোমণি সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়া—সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া—মৃতপতির প্রাণ ফিরাইয়া পাইবার প্রয়াস পান। সেজন্য তিনি শ্বশুর শাশুড়ী ও পিতামাতা সকলের

নিকট বিদায় লইয়া একাকী এক কদলীবৃক্ষের ভেলক—"মান্দাস" —প্রস্তুত করাইয়া তদুপরি মৃতপতিকে লইয়া নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইবার জন্য বাহির হন। বেহুলার সে জীবন-পরীক্ষা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পরমরূপবতী যুবতী বেহুলা একাকী অসহায় অবস্থায় মৃতপতি ক্রোড়ে—কলাগাছের ভেলায় নদীতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছেন,—প্রাণের সুগভীর আবেগ মৃত পতির জীবন পুনঃ-প্রাপ্তি,—আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাতে দৃষ্টি নাই, —শরীর ক্রমেই শীর্ণ ও অবসন্ন হইতেছে—অবিরাম চক্ষুর জল নদীর ন্যায় বহিয়া নদীর জলে মিশিয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রাণে অসীম বল,—এ ছবি মনে আনিলেও শরীর কাঁপিয়া উঠে। সেই অসহায় অবস্থা ও অলৌকিক রূপযৌবন, এক মৎস্যজীবী, এক নাবিক ও এক বৈদ্যরাজকে লুব্ধ করিয়াছিল। সে সব উৎকট পরীক্ষা সত্বেও সে সব বিপদ হইতে সতী নারী নিষ্কৃতি পাইয়া দিনরাত নদীর বুকে ভাসিয়া চলিয়াছেন। পরে সেই নদী দিয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গানদীতে আসিয়া পড়েন। তথায় এক রজকীর আনুকূল্যে মনসা দেবীর অনুগ্রহে সতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। বেহুলার প্রাণের নখিন্দর প্রাণ পাইয়াছিলেন। মৃত পতির জীবন তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সতীমহিমার অন্ত নাই। পরে তিনি পতির সহিত নিজগৃহে প্রত্যাগমন করেন। সতী বেহুলার মহিমায় মনসাদেবীর কোপ লোপ হইয়া চাঁদ সদাগর পুনরায় নষ্টধনপুত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঐ রজকী সম্বন্ধে নানা কাব্যে—নানা কাহিনীতে নানা অলঙ্কারের বর্ণনা আছে। সে রজকী সেই জন্য দেবলোক হইতে

আসিত ও দেবগণের বস্ত্র ধৌত করিয়া লইয়া যাইত এবং সে বেহুলাকে সুরলোকে লইয়া গিয়া দেবতাগণের অনুগ্রহে নখিন্দরকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

মৃতের জীবন-প্রাপ্তি,—ইহা অসম্ভব সংঘটন ;—সুতরাং বেহুলার জীবনকাহিনী মাত্র কবি-কল্পনা, এইরূপ এক্ষণে বিবেচিত বা অনুমিত হয়। কিন্তু এই বর্ত্তমান লৌহযুগেও কি অসম্ভব সম্ভব হইতে দেখা যায় না ? বহু উচ্চ দ্বিতল স্থান বা চলন্ত রেলগাড়ি হইতে বালকবালিকা হঠাৎ পতিত হইয়াও অক্ষতশরীরে জীবিত থাকিতেছে—ইহা কি প্রায়ই দেখা যায় না ? মহাপুরুষদিগের অলৌকিক শক্তির পরিচয় কি এখনও পাওয়া যায় না ?

আধুনিক বিচারবুদ্ধির অগোচর হইলেও ঐরূপ বহু ঘটনা এখনও মানবের নয়নগোচর হয়। শিব-অবতার শিবময় ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনে দেখা যায় যে, একদিন তিনি যখন বারাণসীতে গঙ্গাজলে ভাসিতেছিলেন, তখন নদীতীরে—ঘাটে—এক রমণী সর্পদংশনে মৃতপতিকে তথায় লইয়া আসিয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছিল। স্বামীজী ভাসিতে ভাসিতে তথায় আসিয়া সেই অভ্যস্ত মৌনীর ভাবেই—কাহাকেও কিছুই না বলিয়া—কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সেই মৃতের সর্পদষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিয়া আবার নদীজলে ভাসিয়া চলিয়া যান। তাহার ফলে মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হয়। সেই সতীনারীর শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হয়। এ ঘটনা অধিক পুরাতন নহে ও সত্য। কিন্তু মৃত ব্যক্তি আর বাঁচিয়া উঠেনা—এ লোকাপবাদ দুর্নির্ব্বার।

সতীশিরোমণি বেহুলা সে অসম্ভবও সম্ভব করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি-

রাখিয়া গিয়াছেন। শতশতাব্দীর পরিবর্ত্তনে সে কাহিনী ভারতে লুপ্ত হয় নাই। সে কাহিনা পূর্ব্বে হিন্দু নরনারী কত ভাবে কত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইত। কত কবিমুখে তাহা গীত, ও কতকর্ণে তাহা শ্রুত হইত। এক্ষণে এ সভ্য জগতে সে কাহিনার সে আদর আর নাই বটে, কিন্তু তাহা লোপ হয় নাই, এবং যতদিন এ জগতের চিহ্ন থাকিবে—যতদিন মানব-সমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত না হইয়া যাইবে,—-ততদিন বেহুলার এই স্বর্গীয় কাহিনী কখনই বিলুপ্ত হইবে না।

বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী অরুন্ধতী, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পত্নী মৈত্রেয়া, বিশ্বামিত্র-পত্নী সুনেত্রা ও অগস্ত্যমুনিব পত্নী লোপামুদ্রা প্রভৃতি মুনিপত্নীসকলেব ও অন্যান্য সতীনারীগণের আদর্শচরিত্র হইতেই আর্য্যঋষি ও শাস্ত্রকারগণ, যথা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, দক্ষ, শঙ্খ প্রভৃতি এবং পুবাণকারগণ রামায়ণ ও মহাভারত আদিতে সতীনারীর কি কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, ও তাহার বিপরীত ভাবগুলিই সতী নারীর অকর্ত্তব্য স্থির করিয়া গিয়াছেন। উহা সম্রাটের খাস আদালতের—-বিলাত আপীলের—নজির হইলেও এক্ষণকার হাল আইনের প্রচলিত আদালতে তাহা আর সম্মান পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইতেছে কিনা সন্দেহ।

নিম্নলিখিত শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ প্রণীত সংহিতা ও শাস্ত্র-গ্রন্থে সতী-ধর্ম্মের সম্বন্ধে অন্যান্য উক্তির মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে উপদেশ দিয়াছেন।

শাস্ত্রবচন।

১। মনু।

(১) স্ত্রীকে কুমারী অবস্থায় পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে পতি রক্ষা করেন ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করে; স্ত্রী কখন স্বাধীনতালাভের যোগ্যা নহে।

(২) মন, বাক্য ও দেহ সংযত করিয়া থাকিয়া যে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করেন না বা ব্যভিচারিণী হন না, তিনি পতি-লোকে গমন করেন ও সাধুলোকে তাঁহাকে সাধ্বী নাম দেন।

(৩) কেহই জোরজবরদস্তি দ্বারা নারীগণকে (সুপথে) রক্ষা করিতে পারে না; কিন্তু নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা তাহারা সুরক্ষিতা হইতে পারে; যথা, অর্থসংগ্রহ, ব্যয়, শৌচ অর্থাৎ দ্রব্য ও শরীর শুদ্ধি, ধর্ম্মকর্ম্ম, রন্ধনকার্য্য ও গৃহস্থালী পর্য্যবেক্ষণ।

(৪) মদ্যপান, দুর্জ্জনসঙ্গ, পতিত্যাগ, যথেচ্ছ ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকালে নিদ্রা, পরগৃহে শয়ন ও বাস—এই ছয়টি নারীদূষণ বা ব্যভিচার দোষের মূল।

(৫) যে নারীগণ ধর্ম্মাত্মা হইয়া স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা হন। নতুবা বিশ্বাসী প্রহরীর দ্বারা বেষ্টিত গৃহে রুদ্ধ রাখিলেও দুঃশীলা হইলেই তাহারা অরক্ষিতা।

(৬) নারীজাতির জাতকর্ম্মাদি সংস্কার মন্ত্রদ্বারা হইবে না —ইহা ধর্ম্মব্যবস্থা।

২। যাজ্ঞবল্ক্য।

(১) পতিপরায়ণা সতী নারী গৃহের দ্রব্যাদি সাবধানে ও পরিষ্কারভাবে রাখিবে ; কার্য্যদক্ষ, আনন্দময়ী, পরিমিতব্যয়ী হইবে ; শ্বশুর শাশুড়ীর পদসেবাদি শুশ্রূষা করিবে।

(২) স্বামী বিদেশে থাকিলে সতী স্ত্রী ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, সমাজের বিবাহাদি উৎসবদর্শন হাস্যকৌতুক ও পরগৃহে বাস ত্যাগ করিবে।

(৩) স্বামিহীনা বা স্বামী বিনা স্ত্রী, পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা শ্বশুর শাশুড়ি বা মাতুলের অধীনে বাস না করিলে, সে নিন্দনীয় হইবে।

(৪) স্ত্রীলোক স্বামীর আদেশ পালন করিবে—ইহাই পরম ধর্ম্ম। পতি মহাপাতকদূষিত হইলেও তাঁহার শুদ্ধিপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(৫) যে নারী সধবা বা বিধবা অবস্থায় ব্যভিচারিণী না হয়, সে ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে ভগবতী উমাদেবীর সঙ্গসুখে আনন্দ লাভ করে।

(৬) যে নারী পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্তা, সদাচারবিশিষ্টা ও সংযতেন্দ্রিয়া থাকেন, তিনি ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে অনুপম সুখলাভ করেন।

৩। পরাশর।

(১) স্বামী দরিদ্র, রুগ্ন বা মূর্খ হইলে যে স্ত্রী তাঁহাকে মানে না, সে মরিয়া সর্প হয়, এবং পরে মনুষ্যজন্মেও পুনঃপুনঃ বৈধব্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

(২) বিধবা হইয়া যে নারী ব্রহ্মচর্য্যপালন করেন, ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় তিনিও স্বর্গলাভ করেন ।

(৩) যে নারী পতির সহমরণ বা অনুগমন করেন, তিনি মনুষ্যশরীরে যে সার্দ্ধত্রিকোটী রোম আছে, তত বৎসর স্বর্গে বাস করেন ।

৪। বিষ্ণু।

(১) স্ত্রীজাতির পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই। পতিসেবাপুণ্যেই পত্নী স্বর্গে গমন করেন ।

(২) স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম—

(১) পতির সমান ব্রতাচরণ ।

(২) শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা ।

(৩) গৃহের দ্রব্যাদি সুমার্জ্জিত করিয়া রাখা ।

(৪) অমুক্তহস্ততা অর্থাৎ অপরিমিতব্যয়ী না হওয়া ।

(৫) গুপ্ত বা সঞ্চিত ধন রক্ষা ।

(৬) মূলক্রিয়া বা বশীকরণাদি কর্ম্মে অনিচ্ছা ।

(৭) মঙ্গলাচারে তৎপরতা ।

(৮) স্বামী বিদেশে থাকিলে সাজ সজ্জা আদি না করা ।

(৯) পরগৃহে না যাওয়া ।

(১০) দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা ।

(১১) সর্ব্বকর্ম্মে স্বাধীন না থাকা বা অধীন থাকা।

(১২) বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকা।

(১৩) বিধবা হইলে সহমরণ বা অনুসরণ, অথবা ব্রহ্মচর্য্যপালন।

৫। দক্ষ।

(১) সুখের জন্যই গৃহে বাস, এবং গৃহ-সুখের মূলই পত্নী। যিনি স্বামীর বশে থাকিয়া স্বামীর চিত্ত বা মন বুঝিয়া স্বামীর মনোমত কার্য্য করেন ও বিনীত থাকেন, তিনিই প্রকৃত পত্নী।

(২) যে স্ত্রী স্বামীর অনুকূলা, বাক্যে দোষশূন্যা, কার্য্যদক্ষা, সাধ্বী, প্রিয়ভাষিণী, আপ্তগুপ্তা বা আত্মরক্ষিতা ও পতিভক্তিমতী—তিনি মানবী নহেন,—তিনি দেবতা বা দেবী।

(৩) যে স্ত্রী পতির সহিত একমত, মুখে যাঁহার কুকথা নাই, যিনি দক্ষ বা কার্য্যকুশল, সাধ্বী ও পতিব্রতা,—এই সকল গুণযুক্তা স্ত্রী সাক্ষাৎ শ্রী বা লক্ষ্মী—ইহাতে সংশয় নাই।

(৪) যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করেন, তাঁহার আচার অতি শুভ, ও তিনি স্বর্গলোকে মহীয়সী বা অতি মহতী হন।

৬। শ্রীমদ্‌ভাগবত। সপ্তমস্কন্ধ। একাদশ অধ্যায়।

পতিশুশ্রূষা, পতির অনুকূলতা, পতিবন্ধুর অনুবৃত্তি, সর্ব্বদা পতির নিয়ম ধারণ,—এই কয়টী পতিব্রতাদিগের লক্ষণ ও ধর্ম্ম।

সাধ্বী স্ত্রী, সম্মার্জ্জন, উপলেপন, গৃহভূষণ, গৃহের সৌগন্ধসম্পাদন ও প্রত্যহ গৃহোপকরণসামগ্রী পরিষ্কার করা,—এই সমস্ত কার্যদ্বারা এবং স্বয়ং ভূষিত হইয়া নানাবিধ ভোজ্য বস্তু প্রদান, বিনয়, দম, সুনৃতবাক্য ও প্রেমপ্রকাশ দ্বারা সময়ে সময়ে পতিসেবা করিবে; যথালাভে সন্তুষ্টা, অলোলুপা, দক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয়বাদিনী, সাবধানা, শুচি ও স্নিগ্ধা হইয়া অপতিত পতির ভজনা করিবে। হে রাজন্! যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিপরায়ণা হইয়া হরি-ভাবে পতির সেবা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে হরিস্বরূপ পতির সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১১৭ম অধ্যায়ে সতীধর্ম্মের বিধি বর্ণিত আছে ও তাহা "সীতাদেবী"র চরিত্রবর্ণনাকালে উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে যে সতী নারীগণ নিজ নিজ জীবনে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আদর্শ ও অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যার শেষ নাই। সকলের নাম উল্লেখ ও পরিচয় প্রদান করা এক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাণী শৈব্যা, শ্রীবৎসরাজার পত্নী চিন্তা, নলরাজার রাণী দময়ন্তী, দুষ্মন্ত রাজার স্ত্রী শকুন্তলা—রাজরাণী হইয়াও দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া পতিভক্তি ও সতীত্বের উৎকট পরীক্ষায় যে ভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সে কীর্ত্তি—সে আদর্শ—হিন্দুর প্রাণ হইতে কখনই মুছিবার নহে।

গান্ধারী।

চক্ষুরত্নকে মহারত্ন বলে। চক্ষু না থাকিলে এ সংসার অন্ধকারময়। চক্ষু না থাকার—অন্ধ হইবার—যে কত দুঃসহ দুঃখ, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে না।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন; সেহেতু তাঁহার পত্নী গান্ধারী স্বেচ্ছায় নিজ চক্ষুরত্নের ব্যবহার হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়া সারাজীবন নিজচক্ষুর্দ্বয় দুর্ভেদ্য বস্ত্রাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত রাখিয়া অন্ধত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং অন্ধ পতির প্রকৃত অন্ধ অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া সতীত্বের—পতিভক্তির—পতির জন্য অতি উগ্র স্বার্থত্যাগের যে জ্বলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন,—সতীত্ব-রত্ন অমূল্য চক্ষুরত্নের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া যে আদ', দিয়া গিয়াছেন,—তাহা এ জগতে অদ্বিতীয়,—অতুল বা অনুপম। সে আদর্শ স্মরণ করিলে হিন্দুর মস্তক যেন আপনি অবনত হইয়া সেই সতীপাদপদ্মে লুটাইয়া পড়ে।

সেই আদর্শ আজ কোথায়? এখন দেখা যায় যে, স্বামী অন্ধ হইলেও স্ত্রীর দৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য চশমার প্রয়োজন হয়, বা স্ত্রীর মুখখানি দর্পণের সম্মুখ হইতে আর নড়ে না। সেই আদর্শ ও এই আচরণ কি স্বর্গ নরক প্রভেদ নহে?

মদালসাচরিত্রে আদর্শমাতৃত্ব কিরূপ পরিস্ফুট হইয়া আদর্শ-স্থান অধিকার করিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

লোকোত্তরচরিত্র মহাপুরুষগণের চরিত্র যেরূপ অদ্ভুত, যাঁহারা তাঁহাদের পত্নী হইবার ভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চরিত্রও সেইরূপ অদ্ভুত। সেহেতু বুদ্ধদেবের গোপা এবং

সতীত্ব ঃ

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিষ্ণুপ্রিয়া সতীনারীগণ মধ্যে যে কত উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আর বলিবার নহে।

শ্রীরাধিকা ঃ—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বা গোপিনীবিহার ও শ্রীরাধিকা-চরিত্র আদর্শপ্রেমভক্তির নিদর্শন। সাধনা বা তপস্যা না থাকিলে এবং "যোগমায়া" যে কি, তাহা ভগবৎকৃপায় অণুমাত্র বুঝিবার শক্তি না আসিলে, কৃষ্ণলীলা বুঝা মানবের সাধ্যাতীত। সেহেতু "কানাইএ ভাগ্ না" আদি কত কদর্থই করা হয়। অধুনা রাধাকৃষ্ণের নামে কত প্রকার কুৎসিতভাবপূর্ণ চিত্র বাজারে দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। উচ্চতম সাধনার ফললাভ উচ্চতম অধিকারীরই আয়ত্ত; যাহার তাহার নহে। লক্ষ্মী বিষ্ণুবক্ষঃস্থল-স্থিতা, লক্ষ্মীর স্থান বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে। শ্রীরাধাই লক্ষ্মী, এবং সতীলক্ষ্মী নারীগণ লক্ষ্মীস্বরূপিণী। সুতরাং তাঁহাদের স্থানও যে ভগবানের হৃদয়ে হইবে, তাহা ত স্বাভাবিক। লক্ষ্মী-পতি লক্ষ্মীর সহিত সতীলক্ষ্মীগণকে যে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? শাণিত ছুরিকা, ব্যবহারে অপটু বালকের হস্তে পড়িলে, তাহার যে দশা ও ব্যবহারের ফললাভ হয়, তাহাই ঐ অলৌকিক লীলাসম্বন্ধে হইতেছে দেখা যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেজন্য অভক্ত ও অবিশ্বাসী তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন--"রাধাকৃষ্ণ মানো আর না মানো, ঐ টানটুকু নিও"—অর্থাৎ ঐ টানটুকু অনুকরণ যোগ্য। সে "টানটুকু" বড় "টুকু" বা সোজা নয়। তাহার

এতটুকু আসিলেই সংসার-পথে এ "টানাপোড়েন" আর করিতে হয় না—ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চকন্যা

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥"

অর্থাৎ—"অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী—এই পঞ্চকন্যাকে নিত্য স্মরণ করিবে, ও তাহাতে মহাপাতক নাশ হয়।"

অধুনা তাঁহাদের স্মরণে অনেকের সন্দেহের অবকাশ আসে। হিন্দু-বিবাহ বা সতীত্বের আদর্শের ধারণার সহিত যেন তাঁহাদের চরিত্র ঠিক খাপ্ খায় না বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ভারতে এক সময় ছিল, যখন আধ্যাত্মিকতার উন্নতিতে এমন এক অবস্থা আসিত, যখন হত্যা করিলেও হত্যা করা হয় না,—খাইলেও খাওয়া হয় না,—যখন দেহে অনুরাগবুদ্ধি আদপেই থাকে না। সে অবস্থা এখন ধারণায় আনাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যুগধর্ম্ম বা তাৎকালিক প্রথা, ধর্ম্মে ও ভগবানে একান্তভক্তি ও ভগবানের কত নৈকট্য আদি তাঁহাদের চরিত্র-সমর্থনের বিশিষ্ট কারণ। ঐ ঐ চরিত্র সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া যদি অধুনা কেহ তাঁহাদিগকে আদর্শস্থানীয়ার দল হইতে বাদ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি না হইতেও পারে; কারণ তাহা ছাড়া অন্যান্য অসংখ্য আদর্শ আছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে নিন্দা ও ত্যাগ

করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের যে দোষটা চক্ষুতে পড়ে, তাহা বাদে অন্যান্য বহুগুণে তাঁহাদিগকে কি ভূষিতা বোধ হয় না ?

১। অহল্যা।

অহল্যা গৌতম মুনির পত্নী। দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা ছলনায় ধর্ষিতা হইয়া অকপটে সরলভাবে সত্যকথা স্বামীর নিকট প্রকাশ করেন। পরে মনপ্রাণ পবিত্র থাকা সত্ত্বেও কেবল দেহমাত্র অপবিত্র হওয়ায় ইনি পতির অভিশাপে বহুকাল পাষাণী হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ; শেষে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র পদ-রেণু-স্পর্শে তিনি মুক্তা হন।

শুনা যায়—

"স্ত্রিয়াঃ চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্।
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" ॥ অর্থাৎ

স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য কখন কি হয় তাহা সর্ব্বজ্ঞ দেবগণও জানেন না, মানুষ কিরূপে জানিবে ?"

নষ্টা—দুষ্টা স্ত্রীর চরিত্র ঐরূপ দুর্ব্বোধ বটে, কিন্তু অহল্যা দেবীর ন্যায় সতীচরিত্র দেবতাগণের বা মানবগণের দুর্ব্বোধ ছিল না ও নহে। দেবগণ কেন, দেবতাগণের রাজা—দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যা দেবীর ন্যায় সাধ্বী স্ত্রীর স্বামী আদর্শব্রাহ্মণ গৌতমদেবের কোপে সতী-স্ত্রী-চরিত্র হাড়ে হাড়ে—মজ্জায় মজ্জায়—বুঝিয়া-ছিলেন। সে শিক্ষা তাঁহার সর্ব্বশরীরে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল এবং তিনি সাধ্বী স্ত্রীচরিত্রের মর্ম্ম বা মহিমা সারাজীবনে কখনই ভুলিতে পারিবেন না। অসুরগণের সহিত পুনঃপুনঃ সংগ্রামে স্বর্গচ্যুত হইয়া নিজপত্নী—ইন্দ্রাণী—শচীকেও তিনি মানুষী সীতা, দময়ন্তী

আদির ন্যা'য় সহচারিণী পান নাই। সুতরাং দেবতাগণ সতীনারীর চরিত্র সম্যক্ অবগত আছেন, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

অহল্যাদেবীকে যাঁহারা নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও কি এখন একবার একজন অহল্যা হইয়া গৌতমদেবের ন্যায় একজন ব্রাহ্মণ—ও শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় এক অবতার পুরুষ—এই ভারতবর্ষে আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন? গৌতমদেবের ন্যায় একজন ব্রাহ্মণের ও শ্রীভগবানের অবতারের আবির্ভাব এখন হইলে, ভারতবর্ষের অদৃষ্ট অচিরে ফিরিয়া যায় না কি? পাষাণীর ত অভাব নাই, কিন্তু একজনও কি এখন শ্রীভগবানের চরণরেণু স্পর্শের অধিকারিণী হইয়া বলিতে পাবেন?—

"অহো কৃতার্থাস্মি জগন্নিবাস তে
পাদাব্জসংলগ্নরজঃকণানহম্।
স্পৃশামি যৎপদ্মজশঙ্করাদিভি-
বিমৃগ্যতে রন্ধিত-মানসৈঃ সদা॥"

একজনও কি সেই সুদুর্ল্লভ দর্শনসুখলাভ করিয়া ভক্তিগদগদ-চিত্তে সে চরণে নিবেদন করিতে পারেন?—

"দেব মে যত্র কুত্রাপি স্থিতায়া অপি সর্ব্বদা।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তু মে॥
নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্তবৎসল।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ নারায়ণ নমোঽস্তুতে॥"

অহল্যা অসতী হইলে,—তিনি নরক হইলে,—দয়ার অবতার শ্রীরামচন্দ্রের—ভগবানের ভাগ্যে তাহার দর্শন ঘটিত না এবং

অহল্যার ভাগ্যেও ভগবানের দর্শন লাভ হইত না। যে পদরেণুর মহিমায় পাষাণ দেহ, পাষাণ প্রাণ, সব গলিয়া যায়,—যে পদ—যে ব্রহ্মপদ—সকল বিপদাপদসাগরে একমাত্র তরণি, যে পদ মুক্তির পদ ও পথ,—যে পদ সকল অভিশাপ, সকল দুঃখ, সকল বিরহ বিমোচন করিতে একমাত্র সমর্থ, সেই সকল সম্পদদাতা, "যোগীন্দ্র-মানস-মধুব্রতসেব্যমান্" "সুখাবহ" "রঘুনাথপদারবিন্দ" যে গোময়ে প্রস্ফুটিত হয় না ও হয় নাই, তাহাই জগতে প্রদর্শন করিবার জন্য গৌতমধর্ম্মপত্নী—ভাগ্যবতী সতী অহল্যাদেবী পাষাণ-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া নিজ হৃদ্‌পদ্মে সেই শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করিয়া শ্রীরামলীলা ও শ্রীরামনামমাহাত্ম্য প্রকাশের এক বিশেষ সহায় ও যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিলেন। পাষাণের উপর যে চিহ্ন পড়ে তাহা আর উঠেনা, তাই গৌতমী জগতের সাধ্বীগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—"হে কুলললনাগণ! তোমাদের হৃদয়কে জাগতিক ভোগসুখত্যাগে পাষাণ করিয়া, সেই পাষাণে শ্রীভগবানের পদচিহ্ন ধারণ কর, তাহা আর মুছিবে না, তাহা চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে খোদিত থাকিবে।"

বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে; বড় গাছেই বড় ঝড় সহ্য করিতে পারে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরণ্ড হইয়াও আপনাকে বিশাল দ্রুম ভাবিবার গর্ব্ব অনেকেই অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু ভীষণ বাত্যার সম্মুখীন হইবার সাহস না থাকায়, অনেকে তৃণত্বের পরিচয়ই দিয়া থাকেন। যিনি গৌতমদেবের ধর্ম্মপত্নী, বজ্রাহতা হইলেও তিনি কোন্ বনের বনস্পতি, তাহা বুঝিবার শক্তি এরণ্ডগণের থাকা সম্ভব নহে।

২। দ্রৌপদী।

যে যুগে দ্রৌপদীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন মাতৃবাক্য বেদবাক্য সমান মান্য করা হইত, এবং ব্যাসদেবের ন্যায় ঋষি-বাক্যই ধর্ম্মসৃষ্টি করিত। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির—যাঁহার জীবনে পাপের লেশ ছিল না—তিনি কি ঐ পঞ্চস্বামিত্ব পাপ হইলে পোষণ করিতেন? কখনই নহে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" বলার যে অপবাদ শুনা যায়, তাহা সর্ব্বৈব যুক্তি ও ভিত্তিহীন বলিয়া অনুমিত হওয়াই সঙ্গত। যুধিষ্ঠিরের দ্বারা ঐ বাক্য প্রয়োগে গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সত্যহত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা এই চতুর্ব্বিধ মহাপাপ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—যিনি ধর্ম্মের স্রষ্টা, পালক ও রক্ষক—তাঁহার দ্বারা ঐ মিথ্যা ও কপট বাক্য যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া বাহির করিবার প্রবৃত্তি কখনও হওয়া সম্ভব নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—যিনি শুচি হইতেও শুচি—যিনি পবিত্রতম—পুরুষোত্তম—দ্রৌপদী যদি পাপিষ্ঠা হইতেন, তবে তাঁহার সহিত কি সখিত্ব করিতেন? না তাঁহার লজ্জা নিবারণ জন্য এত ব্যস্ত হইতেন? কখনই নহে। দ্রৌপদীর ন্যায় প্রাণভরা আগ্রহের ডাক বোধ হয় আর কেহ ডাকিতে পারেন নাই। সে ডাক শুনিবামাত্র ভগবান্ মুহূর্ত্তকাল আর স্থির থাকিতে পারিতেন না ও অবিলম্বে তৎসকাশে উপনীত হইতেন।

দ্রৌপদীর সতীত্ব ও পতিপরায়ণতা মহাভারতে জ্বলন্ত অক্ষরে ঘোষিত আছে। বনপর্ব্ব—২২৩ অধ্যায়—দ্রৌপদীসত্যভামা-প্রকরণ পাঠ করিলে তাঁহার আদর্শ চরিত্রের উপলব্ধি হয়।

লোকপালগণের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত পঞ্চস্বামীকে কি মন্ত্র,

ঔষধ, ব্রত, জপ, ও হোম দ্বারা দ্রৌপদী বশীভূত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে দ্রৌপদী উত্তর করিয়াছিলেন—

"হে সত্যভামে! তুমি অসৎস্ত্রীলোকদিগের আচার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ; এরূপ প্রশ্নের ত উত্তর দেওয়া যায় না। 'স্ত্রী আমার জন্য মন্ত্রপ্রয়োগ বা মূলকর্ম্ম (অর্থাৎ শিকড়-বাকড় খাওয়ান বা কোনরূপে ব্যবহার করান) করিতেছে'—ইহা জানিতে পারিলেই ভর্ত্তা গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় সেই স্ত্রী হইতে সদা সশঙ্ক থাকেন। মন্ত্র বা মূলকর্ম্মে কদাচ পতি বশ হয় না। অধিকন্তু জিঘাংসু ব্যক্তি এই মূলকর্ম্ম করিবার ভাণে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, নানাবিধ রোগসঞ্চারও করিয়া দেয়। রমণীগণ অনেকেই এই কার্য্য করিতে গিয়া নিজ নিজ স্বামীকে জলোদরী, শ্বিত্রী (কুষ্ঠরোগী), শুক্লকেশ, ক্লীব, জড়, অন্ধ বা বধির করিয়া ফেলিয়াছে।"

তৎপরে দ্রৌপদী সৎস্ত্রীদিগের যে সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া তিনি স্বামিগণের মনোহরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রিয়া হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেন—

"ভর্ত্তার ভোজন না হইলে আমি ভোজন করি না; স্নান না হইলে আমি স্নান করি না; ভর্ত্তা শয়ন না করিলে আমি শয়ন করি না। ভর্ত্তা কেন, ভৃত্যগণেরও ভোজন না হইলে আমি ভোজনাদি করি না।

স্বামী ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আসিলেই আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পদ প্রক্ষালনের জল ও বসিবার আসন প্রদানে আনন্দ প্রকাশ করি।

সতীত্ব।

আমি গৃহোপকরণ সমুদয় বেশ মাজিয়া রাখি, অন্নাদি পরিষ্কারভাবে প্রস্তুত করি; যথাসময়ে ভোজন করিতে দিই; স্বয়ং সংযতভাবে থাকি; ধান্যাদি সাবধানে রক্ষা করি; গৃহগুলি বেশ পরিষ্কৃত রাখি। কখনও ভৎর্সনা করি না, মন্দনারীর সংসর্গে থাকি না, কোন কার্য্যেই আলস্য করি না, সর্ব্বদাই অনুকূল-ভাবে অবস্থিতি করি।

বিনা পরিহাসে হাস্য, বারম্বার দ্বারে অবস্থিতি, আমি ভালবাসি না; গৃহের নিকটবর্ত্তী উপবনেও আমি অধিকক্ষণ থাকি না।

সত্যভামে! হাস্যের সময়েও আমি অধিক হাস্য করি না, অধিক ক্রোধ করি না। যাহাতে স্বামীর ক্রোধ হয়, এমন কার্য্যও আমার দ্বারা হয় না। আমি সর্ব্বদাই ভর্ত্তৃগণের সেবায় তৎপর থাকি।

পারিবারিক কোন কার্য্যোপলক্ষে ভর্ত্তা যখন প্রবাসে থাকেন, তখন আমি মাল্যানুলেপন পরিত্যাগ করিয়া ব্রতাচারণ করিয়া কালযাপন করি।

আমার স্বামী যাহা পান করেন না, যাহা ভোগ করেন না, যাহা ভোজন করেন না, আমিও তাহা পরিত্যাগ করি।

ভিক্ষাদান, বলিকর্ম্ম, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বেপর্ব্বে স্থালীপাক, মান্য ব্যক্তিদিগের সম্মান পূজা প্রভৃতি যে সকল গৃহস্থ-কর্ত্তব্য আমার বিদিত আছে, আমি নিরালস্যে সেই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করি।

আমি স্থির করিয়াছি রমণীগণের সনাতনধর্ম্মের পতিই আশ্রয়, পতিই রমণীদিগের দেবতা; তিনিই গতি,—গত্যন্তর নাই; কোন্ রমণী এ হেন পতির অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারে?

আমি স্বামিগণের উপর "উপর-চাল" চালি না। তাঁহাদিগের অপেক্ষা উত্তম ভোজন বা উত্তম বেশভূষা করি না। আর সর্ব্বদা সংযতভাবে থাকি; শ্বশ্রূনিন্দা কদাচ করি না।

আমি বীরপ্রসবিনী সত্যবাদিনী শ্বশ্রূ কুন্তীকে অন্ন জল বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক নিত্য পরিচর্য্যা করি।

আমি শ্বশ্রূর বসনাদি অপেক্ষা উত্তম বসন, ভূষণ বা ভোজন ব্যবহার করি না।

সত্যভামে! আমি প্রতিদিন ভর্ত্তার পূর্ব্বে জাগরণ করি, শেষে শয়ন করি,—ইহাই আমার পতি-বশীকরণ।"

তৎপরে দ্রৌপদী (২৩৪ অধ্যায়ে) সত্যভামাকে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

"সত্যভামে! সমুদায় লোকমধ্যে—এমন কি, দেবগণ মধ্যেও পতির ন্যায় দেবতা আর নাই; স্বামী প্রসন্ন হইলে, সমস্ত অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়, আর তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সংহার পর্য্যন্ত করিতে পারেন।

ভর্ত্তা দ্বারে উপস্থিত হইলে, তাঁহার স্বর শ্রবণ করিবামাত্র গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে। তাহার পর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলে, সত্বর পাদ্য ও আসন দ্বারা তাঁহার সম্মাননা করিবে।

পুরুষ-সমক্ষে মত্ততা ও প্রমাদ পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক নিজ ভাব সংযত রাখিবে।

অতি সদ্বংশজাত নিষ্পাপ সতী রমণীগণের সহিত সখ্যতা করিবে। ক্রূর, দর্পিতা, বহুভোজী, চৌর, দুষ্ট ও চপল স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গ করিবে না।"

দ্রৌপদী-চরিত্র নিন্দা করিবার পূর্ব্বে—দ্রৌপদীর উক্ত গুণ-রাশির একটিও পাইবাব জন্য প্রয়াস করা কি উচিত নহে? সতী নারীর তাহা আদর্শজ্ঞান করা কি কর্ত্তব্য নহে?

এক্ষণে উক্ত প্রকার শাস্ত্রলিখিতগুণযুক্তা নারীর সংখ্যা হ্রাস, ও "খেতে, শুতে, যেতে" স্বাধীনভাবাপন্না—শাস্ত্রপাঠবর্জ্জিতা—কেবল কুগ্রন্থ প্রেম-উপন্যাসপাঠিকা—বিলাসিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। এ স্রোত কি ফিরিবে না? শাস্ত্রে মতিগতি কি হইবে না? না হইলেই যে অনুপায়।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবার কারণ "মার্কণ্ডেয় পুরাণে" পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, প্রজাপতি ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরার উগ্র তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহাকে নিহত করিলে, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে সুরপতির তেজঃ নষ্ট হইয়া সেই তেজঃ ধর্ম্মে প্রবেশ করে। প্রজাপতি ত্বষ্টার অভিসন্তাপে ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুরের জন্ম হয়। সময়স্থিতি উল্লঙ্ঘন করিয়া—প্রতিজ্ঞামর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া,—ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে হত্যা কারলে, সেই পাপে ইন্দ্রের বল নষ্ট হইলে, সেই ইন্দ্রবল, বলের একমাত্র অধিদেবতা অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী বায়ুতে প্রবেশ করে। গৌতমপত্নী অহল্যার ধর্ষণজনিত পাপে ইন্দ্রের রূপ নষ্ট হইলে, সেই ইন্দ্র-রূপলাবণ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আশ্রয় করে। পরে দেবগণ দ্বারা নিহত অসুরগণ তেজোহীন, বলহীন ও রূপহীন ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য মনুষ্যলোকে বলবীর্য্যমদোদ্ধত রাজাদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করে; তদ্দারা ভগবতী বসুন্ধরাকে দুর্ব্বহভাবে

পীড়িতা করিলে, বসুন্ধরার প্রার্থনায় দেবগণ প্রজা সকলের উপকার ও ভূভারহরণ জন্য নিজ নিজ তেজোভাগ দ্বারা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উক্ত পুরাণে লিখিত আছে—

"যদিন্দ্রদেহজং তেজস্তন্মুমোচ স্বয়ং বৃষঃ।
কুন্ত্যাং জাতো মহাতেজাস্ততো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ॥
বলং মুমোচ পবনস্ততো ভীমো ব্যজায়ত।
শক্রবীর্য্যার্দ্ধতশ্চৈব জজ্ঞে পার্থো ধনঞ্জয়ঃ॥
উৎপন্নৌ যমজৌ মাদ্র্যাং শক্ররূপৌ মহাদ্যুতী।
পঞ্চধা ভগবানিত্থমবতীর্ণঃ শতক্রতুঃ॥
তস্যোৎপন্না মহাভাগা পত্নী কৃষ্ণা হুতাশনাৎ।
শক্রস্যৈকস্য সা পত্নী কৃষ্ণা নান্যস্য কস্যচিৎ॥
যোগীশ্বরাঃ শরীরাণি কুর্ব্বন্তি বহুলান্যপি।
পঞ্চানামেকপত্নীত্বমিত্যেতৎ কথিতং তব॥" অর্থাৎ—

"তখন স্বয়ং ধর্ম্ম ইন্দ্রদেহজাত সেই তেজঃ কুন্তীগর্ভে ত্যাগ করিলে তাহা হইতে মহাতেজা রাজা যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। পবনদেব ইন্দ্রবলত্যাগে ভীমসেনের জন্ম হয়, এবং ইন্দ্রের বলার্দ্ধ দ্বারা পার্থ ধনঞ্জয়ের জন্ম হয়। ইন্দ্রের রূপলাবণ্যধারী মহাদ্যুতি অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা মাদ্রীগর্ভে যমজকুমার নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। এইরূপ শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবরূপে অবতীর্ণ হন। ইন্দ্রাণী শচীই যজ্ঞভাগ যাজ্ঞসেনীরূপে হুতাশন হইতে সমুৎপন্না হন। এক ইন্দ্রেরই সেই পত্নী কৃষ্ণা বা দ্রৌপদী অন্য কাহারও পত্নী নহেন, কারণ যোগীশ্বরগণ নিজ শরীরকে বহুভাগে বিভক্ত

করিতে পারেন ; যেরূপে পঞ্চপাণ্ডবের একপত্নী হইয়াছিল তাহা আপনার নিকট কথিত হইল ।”

৩। কুন্তী ।

যে যুগে দেবতা-আরাধনা ও মন্ত্রসিদ্ধি আদি সম্ভব ছিল, সে যুগ অতীত হইয়া ঐ সকল লোপ হইলে, সে যুগের কার্য্য বুঝা বড়ই কঠিন হয়। কুন্তী-চরিত্রে দেবতাদিগের অনুগ্রহ দৃষ্ট হয়। এক্ষণে অপদেবতা ও অপদেবীগণ—“দেবতার বেলা লীলা খেলা আর পাপ লিখেছে :মানুষের বেলা”—বলিয়া বিদ্রূপ করেন, ও লীলা খেলা করিতে যান। দেবতা ও অপদেবতার লীলায় স্বর্গ নরক প্রভেদও হয়। যদি এক্ষণে কোন নারী সে লীলাখেলা করিয়া—একজন মাত্র ক্ষত্রিয় বীরসন্তান—ভীম বা অর্জ্জুনের ন্যায়—এক্ষণে ক্ষত্রকুলচূড়ামণি পঞ্চপাণ্ডব দূরে যাউক—এক পাণ্ডব,—এবং পাণ্ডবগণের মধ্যে শ্রীভগবান্ যে ধনঞ্জয় বলিয়া নিজেকে শ্রীগীতায় উল্লেখ করিয়াছেন, সেই এক পাণ্ডব ধনঞ্জয়কে উৎপন্ন করিয়া দিতে পারেন,—যদি অর্জ্জুনের ন্যায় একটিমাত্র আদর্শ ক্ষত্রিয়ের আজ ভারতে আবির্ভাব হয়,—আবার যদি তিনি দেবদত্তশঙ্খহস্তে আবির্ভূত হইয়া সে শঙ্খে ফুৎকার দিয়া ভারতবর্ষ কাম্পত করিতে পারেন,—এবং “যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধরঃ” অর্থাৎ যেখানে অর্জ্জুন সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ হেতু আর একবার যদি এই ভারতে শ্রীকৃষ্ণ সারথিকে অর্জ্জুনের শ্বেতহয়যুক্ত-মহৎ রথে দেখিতে পাওয়া যায়,— তবে ভারতবর্ষের সমস্ত শোকপাপ-তাপমেঘ অচিরে দূরীভূত হইয়া ভারতের অদৃষ্ট ফিরে না কি ?

গৌতম ব্রাহ্মণের ন্যায় একটিমাত্র ব্রাহ্মণ, ‘অর্জ্জুনের ন্যায়

একটিমাত্র ক্ষত্রিয়, 'সমাধির ন্যায় একজনমাত্র বৈশ্য, ও বিদুরের ন্যায় একজন মাত্র শূদ্র যদি আজ ভারতে ফিরিয়া আসেন, তবে ভারতবর্ষ বর্ত্তমান দীনহীন কাঙ্গালসাজ ছাড়িয়া আবার কি শোভন বেশ ধারণ করে না ?

৪। তারা ও ৫। মন্দোদরী।

রাক্ষসশ্রেণীর নারীর মধ্যে ভগবানের দর্শনলাভ ও তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত চরিত্র কি প্রকৃত নিন্দনীয় ? প্রকৃত নিন্দনীয় কিনা তাহা সেই দেশকালপাত্র বিবেচনায় বিবেচিত হইলে বোধহয় প্রকৃত নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে না পারে। যদি হয়, তাহা আদর্শ না করিলেও, প্রবৃত্তি অনুসারে অন্যান্য অসংখ্য আদর্শ-অনুরূপ জীবনযাপন করার অবসর বর্ত্তমান নারীজীবনে রহিয়াছে।

কে সেই অবসর গ্রহণ করিতে উৎসুক ? দীর্ঘ সমালোচনাতেই এই হ্রস্ব জীবন ব্যয় হইয়া যায়,—আদর্শ স্থির করিয়া কার্য্য করার সময় কোথায় ?

এই সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম। নারী মাত্রেই ইহার অধিকারী। ইহাতে জাতিভেদ—বর্ণভেদ—কোন ভেদ নাই। কি দেবতা, কি দৈত্য, কি যক্ষ রক্ষ কিন্নর,—কি মানুষ,—এ ধর্ম্মে সর্ব্ব নারীর সম-অধিকার। ইহা নারীরই ধর্ম্ম।

৬। বিন্ধ্যাবলী।

শুনা যায় স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রলয়-কারী—ঘোরসর্ব্বনাশকারী ; সে বুদ্ধি শুনিয়া চলিলে সর্ব্বনাশ হয় ও যাঁহার সেই বুদ্ধি তিনি সর্ব্বনাশ করেন। অসতী স্ত্রীর

বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী কেন, মহাপ্রলয়ঙ্করা। কিন্তু সতী সাধ্বী স্ত্রীর বুদ্ধি তাহা নহে। সে বুদ্ধি সর্ব্বস্থিতিকারিণী—সর্ব্বার্থসাধনী—অতীব শুভকারিণী।

বামন অবতারে যখন দৈত্যরাজ বলির পরীক্ষা হয়, সেই উৎকট পরীক্ষায় যখন বলিরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়,—গুরু শুক্রাচার্য্য ও সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়াও যখন ভগবানের সেই দারুণ পরীক্ষার সুকঠিন প্রশ্নের সদুত্তর শিষ্যকে বলিয়া দিতে পারিতেছিলেন না,—তখন দৈত্যরাজ বলিকে কে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়াছিল? যখন ভগবানের তৃতীয় পদ তাঁহার নাভিদেশ হইতে বহির্গত হইয়া "ভূমি ভূমি" করিতেছিল,—যখন দৈত্যরাজের স্বর্গমর্ত্ত্য উভয় রাজ্য দান হইয়া গিয়া সে দুই স্থানে ভগবানের দুই পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল,—জীবনের সেই অতি কঠিন সময়ে, কে বলিরাজকে সুবুদ্ধি দিয়া রক্ষা করিয়াছিল? তাহা তাঁহার সহধর্ম্মিণী সতী সাধ্বী স্ত্রী বিন্ধ্যাবলী নহেন কি? সতী স্ত্রীর বুদ্ধিই তখন স্বামীকে সেই বিপদসাগর হইতে পার করে নাই কি? বিন্ধ্যাবলী স্বামীকে মস্তক পাতিয়া দিয়া সেই তৃতীয় পদের ভূমি দিবার ব্যবস্থা করেন নাই কি? দৈত্যপত্নীও সতীত্বের অধিকারিণী ছিলেন বলিয়া—সতীধর্ম্মের সেবিকা ছিলেন বলিয়া—বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীর বুদ্ধির একটি ছটা অলক্ষিতে সেই লক্ষ্মীরূপিণী সাধ্বী বিন্ধ্যাবলীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া সেই অপরূপ বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছিল। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়,—ধন্য সতী নারী, ধন্য তাঁহাদের পরম কল্যাণদায়িনী বুদ্ধি!

সতীত্ব।

সতীধর্ম্মের মহিমায় মহিমান্বিতা হইলে সতী স্ত্রী স্বামীর সুখের জন্য সমস্তই করিতে পারেন। তাই বেশ্যা লক্ষহীরার গল্পে শুনা যায় যে, কুষ্ঠ রোগী এক ব্রাহ্মণের সাধ্বী স্ত্রী, স্বামীর লক্ষহীরাসঙ্গের কুবাসন চরিতার্থ করাইয়া স্বামীকে সুখী করিতে পরাঙ্মুখী হন নাই। যদিও সে ব্রাহ্মণ সে বেশ্যার নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার গৃহ হইতে কোন কুকার্য্য না করিয়াই ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণীর হৃদয় যে কি উপাদানে গঠিত ছিল, তাহার ধারণা করিবার শক্তিও এক্ষণে অনেকের নাই। গলিতকুষ্ঠরোগীর নিরন্তর সেবা, তদুপরি স্বামীর ঐ কুপ্রবৃত্তি, —তথাপি স্বামীকে সর্ব্বান্তঃকরণে সেবা ও কুঅভিলাষ পর্য্যন্ত পূর্ণ করার ইচ্ছা—যে নারী করিতে পারেন, তাঁহাকে দক্ষের উপদেশমত "দেবতা সা ন মানুষী" অর্থাৎ সে নারী দেবতা—মানুষী নহেন—বলিতে কেহ কি দ্বিধা বোধ করিতে পারেন?

সে আদর্শ আজ কোথায়? স্রোত যেন বিপরীত দিকেই বহিতেছে। সে সব পুরাতন সতী নারীগণের ক্রিয়া লোপ হইয়া প্রতিক্রিয়ার দিন আসিয়াছে। সেই প্রতিক্রিয়ার ফলেই কি এখন পতি হইয়াও স্ত্রীকে পরপুরুষের ভোগে দিয়া স্ত্রীকে সুখী করিতে দেখা যায়?

ধন্য কালস্রোত! ধন্য কালমাহাত্ম্য!! ধন্য অতীত সতীত্ব!!! ধিক্ বর্ত্তমান অসতীত্ব!!!!

রাজপুতরমণী।

যাঁহারা মহামতি টড্ প্রণীত রাজপুতানার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই উচ্চ বংশের কি উচ্চ আশা—উচ্চ প্রাণ—

বীরত্ব ও সতীত্ব কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন। রাজপুতানা অনন্ত-কীর্ত্তিময়ী। তাহার সতীত্ব ও বীরত্ব-কাহিনী কখনও পুরাতন হয় না। সেই বীর-প্রসবিনী রাজ্য-ভূমিতে সতীত্বের সহিত বীরত্বের যেরূপ অপরূপ প্রকাশ হইয়াছিল, সেরূপ আর কোন দেশে হয় নাই। আর কোন দেশের সতীনারীগণ সেরূপ সৎ ও বীর সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। আর কোন দেশে সতীত্ব ও স্বদেশ প্রীতির বেদীর সম্মুখে এত বীর নরনারীর বলি পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ। রাজপুতরমণীগণ সতীত্বে, বীরত্বে ও আত্মোৎসর্গে জগতে অতুলনীয়। কি উপাদানে যে সেই রাজপুতললনাগণের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহা ধারণা করিলেও হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। মানব-জীবনকে এরূপ অতি তুচ্ছ জ্ঞান করার শক্তি অর্জ্জন করিয়া সতীত্বরক্ষার জন্য অসংখ্য নারীজীবন অকাতরে—হাস্যমুখে কিরূপে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ধারণা করার শক্তিও বোধ হয় অনেকের নাই। ব্যভিচার বিলাসিতার আদরে সে আদর্শ-চরিত্র একবার মনে আনারও অনেকের ইচ্ছা বা অবসর হয় না। দেহের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সহিত হৃদয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-জড়িত এরূপ নারী-জীবন,—একদেশে জগৎ কখনও দেখে নাই বা আর দেখিবেও না। রাজপুতানা সতীত্বের কীর্ত্তিস্তম্ভ—বীরত্বের সমাধিস্তম্ভ। কীর্ত্তিস্তম্ভে—সে সমাধিস্তম্ভে একবার দৃষ্টি পড়িলে আধুনিক নরনারীর জীবনে কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধির আভাস আনিতে পারে। যে অপরূপ-রূপ-মাধুরী থাকিলে তাহা ব্যভিচারের জগতে ছড়াইয়া দিবার জন্যই এখনকার অনেক নারী লালায়িত, সে অলৌকিক রূপলাবণ্য সতীত্বরক্ষার জন্য দলে

ফলে রাজপুতবীরাঙ্গনাগণ অনলে বা অসিতে স্বেচ্ছায় ধ্বংস করিয়া এ মরজগতে অক্ষয় যশঃ রাখিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। সে আদর্শ গ্রহণ করার শক্তিও এখন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হায় জাগতিক উন্নতি! হায় নারী-দেহ-প্রীতি!! হায় ইহকালসর্ব্বস্ব কাল !!!

রাজপুতানারাজ্য-গগনের সেই সতীনারী-তারাগণের সংখ্যা কে গণনা করিতে পারে? সে ত বহু শতাব্দীর কথা নহে? মাত্র ৫।৬ শতাব্দী পূর্ব্বে কত রাজপুতবীররমণা "সামান্য" সতীত্ব রক্ষার জন্য ভোগবিলাসের "অসামান্য" অমূল্য মনুষ্য-জীবন ঐভাবে নষ্ট করিয়া বাতুলতা দেখাইয়া গিয়াছেন। সামান্য অসামান্যের জ্ঞান,—বাতুলতা ও স্থিরমস্তিষ্কতার জ্ঞান অধুনা দেখিলে উহাই বলিতে ইচ্ছা করে।

কত নারী-দেহ-স্বর্ণলতা বীরত্ব-সতীত্ব-রত্নফলসহ অকালে জহর-অনলসাৎ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত স্বর্ণচূড়া ধূলিধূসরিত হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

একবার কি বীরনারী তারাবাই, জবহর বাই, অহল্যাবাই, দুর্গাবতী, বিদুলা, লক্ষীবাই, পদ্মিনী, ঝিন্দন বা চন্দ্রাবতী,—কত নাম করিব?—সেই অসংখ্য স্বর্ণলতা স্বর্গগতা বীর-সতীনারীগণ তাঁহাদের সেই প্রিয়তম স্বদেশের বর্ত্তমান দুর্গতিতে কাতরতা অনুভব করিয়া তাঁহাদের সে সতীত্বের—সে বীরত্বের কণামাত্র তেজঃ এ মরজগতে এখন পাঠাইতে পারেন না? স্বর্গে গেলে কি স্বদেশের জন্য আর কিছুই করিবার শক্তি থাকে না? যদি থাকে, তবে সে শক্তির পরিচয় তাঁহাদের ত্যক্ত দেশের প্রতি দেখাইতে

তাঁহাদের ইচ্ছা হইতেছে না কেন? তাঁহাদের অতীত জন্মভূমি —এই ভারতভূমি—কি তাঁহাদের বর্ত্তমান বাসস্থান স্বর্গভূমি হইতে তাঁহাদের নিকট এখন আর গরীয়সী বলিয়া মনে হয় না? বোধ হয় তাঁহাদের দাসী হইবার উপযুক্ত চরিত্রও বর্ত্তমান সময়ে না দেখিতে পাইয়া,—তাঁহাদের ধাত্রী "পান্না'র চরিত্র—যে চরিত্র-বল প্রভুপুত্র-রক্ষার জন্য নিজগর্ভজাত পুত্রকে অনায়াসে বলি দিতে পারে,—বর্ত্তমান নারী-সমাজে সে চরিত্র-চিত্র পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখিতে না পাইয়া, তাঁহারা উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। বোধ হয় "বেনাবনে মুক্তা ছড়ান নিষ্প্রয়োজন"—এই জ্ঞানে তাঁহারা অচল হইয়া রহিয়াছেন। এ "বেনাবন" ভারতবর্ষ আর কতদিন রহিবে? কবে শুক্তিতে অনাদর ও মুক্তার আদর আবার করিতে শিখিয়া এ পাপদেহবন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের উপায় অবলম্বন করিবে? এ ব্যভিচার-দামোদরে সংযম ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধিবার জন্য কবে কোন্ স্থপতিপুঙ্গব নিযুক্ত হইবেন, তাহা ভারতের ভাগ্যবিধাতা—বিশ্ব-বিধাতাই জানেন।

সতীত্ব।

(১ বর্ত্তমান আদর্শ।

প্রাচীনকালের আদর্শ সতী নারীগণের চরিত্র ও আচরণ হইতে
দেখা যায় যে, স্বামীর প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও
অতুলনীয় ভালবাসা ছিল,—স্বামীকে তাঁহারা দেবতাজ্ঞানে ভক্তি
করিতেন,—স্বামীর পিতামাতা ভাই ভগিনীগণকেও আপনাদের
পিতামাতা ভাইভগিনীগণের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা কায়মনো·
বাক্যে স্বামীতে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন, স্বামীর সর্ব্ববিধ তৃপ্তি-
৭ সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন,—স্বামীর অর্থাৎ আপন
হৃদয়-মন্দিরের দেবতার অভাবে পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেন এবং
একপ্রাণ থাকায় স্বামীর প্রাণবায়ু বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে
নিজেদের প্রাণান্ত জ্ঞান করিতেন। ঐগুলিই সতীত্ব-ধর্ম্মের মূল-
মন্ত্র বা বীজমন্ত্র। সংসারে পুত্রকন্যা আদি ও সাংসারিক নানা
সুখ-সচ্ছন্দতা ও ধনরত্ন সকলের মধ্যে স্বামীকেই সর্ব্বপ্রধান—
সব সুখের আদি বা মূল কারণ বলিয়া জানিতেন। নিজের
পৃথক্ অস্তিত্ব জ্ঞান থাকিত না; স্বামীর অস্তিত্বেই নিজ অস্তিত্ব
ও তাহার অভাবে নিজের অস্তিত্বও লোপ হইল জ্ঞান করিতেন।
৮ স্বামীর অস্তিত্বে আপন অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া স্বামীর সহিত
ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া এক হইয়া থাকিতেন; দুই ভাব থাকিত
না। আধাআধি বা শরিকী ভাব বা পৃথক্ ভাব তাঁহাদের মধ্যে
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আপন জীবন বা সংসাররূপ ১০০০০০

এক লক্ষ মধ্যে পতিকেই সর্ব্বপ্রধান ১ অঙ্ক দেখিতেন। পতির এক অঙ্কশায়িনী থাকিয়া তিনিও স্বামীর সহিত এক হইয়া সেই ১ একই থাকিতেন। এক লক্ষ মধ্যে যে একমাত্র লক্ষ্য ১, তাহার অভাবে ডাহিন দিকে যত কিছু থাকুক,—যত সংখ্যাবাচক অঙ্কই থাকুক,—বিধি বাম হইলে,—সেই বামের ১ অভাবে,—সবই শূন্যময় দেখিতেন। এখন যে আধা আধি বা "আদা-আদি" ভাব দেখা যায় ও সেই ১ এর অভাবেও স্ত্রী নিজে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারী মনে করেন, তখন তাহা ছিল না। সেই ১ এক স্বামীর অভাবে সবই শূন্যময় বোধে নিজ অসার জীবন বিসর্জ্জন দিতেন ও স্বামীর সহিত অমরধামে যাইতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না, অথবা অবশিষ্ট জীবন জীবন্মৃত হইয়া থাকিতেন।

প্রকৃত কম্পাসের মুখ উত্তর দিকে থাকিবেই—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ঠিক কম্পাস হইলে তাহাকে যতই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেওয়া হউক, যে ভাবেই রাখা হউক, স্থির হইলে তাহার মুখ উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করিবেই, কিছুতেই ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখা যাইতে পারে না। সেইরূপ যথার্থ সতীনারীর মুখ কম্পাসের কাঁটার মত পতির দিকে থাকিবেই, কিছুতেই অন্য দিকে থাকিতে পারে না,—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যে নারী-কম্পাসের মন-কাঁটা উত্তরদিকে—পতির দিকে—স্বভাবতঃ ফিরিয়া না থাকে, তাহাকে প্রকৃত কম্পাস বা প্রকৃত সতী বলা যাইতে পারে না। কম্পাসের কাঁটাটি যেমন বিশেষ ধাতুতে নির্ম্মিত, ও সেই বিশেষ ধাতুর স্বভাবতঃ কার্য্য যেমন উত্তরদিক্ নির্ণয়, সতীর মনপ্রাণও সেইরূপ

এক বিশেষ ধাতুতে গঠিত, ও সেই বিশেষ মনপ্রাণের স্বাভাবিক কার্য্যও সেইরূপ পতি-ভক্তি ও পতির মুখাপেক্ষিতা। উত্তরদিক্ নির্ণয় না করিয়া যেমন কম্পাস হওয়া যায় না, সেইরূপ স্বামী-মুখাপেক্ষা না হইলে সতী হওয়া যায় না। কার্য্যেই কম্পাসের কম্পাসত্ব,—কার্য্যেই নারীর সতীত্ব। স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে যেমন অন্যধাতুনির্ম্মিত বস্তুকে কম্পাস বলা যায় না, সতী-স্বভাবের বিরুদ্ধ-কার্য্য করিলে নারীকে তেমনই সতী বলা যায় না। মহাসাগরে নাবিকের কম্পাস যে মহৎ উপকার করে, এই সংসার-সাগরে পতি-নাবিকেরও সতীনারী মহা উপকারিণী হইয়া থাকেন। কম্পাস বিগড়াইয়া গেলে নাবিকের ও তাহার জাহাজের যে দুর্গতি হয়, নারী বিগড়াইয়া গেলে পতির ও তাঁহার সংসারেরও সেইরূপ দুর্গতি হয়। সতী নারীই সংসারের একমাত্র পথ-প্রদর্শক ও প্রধান সহায়। যে পতি-নাবিক সংসার-সাগরে জীবন-তরণী ভাসাইবার সময় সতীনারীকম্পাসসহযোগে সে তরণী আরোহণ করিবার ভাগ্য অর্জ্জন করেন, তিনিই ধন্য ও তাঁহাদের তরণী এ অকুলপাথারে কুল পায়। তাহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। সেহেতু সতীত্বগুণ-ভূষিতা সতীসাধ্বী কুলনারী এ সংসারে অশেষ কল্যাণদায়িনী—অমৃতস্বরূপিণী। সেই অমৃতই দেবত্ব প্রদানে সমর্থ। বিপরীত গুণে নারী গরলময়ী—বিষপুত্তলিকারূপিণী ও সর্ব্বনাশ-কারিণী।

সে কালের নারীজাতির সতীত্ব, স্বাধীনতা, স্বার্থ, পরাধীনতা, ভক্তি বিশ্বাস ও ভালবাসার ভাব-ধারা যে খাতে বহিত, এক্ষণে

তাহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কালের নারীজাতির ঐ সব ভাব-ধারা পূর্ব্ব প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না। প্রাচীন আদর্শের পূর্ব্বমত বিশ্বস্তভাবে অনুকরণ এখন স্মরণীয় অতীতের বিষয় হইয়া যাইতেছে। সেকালের সতীত্ব নিখুঁত, কিন্তু-হীন, উচ্চতম ও পবিত্রতম ছিল। তাহাতে এক্ষণে অনেক খুঁত, কিন্তু-ভাব-যুক্তভাব, অপবিত্রতা ও নীচতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা কালেরই ক্রিয়া। তখনকার স্বাধীনতা ও পরাধীনতার সহিত এখনকার স্বাধীনতা ও পরাধীনতার অনেক তারতম্য লক্ষিত হয়। এখনকার "আপন" ও "পরের" সম্বন্ধে ধারণা, তখনকার ঐ সম্বন্ধীয় ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া যাইতেছে। কে আপন, কেবা পর, আগে যাহা সিদ্ধান্ত ছিল, এ' তাহা বদলাইয়া যাইতেছে। তখনকার মতে পতি ভিন্ন "স্ব" বা আপন আর কেহই জগতে ছিল না; এখনকার মতে অনেক স্থলে পতি ভিন্ন আর সকলেই আপন। তখন পতিই "স্ব" বা আপন থাকায় পতির অধীন থাকিলে স্বাধীনই থাকিতেন এবং তাহাই গৌরবের বিষয় ছিল। এখনকার "স্ব" অর্থে "আমি নিজে"—অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়পরবশ উদ্দাম মন; এবং "স্বাধীনতা" অর্থে সেইরূপ মনের বশীভূত থাকিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করার ক্ষমতা। এখনকার "স্বার্থ"ও ঐরূপ "স্ব"এর অর্থ বা প্রয়োজনই বুঝায়। তখনকার স্বামীই আপনার জন—আপনার জিনিস—থাকায় "পর" অর্থে স্বামীকে বুঝাইত না, কারণ স্বামী কখনও তখন "পর" ছিলেন না, এবং স্বামীর অধীনে থাকিলে তাহা পরাধীনতা বলিয়া গণ্য করা হইত না। এখন পরকে আপন করিতে ও আপনকে পর

করিতে শিক্ষা করিতে গিয়া, পর কখনই আপন হয় না—বলিয়া পর ত আপন হইলই না, পর পরই রহিয়া গেল, অধিকন্তু আপনও পর হইয়া গেল ও রহিল। এখন স্বামীর অধীন থাকা মহা পরাধীনতার মধ্যে গণ্য হওয়ায় তাহা তথাকথিত সভ্যজগতে চলে না দেখিয়া তাহা মহা কষ্টকর জ্ঞানে স্বামী বা তাঁহার আত্মীয় স্বজনের অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন-ভাবে সংসার-আকাশে উড়িতে শিক্ষা হইতেছে।

অপরকে বড় বলিয়া স্বীকার ও গণ্য করিলে, এবং নিজেকে ছোট বলিয়া স্বীকার ও গণ্য করিলে, তবেই সেই অপরের অধীন হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু অপরকে ছোট দেখিলে ও নিজেকে বড় দেখিলে তাহার অধীনতা বা পরাধীনতা দুঃসহ হয়। এই "ছোট" "বড়" লইয়াই জগতে যত মারামারি ও ভীষণ অশান্তি। সবাই বড় হইতে চাহে; কেহই ছোট থাকিতে চাহেনা। বুদ্ধি-বল, পশু-বল, মনোবল, তপোবল, দৈব-বল, ধর্ম্ম-বল প্রভৃতি বলের কথা তখন শুনা যাইত; তথাকথিত ভদ্রসমাজে এখন দৈব-বলের, ধর্ম্ম-বলের ও তপোবলের উল্লেখ করিবার উপায় নাই। যত প্রাচীন কিছু, সবই কুসংস্কার; সুতরাং সে সব টাকা এখনকার সভ্যজগতের অভিজ্ঞতার ও আদর্শের টেবিলের উপর বাজাইলে কি এক রকম বে-সুরে বাজে বলিয়া তাহা "বাজে" বা "মেকি" বলিয়া ত্যাগ করা হয়। মনোবল এখন আর প্রাধান্য পান না; কারণ মন বড় দুর্ব্বল হইয়া যাওয়ায়, দুর্ব্বলের আর বল কি? এখন পশু-বল ও বুদ্ধি-বল জগৎকে চালাইতেছে। পশু বল শারীরিক বল; তাহার

অল্পতা থাকিলেও কেবল বুদ্ধি-বলেই কার্য্য সাধিত হইতেছে। বুদ্ধিও যে কত রকম, কত রংএর, তাহার আর শেষ নাই। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-সম্মত বুদ্ধিরই প্রাধান্য; তাহা জগতের রক্ষার কার্য্যে তত ব্যয়িত না হইয়া, কত প্রকারে, কত সহজে ও কিরূপ অধিক পরিমাণে ধ্বংসসাধন করা যায়, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে ব্যয়িত হইতেছে। সেহেতু ধ্বংস-বুদ্ধিই এখন সভ্যজগতে সার বুদ্ধি বলিয়া গণ্য হইতেছে। ভারতও সে সভ্যতার টানে আর ঘুমাইয়া থাকিয়া অসভ্য থাকিতে পারেনা। কাজেই ভারতকে জাগিতে হইতেছে, এবং সেই বৈজ্ঞানিক ধ্বংসবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাহার চর্চ্চায় ব্যাপৃত হইতে হইতেছে। ভারতের নারীজাতি সে বুদ্ধিতে পুরুষ অপেক্ষা কম—ইহা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিতেছেন; সুতরাং সেই ধ্বংসবুদ্ধির দুই একটি ছটায় আলোকিত হইয়া সেই বুদ্ধিতে বুদ্ধিমতী হইবার গর্ব্ব অনুভব করিয়া জগতের সভ্যজাতির অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতে ধাবিত হইতেছেন।

ধনী বংশ ক্রমে দরিদ্র হইলে পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত মণিমুক্তা ধনরত্ন হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের গাত্রের অলঙ্কার ও মূল্যবান্ শাল দোশালা সমস্তই একে একে বিক্রয় করিয়া বিসর্জ্জন দিতে থাকেন। ধনী জাতিও পূর্ব্ববিদ্যাজ্ঞানগৌরব হারাইয়া দরিদ্র হইলে,—মূর্খ ও তাহার ধন যেমন অচিরে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়,—সেইরূপ পূর্ব্বের ধন সম্পত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে বিসর্জ্জন দেয়; এবং বহুমূল্যের দ্রব্য অভাবের তাড়নায় অতি অল্প মূল্যে ছাড়িতে বাধ্য হয়।

ভারতও এককালে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার চূড়ায় উন্নত হইয়াছিল। বিদ্যা, জ্ঞান, ভক্তি আদি কত মহামূল্য রত্ন যে ভারত-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কালের কুটিল গতিতে ভারত পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শন সেই সব ধন-রত্নই হারাইয়াছে। হিন্দুরমণীগণের অঙ্গে যে অমূল্য সতীত্বরত্ন শোভা পাইত, আধুনিক সভ্যতার আকর্ষণে সে রত্নের আদর ভুলিয়া তাহাও বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। সে সতীত্ব-রত্ন পরশ-মণি ; অন্য ধাতুপাত্রে স্পর্শ করাইলেই তাহা স্বর্ণ হইয়া যায়। সে সব দেখিয়া শুনিয়াও আজ সে পরশমণিও ভারত অতলজলধি-জলে ভাসাইয়া দিতে বসিয়াছে। ইহা কালেরই মাহাত্ম্য। তাই তুলসীদাস দোঁহায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"ঘরকা বহুরি পিরীত না পাওয়ে
চিত্ত চোরাওয়ে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা
দুখ লাগে আর হাসি।"

অর্থাৎ—ঘরের স্ত্রী—যে স্বামীর জন্য প্রাণপণ করে—সে ভালবাসা পায় না ; দাসীতে চিত্তহরণ করে ; ধন্য কলিযুগ ! তোমার তামাসা দেখিয়া দুঃখও পায়, আবার হাসিও পায়।"

আর্য্যগণের যে সভ্যতা ও সমাজ জগৎকে মোহিত করে,—সেই সকলের কেন্দ্রস্থল হিন্দুর ঘরের স্ত্রী,—আর এখন ভালবাসা পান না। এখন চিত্ত চুরি করে কে ? না,—দাসী, নীচকুলোদ্ভবা দাসী,—যে ঘরের স্ত্রীর দাসী হইবার উপযুক্ত কিনা সন্দেহ,—সেই দাসী—বিদেশী সভ্যতা ও সমাজ। বাস্তবিকই কলিকালের বা

অদৃষ্টের এ পরিহাস—এ তামাসা—এ রহস্য দেখিলে দুঃখে কান্না পায়, ও হতাশের হাসিও পায়। দুঃখে মর্ম্মস্থল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

দাসী অবরোধে থাকে না; সে হাটবাজারে যায়, যথা তথা যায়, যাহা ইচ্ছা করে, সে স্বাধীনা। স্বাধীনা দাসীর হাবভাবে এখন মুগ্ধ হইতে হইতেছে। অবরোধে—অবগুণ্ঠনে—লজ্জাবনতা ঘরের স্ত্রীতে এখন আর মন উঠে না। কাজেই ঘরের স্ত্রী এইসব অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অবরোধের—অবগুণ্ঠনের—লজ্জার বাহিরে আসিয়া, দাসী সাজে সাজিয়া, আবার স্বামীর মন পাইবার জন্য আজ সচেষ্টা হইতেছে। স্বামীর অনাদর স্ত্রীর অসহ্য; স্বামী পাইবার জন্য স্ত্রীলোকে সব করিতে পারে। যমে লইলে সহ্য হয়, কিন্তু অপর স্ত্রীলোকে লইলে সহ্য করিতে পারে না। তাই সতীত্বের পূর্ব্ব আদর্শ ভুলিতে, পূর্ব্বগৌরব সব ভুলিতে রাজী, যদি স্বামী পায়। তাই ঘরের স্ত্রী দাসীর ন্যায় ব্যবহার শিখিতে বাধ্য হইতেছে—পাছে স্বামী হারাইতে হয়। স্বামী বিবাহে যে পাণি গ্রহণ করিয়াছেন, সে পাণি স্বামীর তুষ্টির জন্য যে সে পুরুষকে করমর্দ্দন ছলে গ্রহণ করিতে দিতে সঙ্কোচ নাই। সঙ্কোচ—লজ্জা থাকিলে ঠিক দাসী হইতে পারা যায় না,—ঠিক দাসী হইতে না পারিলে স্বামীর মন পাওয়া যায় না; সুতরাং যাক্ সব, থাক্ স্বামী।

হে হিন্দুপতিগণ! একবার চক্ষু চাহিয়া দেখ দেখি! দাসীর প্রেমে কি তুমি প্রকৃত সুখী? প্রকৃত সুখও পাইলে না,—সব নষ্ট করিলে,—সর্ব্বনাশ করিলে! সতীত্বের দুর্গ—অবরোধ—ভূমিসাৎ

করিতেছ। ভাঙ্গা খুবই সহজ, গড়াই কঠিন। পূর্ব্বপুরুষগণ যে সুন্দর বাড়ী করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন,—দরিদ্র হইয়া সেই পৈতৃক ভিটাও ঘুচাইতে বসিয়াছ কিনা একবার বিবেচনা কর। শ্রীচণ্ডীতে ভগবতীকে "কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা" অর্থাৎ "সৎকুলে জাত ব্যক্তির লজ্জা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অর্থাৎ সৎকুলে জাত ব্যক্তির মধ্যে লজ্জা বলিয়া জিনিষটি থাকে। সেই লজ্জাই সতীলক্ষ্মী-দিগের লক্ষ্মীশ্রী। লজ্জাই হিন্দুনারীগণের প্রথম আভরণ, প্রধান শোভা। উহা হিন্দুসতীনারীগণের দেহরক্ষার প্রধান লৌহ-আস্তরণ বা বর্ম্ম, ও প্রধান ধর্ম্ম। অবগুণ্ঠন তাহার প্রধান সহায়ক ঢাল। অবরোধ তাহার সুদৃঢ় দুর্গ। মহাকবি কালিদাস "অভিজ্ঞান শকুন্তলং" নাটকে লিখিয়াছেন "অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রং" —অর্থাৎ পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে নাই। সেইরূপ কুল-নারীর পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও পাপ। উভয়কে এই পাপ হইতে রক্ষা করার জন্যই অবরোধপ্রথা ও অবগুণ্ঠনে লজ্জা রক্ষার ব্যবস্থা। নারীর রূপ-শিখা অবগুণ্ঠনের আচ্ছাদনে ঢাকিয়া না রাখিলে পর-পুরুষ-পতঙ্গ তাহাতে পড়িয়া পুড়িয়া মরিতে পারে। ব্যভিচারপূর্ণ কুকটাক্ষপাতেও উভয়ের ব্যভিচার সংঘটিত হইতে পারে। সেই জন্য লজ্জা সতীনারীর অতি আদরণীয় ও অতি প্রয়োজনীয়। লজ্জা যদি কুসংস্কার হেতু ত্যাজ্য হয়, তবে উচ্চ বা সৎকুলে জন্মগ্রহণও কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সুতরাং নিজেরা লজ্জার মাথা খাইও না,—স্ত্রীলোকদিগেরও লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাদের মাথাও খাইও না। সবই কুসংস্কার বোধে একেবারে সব না ছাড়িয়া পূর্ব্বপুরুষগণের দুই একটিও কুসংস্কার

রাখিতে দেও। দেখিবে যাহাকে রাখ সে-ই রাখে। অবরোধের বেড়া একেবারে ভাঙ্গিও না। বালিকা কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতি চারাগাছ; স্ত্রী না হয় বড় গাছ হইয়াছেন, বড় ঝড়ে বা তাহাতে হাতী বাঁধিয়া দিলেও তাহার ক্ষতি না হইতে পারে; কিন্তু চারা-গাছগুলি ছাগল গরুর গ্রাস হইতে বেড়া দিয়া রক্ষা কর। নতুবা সেগুলিকে মুড়াইয়া খাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহাদিগকেও বড় গাছ হইবার সুযোগ দেও। অবরোধ, অবগুণ্ঠন, লজ্জা—সব একেবারে ঘুচাইয়া দিও না। ঐ সব ব্যবধানের—বাঁধের দরকার। নতুবা ব্যভিচার-বন্যায় সব ভাসিয়া যাইবে না কি?

অনেকস্থলে পুরুষের গুণেই স্ত্রী ভাল হয়, এবং পুরুষের দোষেই স্ত্রী মন্দ হয়। পুরুষ জোর করিয়া স্ত্রীর গাত্রের অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়া তাহা বেশ্যা বা দাসীর পদে সঁপিলে, স্ত্রীকে অলঙ্কারহীনা—নিরাভরণা হইতে হয়। তাই পুরুষের দোষে এখন নারী-দেহে সতীত্ব-অলঙ্কারের অভাব দেখা যাইতেছে। যাহাও আছে তাহাও সে কালের পাকাসোনার গড়ন নহে,—অতি মরা সোনার বলিয়াই বোধ হয়। স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিলে তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা বলা যায় না। বড়কে বড় বলিলে বা করিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যে প্রকৃত ছোট, তাহাকে "বড়" "বড়" করিয়া বড় করিয়া দিলেই সে বড়র ন্যায় কার্য্য করিতে পারে না; ছোটর স্বভাব অনুসারে সে ছোটর ন্যায় কার্য্যই করিয়া থাকে। শশকের স্ত্রীকে সিংহপত্নী মনে করিলেও সে কখনই সিংহশাবক প্রসব করে না। বায়সীর কণ্ঠ যতই "নালারসসঞ্জাত" করা হউক, সে কণ্ঠে কর্কশ "কা" "কা" রবের

পরিবর্ত্তে মধুর কেকারব বাহির হয় না, বা তাহাকে ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত করিয়া দিলেই সে নবীননীরদজালদর্শনে সেই মনোহর পুচ্ছ বিস্তার করত তাহার সেই স্বভাবতঃ সুন্দর নৃত্যে প্রাণ বিমোহিত করিতে পারে না। চাটুবাক্যরূপ প্রবল মলয় পবনে অসার শাল্মলী তরুরূপা নির্গুণা রমণীকে যতই আন্দোলিত ও বিকম্পিত করা হউক, তাহাকে সুরভিপূর্ণ চন্দনবৃক্ষে পরিণত করা যায় না। রঙ্গালয়ের নটীগণকে যতই সীতা—সাবিত্রী—দময়ন্তীর সাজে সাজাইয়া সুন্দর অভিনয় করান হউক, তাহাতে তাহাদিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। ভস্মে সাজিলেই ভণ্ড সন্ন্যাসী যেমন শিব হইতে পারে না, সাজিলেই বা সাজাইলেই নরনারী প্রকৃত ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা হইতে পারে না। চিত্রিত কমলিনী যতই মনোরম হউক না কেন, তাহা হৃদয়ে মধু ও সুরভি-সম্ভার ধারণ বা আনয়ন করিতে পারে না, বা তাহার স্বাভাবিক সেই গুণে লুব্ধ করিয়া ভৃঙ্গকে আকর্ষণ করিতে পারে না, অথবা গন্ধবহগাত্রেও আপন পরিচয় প্রেরণ করিতে পারে না। আসলে ও নকলে স্বর্গ নরক প্রভেদই থাকিয়া যায়। বড়র গুণ সৃষ্টি না করিতে পারিলে ছোট কখনও বড় হইতে পারে না; ছোট ছোটই থাকিয়া যায়। ছোটমুখে বড় কথা বিষের সমান, এবং প্রকৃত ছোটকে বড় জ্ঞান করিয়া বিষবৃক্ষ রোপণ করিলে সমাজে যে বিষ ছড়াইয়া পড়ে, তাহা বর্ত্তমান সমাজের অবিদিত নাই।

প্রাচীনকালের স্ত্রীলোকেরা জানিতেন—“বড় হ’তে চাও যদি ছোট হও তবে।” ছোট না হইলে একেবারে বড় হওয়া যায় না। তখনকার সতীনারীগণ তাই ছোট হইয়া,—স্বামীর বশে

থাকিয়া,—সতীত্ব-মহিমায় কত বড় হইয়াছিলেন। আর এখনকার স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই "হাম বড়া" হইতেছেন,—ডিঙ্গি মারিয়া বড় হইতে চাহিতেছেন,—টলিয়া পড়িতেছেন। সে পতন অনিবার্য্য।

নিজ গুণগরিমা নিজের মুখে ব্যক্ত করিলে তাহা মিষ্ট লাগে না। অপরের মুখ দিয়া সুখ্যাতি বাহির হইলেই তাহা প্রকৃত সুখ্যাতি এবং তাহাই বড় মিষ্ট হয়।

কে বলে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা ছোট? একটি ১৫।১৬ বৎসরের ছেলে ও একটি ঐ বয়সের মেয়ে তুলনা করিলে দেখা যায়,—ছেলেটি নাবালক, অতি অল্পবুদ্ধি; তাহার বুদ্ধির কিছুই পরিপক্কতা হয় নাই (অবশ্য ইঁচড়ে পাকা—পক্কান্ন—ছোকরার কথা বলিতেছি না);—অপরদিকে ঐবয়সের মেয়ে সন্তানের মা, ও এ সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা গৃহিণী হয়। মাতৃত্বেই নারীজাতির শ্রেষ্ঠত্ব। পুরুষ ত ছেলে। ছেলে কখনও মা'র চেয়ে বড় হইতে পারে?

বর্ণমালায় দুই প্রকার বর্ণ আছে, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। ঐ উভয় বর্ণ লইয়া বর্ণমালার সৃষ্টি। স্বরবর্ণ মাত্র ১২টি হইতে পারে, ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক হইতে পারে, এবং কাহারও মাথায় পাগ্‌ড়ি, কাহারও কাঁধে বাড়ি, কেহ আঁকুড়ে, কেহ বকমুখো, কেহ ন্যাংভাঙ্গা, কেহ বেগুনে, কেহ কোলটানা ইত্যাদি হইতে পারেন। কিন্তু স্বরবর্ণের সাহায্য ভিন্ন তাঁহাদের উচ্চারণ হয় না বা প্রকাশ হয় না। সেইরূপ মনুষ্যজাতি—স্ত্রী ও পুরুষ—এই উভয় বর্ণের সমষ্টি। স্ত্রী স্বরবর্ণ ও পুরুষ ব্যঞ্জন-বর্ণের স্বরূপ। এই স্ত্রী-স্বরবর্ণের সাহাষ্য ব্যতীত পুরুষ-ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ, প্রকাশ বা ব্যবহার অসম্ভব। যে পুরুষ এই

স্বরবর্ণকে ছোট জ্ঞানে ও নিজে বড় জ্ঞানে তাহা ছাড়িয়া নিজে প্রকাশ পাইতে যান, তিনি বাতুল বা পাগল। তাঁহার দশার প্রথমেই হাড়গোড়ভাঙ্গা "দ"কে দেখা যায়। স্ত্রীজাতি স্বর বা শক্তিবর্ণ; পুরুষ শিব বা ব্যঞ্জনবর্ণ। শক্তি ভিন্ন শিব শব মাত্র।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"জন্তূনাং নরজন্ম দুর্ল্লভম্। অতঃ পুস্ত্বং ততো বিপ্রতা"—অর্থাৎ প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ; মনুষ্য মধ্যে পুরুষজন্ম, আবার পুরুষজন্মের মধ্যে ব্রাহ্মণজন্ম শ্রেষ্ঠ।" এই উক্তিকার শঙ্করাচার্য্যও মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী ভারতীর নিকট জ্ঞানবিশেষে প্রথমে পরাস্ত হইয়া সে জ্ঞানলাভের জন্য পরদেহে প্রবিষ্ট হন এবং সেই জ্ঞানলাভের অধিকারী হন।

পুরুষ শ্রেষ্ঠ তখন, যখন তিনি নারীনাথ। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ তখন, যখন তিনি ভক্তিনাথ। ভক্তিহীন জ্ঞান শুষ্ক—নীরস। জ্ঞান-মিশ্রিতা ভক্তি বা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান একই; তখন জ্ঞানভক্তির ছোট বড়—স্ত্রীপুরুষের ছোট বড়—ভেদ করা যায় না; এবং তখন উভয়ের কোন পার্থক্যও থাকে না। পরমহংসদেব বলিতেন—"ভক্তি মেয়েমানুষ, (ভগবানের) বাড়ির মধ্যে—অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান পুরুষ মানুষ, বাহির বাড়ি পর্য্যন্ত যাইতে পারে।"

মাতৃজাতি নারীজাতি এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়ে যে কত বড় বড় পরীক্ষায় অক্লেশে উত্তীর্ণ হইতেছেন ও অনেক পুরুষকেও উত্তীর্ণ হইতে এত সাহায্য করিতেছেন, সে সব পরীক্ষার তুলনায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই চারিটি ছাই পাঁস পাশ করা কিছুই নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব পাস করার বুদ্ধি ত তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধির

সহিত তুলনায় অতি তুচ্ছ ব্যাপার। হিন্দুর সংসারে নারীর উপর যে সকল কার্য্যের ভার থাকে ও পুরুষের উপর যে সকল কার্য্যের ভার থাকে, তাহা তুলনা করিলে নারীজাতির ভার লঘু ত নহেই, বরং সে ভার গুরুতর বলিয়াই মনে হয়। সে ভার বহিতে যে বুদ্ধির বা ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা পুরুষের বুদ্ধির বা ক্ষমতার তুলনায কিছুতেই কম নহে। সুসভ্যতার অনুরোধে হিন্দুপরিবারের পবিত্রতম স্বাধীন অবরোধের বাহিরে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নারীর বুদ্ধিমত্তার বা শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থাপনের চেষ্টা নিতান্ত নিস্প্রয়োজন। পুরুষের সমকক্ষতা বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করার প্রয়াসও অনাবশ্যক। কারণ কেহই নারীব ক্ষমতায় সন্দিহান নহেন। কিন্তু নারী পুরুষোচিত বিষয়ে পুরু‍ে সমকক্ষতা করিতে গেলেই, প্রথমেই আপনার হীনতা স্বীকার করিয়া ফেলেন। যথার্থ হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া হিন্দুপরিবারের শ্রেষ্ঠরত্ন—সতী স্ত্রীরত্ন যে কত মূল্যবান্, তাহা বাজারে বাহির হইয়া আর যাচাইতে হয় না। হিন্দুপরিবারে সাবেক সব প্রথা বজায় রাখিয়া পূর্ব্ব সতীত্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার যে পরাক্ষা, তাহাই হিন্দুনারীর সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। সেই কঠিনতম পরীক্ষার ভয়ে অনেকে তাহা অপেক্ষা অতি সহজ অপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ বাহাদুরী লইতে চাহেন।

ক্ষেত্রে বৃষের পরিবর্ত্তে গাভীর দ্বারা হল চালনা করা ও দেখা যেরূপ নিন্দনীয় ও কষ্টকর, এ সংসারক্ষেত্রে নারার স্কন্ধে পুরুষের কর্ত্তব্যের ভার স্থাপন করা ও দেখাও বিশেষ নিন্দনীয় ও কষ্টকর নহে কি ?

সতীত্ব

নারী শক্তি-স্বরূপিণী। নারী-শক্তির তুলনায় পুরুষ-শক্তি কিছুই কার্য্যকরী নহে। নারীজাতি বিনয় ও প্রণয়ভরে নত হইয়া স্বেচ্ছায় পুরুষ অপেক্ষা ছোট স্বীকারে নিজেদের মহত্ত্ব দেখাইয়া থাকেন। নারী যে পুরুষের "দাসী" বলেন, সে কেবল বিনয়ে! বিনয়ই বিদ্যার ভূষণ। যেখানে বিদ্যা সেখানেই বিনয়। সেহেতু বিদ্যারূপিণী নারী বিদ্যাবুদ্ধিতে কোন অংশেই পুরুষ অপেক্ষা হীন নহেন। পুঁথিগত বিদ্যা বিদ্যাই নহে। হিন্দু সতীনারী আপনার সংসারে যে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় অষ্টপ্রহর দেন, তাঁহাদের ৫।৭ টা পাশ করা পতিও তাহার পরিচয় দিতে পারেন না! সাংসারিক অভিজ্ঞতায় অনেক বিদ্যাবুদ্ধির দরকার। শুধু পাশকরা বিদ্যাবুদ্ধি সে অভিজ্ঞতা লাভে কুলায় না। নারীর সাংসারিক অভিজ্ঞতা দেখিলেই পাশকরা বিদ্যাবুদ্ধি যে কিছুই নহে, ও সে বিদ্যাবুদ্ধিওয়ালা পুরুষের চেয়ে নারী যে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাঁহারা যখন আপনাদিগকে "দাসী" বলেন, তখন বোধ হয় তাহার অর্থ—"যাহার দাস আছে সেই দাসী"। যেমন যাহার ধন আছে সে ধনী, যাহার মান আছে সে মানী, যাঁহার জ্ঞান আছে তিনি জ্ঞানী। কিন্তু যদি "দাসী" মানে প্রকৃত সেবিকা হয় এবং পতি যদি সেব্য হন, তাহা হইলেও সেবক বা সেবিকা বড়, কি সেব্য বড়, তাহাও বুঝা কঠিন।

ভক্ত বড়, কি ভক্তি যাঁহাকে করা যায় তিনি বড়, ইহা বুঝা শক্ত। ভগবান্‌ও ভক্তকে বড় করিয়া ভক্তের কাছে যেন ছোট হইয়া থাকেন। যদ্যপি ভক্তের যোগ ক্ষেম বা মঙ্গল বহন করার

জন্য ভগবান্ ব্যস্ত থাকেন,—যদি ডাকিবামাত্র তাঁহার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সশিষ্য দুর্ব্বাসার কোপ হইতে ভক্ত পাণ্ডবগণের রক্ষার ন্যায় ভক্তমাত্রকে রক্ষার জন্য তাঁহাকে ছুটিয়া আসিতে হয়,—তাহা হইলে ভগবান্ সেবক ও ভক্ত সেব্য কিনা তাহা বুঝা কঠিন হয়।

যে বড় সেই ছোটকে ধারণ করিতে পারে! হাতের চেয়ে আম বড় হইলে তাহা হাতে ধরা যায় না। বড়র ভিতরেই ছোট থাকে। ছোটকে ধারণ করিবার শক্তি থাকাতেই বড় হইতে পারা যায়। সেহেতু পৃথিবী অপেক্ষা সমুদ্র বড়। সমুদ্র অপেক্ষা গণ্ডূষে পানকারী অগস্ত্য ঋষি বড়। অগস্ত্য নক্ষত্ররূপে আকাশে থাকায় অগস্ত্য অপেক্ষা আকাশ বড। বামনরূপী ভগবান্ এক পদ দ্বারা সেই আকাশ আচ্ছাদন ও অধিকার করায় আকাশ অপেক্ষা ভগবান্ বড়। কিন্তু ভক্ত তাঁহার হৃদয়ে সেই ভগবান্‌কে আবদ্ধ রাখিতে পারায়, বা ভগবান্ নিজ দয়ায় ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তি-ডোরে বাঁধা থাকেন বলিয়া, ভক্তবৎসল ভগবান্ আপন ভক্তকে বড় করিয়া থাকেন। সেহেতু সতীনারী পতিকে ভগবান্ বা দেবতা জ্ঞানে পূজা ও সেবা করিয়া পতিকে আপন হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিলে, তিনি পতির অপেক্ষা বড়ই হন। পতি তখন প্রকৃত বড় হইয়াও পত্নীর ভক্তিতে ভগবানের ন্যায় যেন ছোট বলিয়াই প্রতীয়মান হন। যেখানে প্রকৃত ভক্তিভালবাসার অভাব, সেখানে অভক্ত দাম্ভিক ব্যক্তি যেমন ভগবান্ অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র-তম কীটানুকীট হইতেও নগণ্য, অসতী "স্বাধীনা" স্ত্রীও পতি অপেক্ষা সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন, অতি নগণ্য। সতীত্বই

নারীকে বড় করিয়াছিল ও বড় করিতে পারে। সতীকুলস্ত্রীগণের আসন সেহেতু অতি উচ্চে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কুলস্ত্রীগণ লক্ষ্মী-স্বরূপিণা বলিয়াই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ও তাঁহারা সেইহেতু হিন্দুর দৃষ্টিতে অতীব পবিত্রা ও পূজ্যা।

হিন্দুশাস্ত্রকার মনু বলেন—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—অর্থাৎ "যে কুলে নারীগণ সম্মানিত হন, তথায় দেবতা-গণ প্রসন্ন থাকেন।" এবং "শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলম্"—অর্থাৎ—"যে কুলে স্ত্রীগণ দুঃখে ক্রন্দন করেন, সে কুল তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়," এবং

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যাতথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥"

অর্থাৎ—"যে কুলে স্ত্রী দ্বারা স্বামী সতত সন্তুষ্ট থাকেন ও স্বামীর দ্বারা স্ত্রীও সর্ব্বদা সন্তুষ্টা থাকেন, সে কুলে নিশ্চয়ই নিত্য কল্যাণ বিরাজ করে।" তাই আর্য্যশাস্ত্র বলেন—

"নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুঃ নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকঃ সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে॥"

তাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" ধর্ম্মসংগ্রহে বিশেষ সহায় বলিয়াই হিন্দুস্ত্রীর সহধর্ম্মিণী নাম। তাই তিনি হিন্দুর বিশেষ আদদের ও যথোচিত সম্মানের পাত্রী। মহামায়ার চারিটি স্ত্রী মূর্ত্তি তাই বিশেষ আদরের ও পূজার সামগ্রী। প্রকৃতই হিন্দুর চক্ষুতে—

"প্রত্যক্ষদেবতা মাতা, জায়া ছায়াস্বরূপিণী।
স্বষা মূর্ত্তিমতী প্রীতিঃ, দুহিতা চিত্তপুত্তলিঃ॥"

সেইজন্য হিন্দুগণ কুলস্ত্রীগণকে যে সম্মান ও আদর প্রদর্শন করেন, জগতে আর কোন দেশে তাহা দেখা যায় না। স্ত্রীজাতিকে তাহাদের যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিলেই, বা ঘোড়া, গাড়ি বা উচ্চস্থান হইতে নামাইয়া লইবার সময় হাত বুক বা মাথা পাতিয়া দিলেই, নারীজাতির প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় না। নারীজাতি যেরূপ আচরণ করিলে আপনাদের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হিন্দুগণ জানিতেন, ও সেইরূপ শাস্ত্রব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

কুলস্ত্রীগণ সতীত্ব রক্ষা না করিলে বংশের পবিত্রতা ও সমাজের নিরাপদভাব আদি কিছুই থাকে না, সমাজই থাকে না। তাঁহারা সতী সাধ্বী থাকিলেই জাতি-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম নিষ্কলঙ্ক ও অটুট থাকে, ও তাহার বিপরীত হইলেই সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। সেইজন্য অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে (শ্রীগীতা, প্রথম অধ্যায়, ৩৭-৪৩ শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণকে বিষন্নভাবে বলিয়াছিলেন—

"যদিও জ্ঞানহীন হইয়া ইহারা (কৌরবগণ) কুলক্ষয়কৃত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য জ্ঞান কেন না হইবে? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম বা পাপ অবশিষ্ট সমুদায় কুলকে আচ্ছাদিত বা কলঙ্কিত করে। হে কৃষ্ণ! অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, এবং স্ত্রীগণ দূষিতা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। বর্ণসঙ্কর কুলঘাতকদিগের ও কুলের নরকের নিমিত্তই হয়। ইহাদের পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডজল লোপ পাইয়া

তাঁহারা নিশ্চয়ই পতিত হন। কুলঘ্নদিগের এই সকল বর্ণসঙ্কর-কারক দোষে সনাতন বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম, ও কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। হে জনার্দ্দন! যাহাদের কুল-ধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, সেই সকল মনুষ্যগণের নিয়ত নরক-বাস হয়, ইহা আমরা শুনিয়াছি।”

মনুষ্য-ধর্ম্ম, বর্ণ-ধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে, এবং আশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে একাদশ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কুলস্ত্রীগণের সতীত্বই ঐ সকল সনাতন কুল-ধর্ম্মাদির রক্ষা করে, ও তাঁহাদের দুষ্টতাই বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল বিনষ্ট করিয়া দেয়, এবং পিতৃপুরুষ ও বর্ত্তমান পুরুষ দিগের দুর্গতির ও নরকের কারণ হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় (তৃতীয় অধ্যায়, ২৪ শ্লোকে) বলিয়াছেন—“আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে এই লোক সকল ধর্ম্মলোপ দ্বারা বিনষ্ট হইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব; এইরূপে আমিই এই প্রজাগণকে মলিন করিব।”

নারীজাতির সতীত্বের অভাবে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি সমাজে যে মলিনতা আনয়ন করে ও পাপ বৃদ্ধি করিয়া যে সর্ব্বনাশ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কাম, ক্রোধ ও লোভকে ছয়রিপুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আত্ম-জ্ঞাননাশক ও অতিশয় অনিষ্টকর বলিয়া উহাদিগকে নরকের দ্বার-স্বরূপ জ্ঞানে, ত্যাগ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় (১৬ অধ্যায়, ২১ শ্লোকে) উপদেশ দিয়াছেন।

এই তিন প্রকার নরকের দ্বার বা প্রবেশপথ মধ্যে কামই সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম। এই দুর্নিবার কামরিপু জগতের ও ভারতের যে বর্ণনাতীত ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা সকলেই জানেন।

ক্রোধে পরশুরাম ভারতবর্ষকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ভারতের ক্ষাত্রবল ধ্বংস করত যে মহৎ অপকার সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। ক্ষাত্রতেজের বা রাজসিকতার দুঃসহ অতিশয্য সে তেজের পতনের কারণ হইয়াছিল। পরশুরামের সে তেজঃও তাই শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা খর্ব্বীকৃত হইয়াছিল।

ক্রোধ ও লোভহেতু কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রথম মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছিল, এবং ভারতকে নির্বীর্য্য করিয়া মহৎ অমঙ্গল সাধন করিয়াছিল সত্য,—কিন্তু শান্তনুরাজার কাম-প্রবৃত্তিই—ভীষ্মের ন্যায় অষ্টবসুর এক বসু-পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে, সত্যবতীর প্রতি তাঁহার কাম-লালসাই—কুরুক্ষেত্র মহা-সমরের মূল কারণ, এবং ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের প্রধান হেতু।

কুরুক্ষেত্র সমর অন্তে ভারতবর্ষে ক্ষাত্রতেজঃ লোপপ্রায় হইয়া পড়ে। রাজসূয়যজ্ঞে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করার ছলে ব্রহ্মতেজঃও আপনার ভিতর টানিয়া লইয়া তাহা হ্রাস করিয়া দেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বৈরাজ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন হয়; নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাহাদের সূচক।" ব্রাহ্মণের, ব্রহ্মতেজঃ হ্রাসের সহিত হিন্দুরাজ্যের

মস্তক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ক্ষত্রিয়তেজঃ হ্রাসের সহিত রক্ষক বা বাহুবল নষ্ট হইয়াছিল। ক্রমেই অবনতি আরম্ভ ও হিন্দু রাজ্য লোপ হয়। মুসলমান রাজ্য আরম্ভ হইয়া কত বংশের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সহিত কতই বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল। পরে মোগল রাজ্যের সময় হিন্দুবীর রাজপুত ও মহারাষ্ট্র জাতির সহিত মুসলমানগনের পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণ জন্য উভয় বল ক্ষয় হইয়া যায়। চিতোর আদি রাজপুত রাজগণের ইতিহাসে দেখা যায় যে, রমণী সতীত্বরত্ন প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন ও তাহা রক্ষার জন্য দলে দলে হাস্যমুখে জ্বলন্তচিতায় আত্মবিসর্জ্জন করেন। তাহাতে সতী নারীর সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসে। অপরপক্ষে, অনেক রাজপুতনারী সতীত্বের আদর না করিয়া ঐহিক সুখে মুগ্ধ হইয়া যবনরাজঅন্তঃপুরে সতীত্বরত্ন জলাঞ্জলি দানে অতি কুআদর্শ রাখিতে থাকেন। ক্রমেই হিন্দুসতীত্ব পূর্ব্ব আদর্শ ও গৌরব হারাইয়া হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

কালে বঙ্গে কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন হয়। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ ও দান—এই নয় প্রকার লক্ষণে ভূষিত ব্রাহ্মণগণ কুলীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন; সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, থাক ও মেল আদি সৃষ্ট হয়! সেই ছোট বড়র দ্বন্দ্ব বাধে। বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় ও কৌলিন্যমর্য্যাদায় স্ফীত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ বহুবিবাহ করিতে থাকেন, এবং খাতায় নাম লিখিয়া রাখিয়া পত্নীগণের নাম মুখস্থ করিতে থাকেন। বাল্যবিবাহ প্রথায় বালিকা বা অতি শিশু—নাবালিকার বিবাহ হইত। এক চন্দ্র বহু তারানাথ হইয়া বিচরণ

করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্ত্রীগণের মধ্যে ২।১ জনকে লইয়া সংসার করিতেন ও নিজ আলোকে আলোকিত করিতেন; অবশিষ্ট বহু স্ত্রী স্বামী-বিধুমুখ দেখিতে না পাইয়া চির অমাবস্যায় কাল কাটাইতেন। অনেক কুলীনকন্যা উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বহুসংখ্যায় চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া যাইতেন। জোর-জবরদস্তির চিরকুমারব্রত বা চিরকুমারীব্রত কার্য্যকর হয় না। যৌবন অতি ভীষণ কাল। সৎশিক্ষার উচ্চ আদর্শের প্রভাব হ্রাস হইয়াছিল। যৌবন-জলতরঙ্গ রোধ করিবাব ক্ষমতা না থাকায় অনেকে কাম-স্রোতে ভাসিয়া সমাজের বাহিরে গিয়া পড়িতে লাগিলেন; যাঁহারা ততদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেন না, অথচ চরিত্র রক্ষা করিতে ও ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিতেন না, তাঁহারা সমাজগাত্রে বিষস্ফোটকের ন্যায় থাকিয়া সমাজের রক্ত দূষিত ও কলঙ্কিত করিতেন। পতি না পাইয়া পতি-ভক্তি দেখাইবার—সতীত্ব দেখাইবার অবসর পাইতেন না। অথচ উদ্দাম কাম-প্রবৃত্তির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব বোধ করায় অসতীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সতীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছিল।

ক্রমে তন্ত্রমত প্রচলনে মদ্য ও স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল। নিজস্ত্রীকে লইয়া সে সাধনা না হইয়া অপর স্ত্রীলোক বা পরস্ত্রী লইয়া যখন তাহা আরম্ভ হইল, তখন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম ও ব্যভিচারের স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল। পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। সে ধর্ম্মের বিকার নেড়ানেড়ার দল ও কর্ত্তাভজার দল। ধর্ম্মের নামে ও আবরণে অনেক অনাচার

সাধিত হইতে লাগিল। জাতি হারাইলেই বৈষ্ণব হইতে লাগিল। নারীহৃদয়ের সতীত্ববীজ অধর্ম্মের উত্তাপে ভর্জ্জিত বা ভাজা ভাজা হইয়া তাহার শক্তি লোপ পাইতে লাগিল।

ক্রমে ইংরাজের রাজত্ব আসিল। বাহ্য অনেক উৎপাত উপদ্রব কমিল বটে, কিন্তু পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষ আদির জন্য দ্রব্যাদির মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পাইল ও পরিবার প্রতিপালন করা ভার হওয়ায় বহু বিবাহপ্রথা অপেক্ষাকৃত কমিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমেই বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইল,—বিদেশী আদর্শ দেশ মাতাইল। কোন দেশবিজেত-জাতি যখন দেশজয়ের পরে বিজিত জাতির মন জয় করিতে সমর্থ হয়েন, তখনই সেই দেশবিজয়ের সম্পূর্ণতা লাভ করে। এ দেশে ক্রমে সেই দেশ বিজয় সম্পূর্ণতা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। সাম্য স্বাধীনতার "স্বার্থ" দৃষ্টিতে যৌথহিন্দুপরিবার ভাঙ্গিল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে লাগিলেন,—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্ম ও সৎপ্রবৃত্তি লোপ পাইতে লাগিল। স্বামীর পিতা মাতা প্রভৃতির প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা সতীত্বের যে প্রধান অঙ্গ ছিল, বাল্যবিবাহ রহিত-প্রায় হইয়া ও যুবতী-বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তন হইয়া,—তাহাও রহিত হইতে লাগিল। গুণভেদে পূর্ব্ব জাতিপ্রথার স্থলে অর্থ ভেদে জাতি-প্রথার সমর্থন হইতে লাগিল। সকলেই আচারভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন,—সমাজের শাসন বা চাবুক অন্তর্হিত হইল। ক্রমশঃ অতীতের সতীত্ব-আদর্শ ও স্মৃতি লোপ পাইতে লাগিল, ভবিষ্যতের দৃষ্টিও রহিল না। শুধু বর্ত্তমানের সুখই নরনারীর জীবনের প্রধান মন্ত্র হইয়া সামাজিক বর্ত্তমান ঘোর বিপ্লব আনিয়া ফেলিল। খৃষ্টান পাদরীগণের দূতীগণ হিন্দুর অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিতে লাগিল। হিন্দুবালিকাগণ তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়া পুত্তলিকা ও "কমলা"র লোভে পৌত্তলিকতার নিন্দা করিতে ও হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে শিখিতে লাগিল। তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশীয় ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং হিন্দুধর্ম্ম মাত্র পৌত্তলিকের ধর্ম্ম ও সুতরাং নিতান্ত অসার,—এই জ্ঞান লাভ হইতে লাগিল। ক্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের গতিরোধ হইল, কিন্তু ঘোর সামাজিক বিপ্লব দেশে চলিতে লাগিল। ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের প্রারম্ভে উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সুরা ও খাদ্য হিন্দুর অস্পৃশ্য, তাহাই পান ও ভোজন করাই সুশিক্ষার ও সভ্যতার প্রধান অঙ্গ ইহা ঠিক করিয়া লইয়া ধ্বংসের পথে—ইহকাল-সর্ব্বস্বতার পথে—অবিশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল। সতীত্বও ক্রমে এক কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল ও স্বাধীন প্রেমই উচ্চশিক্ষা ও সভ্যতার চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ দেশে ঘোর দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ গ্লানি এবং অধর্ম্মের—পাপের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইল। এইরূপ অবস্থায় ভগবান্ অবতারদেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় বিধান করেন,—ইহা শাস্ত্রের উক্তি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পুরুষের গুণে স্ত্রী ভাল হয় ও পুরুষের দোষেই স্ত্রী মন্দ হয়; ইহা সত্য। আবার স্ত্রীর গুণে পতি ভাল ও স্ত্রীর দোষে ভাল পতিও মন্দ হয়, ইহাও সত্য। বয়সের আধিক্যে বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়া গুণের হেতু হয়, এ আশা করা অস্বাভাবিক

নহে, ও বয়স অল্প থাকিলে বুদ্ধির অপরিপক্কতা থাকায় গুণের বিকাশ হইবার সময় না আসায় কিঞ্চিৎ দোষ থাকাও অস্বাভাবিক নহে। সেহেতু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর বয়স অধিকতর থাকায় গুণের ভাগ স্বামীর অধিক থাকিবে, ইহা আশা করা যায়; এবং স্ত্রীর বয়সের অল্পতাহেতু তাঁহার কোন দোষ থাকিলে তাহা মার্জ্জনীয় ও সংশোধনযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে। "আমি স্বামী আমার সাত খুন মাফ,— আমি ঘোর পাষণ্ড হই, স্ত্রী আমার শাস্ত্রের বচন মান্য করিয়া আমার সেবা করিতে বাধ্য;—আমি স্ত্রীর প্রভু, আমার স্ত্রীর উপর আমার প্রভুতা—ত্যাগে, তাড়নে, স্বীকারে বা দানে—সর্ব্বতোমুখী;—আমি যাহাই করিনা কেন, স্ত্রী আমার সতী সাধ্বী—সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তীর মধ্যে একজন হইতে বাধ্য"—ইত্যাদি রূপ কথা আজকালকার স্বামী বলিয়া ফেলেন। সে কথা পাগলের প্রলাপ। তুমি সীতা চাও ত রাম হও; তুমি সাবিত্রী চাও ত সত্যবান্ হও,—এরূপ কথা সেরূপ স্বামী স্ত্রীর নিকট বর্ত্তমানকালে শুনিতে পারেন। প্রকৃতই ভালবাসাইবার—দেবতা জ্ঞান করাইয়া সেবাভক্তিপূজা লইবার —গুণ না রাখিয়া বা দেখাইয়া, ভালবাসা বা সেবাভক্তি আদি পাইবার আশা দুরাশা মাত্র। উপরোধ অনুরোধ করিয়া— "মাথা খাও ভালবাস" বলিয়া ভালবাসান যায় না। জোর করিয়া —ভয় দেখাইয়াও ভালবাসান যায় না। পরস্পর হৃদয়ের মিলন বিষয়ে যে যে অন্তরায় থাকে, তাহা দূর না করিলে সে মিলন হয় না, ভালবাসাও হয় না। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিতে না পারিলে শুধু শাস্ত্রের বচন অনুসারে কার্য্য হয় না। কারণ,

কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও মনের স্বাভাবিক গতি এই দুইটির মধ্যে সংঘর্ষ হইলে, মনের স্বাভাবিক গতিই প্রধান্য লাভ করে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রায়ই পরাস্ত হয় ও তাহার কোন কার্য্যই হয় না। পুরুষ নিজ চরিত্র-বলে বলী থাকিলে, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির সম্যক্ পরিচয় দিলে, তিনি সরলভাবে প্রকৃত ভাল বাসিলে, স্ত্রী তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করিতে পারেন বা না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। পুরুষ আত্মসম্মান যথার্থ জানিলে ও তাহা জানিয়া তাহা রক্ষা করিতে জানিলে, সম্মান পাইবার নিশ্চয়ই অধিকারী হন; নতুবা পুরুষ আত্মসম্মানজ্ঞান বা মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশু হইলে, পশুর প্রতি যে ব্যবহার সাধারণতঃ প্রদর্শিত হয়, তাঁহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটা বিচিত্র নহে। পতিগণ এখন স্ত্রীপরায়ণ হইয়াছেন বলিয়া স্ত্রীগণ আর এখন পতিপরায়ণা নহেন। তাঁহারা এখন সর্ব্বান্তঃকরণে পত্নীর সেবায় রত হইয়াছেন বলিয়া স্ত্রীগণ এখন স্বামিসেবা ছাড়িয়াছেন। অনুরাগ সীমা অতিক্রম করিলেই তাহা দোষের হয়। ন্যায্যসীমাবদ্ধ অনুরাগ প্রদর্শন করিলে আত্মসম্মান বজায় থাকে। ইংরাজ স্ত্রীচরিত্র-অভিজ্ঞগণ বলেন—"Follow a woman, she will fly from you; fly from a woman, she will follow you"—অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোকের মন পাইবার জন্য তাহার পিছন পিছন যাইলে সে তোমায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে; কিন্তু তুমি যদি কোন স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া চলিয়া যাও, তবে সে তোমার পিছন ছাড়িবে না।" ইহা অবশ্য বিলাতী নারীনীতি, এবং স্বাধীন প্রেমের উত্তালতরঙ্গের এক ভঙ্গি। কিন্তু স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে

ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষা আছে। স্ত্রীর প্রতি তোমার যথা কর্ত্তব্য করিয়া যাও, কিন্তু অতিরিক্ত ভালবাসা দেখাইতে গিয়া মনুষ্যত্ব হারাইলে তোমাকে আর মানুষ বলিয়া গণ্য করার কারণ থাকিবেনা। সুতরাং আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে জানিলে, তাহা রক্ষা করা দুষ্কর হয় না। তুমি নিজেই যদি মানুষ না থাক বা হও, তবে অপরে—বা তোমাব স্ত্রী—তোমাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার বা মান্য করিবে কেন ? তোমার সে আশা বর্ত্তমান সুকঠিন কালে কি দুরাশামাত্র নহে ? তবে "যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর"—ইহা মর্ম্মান্তিক বেদনা বটে।

সেকালে স্ত্রীধর্ম্মশিক্ষা শাস্ত্রে যাহা দিয়াছিলেন, যথা—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিঃ শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ (মনুঃ ৫।১৫৫) অর্থাৎ

"স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাসাদি নাই, পতিই দেবতা এই জ্ঞানে যিনি পতি-সেবা করেন, তিনি স্বর্গে গমন করেন।" অথবা—

"দুঃশীলো দুর্ভাগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভি র্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥" অর্থাৎ—

"পতি দুঃশীল, মন্দভাগ্য, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা দরিদ্র হউক, স্ত্রী ইহলোকে অপাতকী হইতে ইচ্ছুক থাকিলে তিনি কখনই সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিবেন না।"—তাহা কালের গতিকে ঠিক তেমনভাবে আর খাটিতেছেনা। কোন দেবতাই যখন এখন আর পূজা পান না, কোন যাগযজ্ঞে দেবতাগণের প্রীতিলাভ জন্য যজ্ঞভাগ দেওয়া যখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, নরনারী-দেহ-ভোগরূপ

সতীত্ব।

যজ্ঞই যখন সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ মহাযজ্ঞ বলিয়া গৃহে গৃহে মহাসমারোহে সতত অনুষ্ঠিত হইতেছে,—যে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ কার্য্যকে "বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ" বলে, যাহা দ্বারা সুখসচ্ছন্দতা লাভ ও শ্রীবৃদ্ধি হয়,—সে রহিতপ্রায় হইয়া পিতৃগণ যখন পিণ্ডজলে বঞ্চিত রহিতেছেন,—তখন তুমি কি তুচ্ছ স্বামী যে তোমাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতে যাইবে? তোমার এমন কি পুণ্যকর্ম্ম পূর্ব্বজন্মে করা আছে, যাহা দ্বারা তুমি দেবতার মত পূজিত হইবে? আর দেবতা হইবার গুণ থাকিলেও যখন তুমি দেবতা বলিয়া ধর্ত্তব্য নও, তখন তুমি দেবতা না হইয়া দানব হইয়াও দেবতার আসন ও পূজা পাইবার আশা করিলে লোকে তোমাকে পাগল বলিবে না? প্রকৃত শিবচরিত্র হইলেও এখন গৌরী মিলা যখন ভার, তখন তুমি ধর্ম্মহীন শিক্ষা বা কুশিক্ষা ও কুআদর্শে আপনাকে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িলে, তোমার ভাগ্যে রম্ভা—(উর্ব্বশী,—তিলোওমা—রম্ভার রম্ভা নহে, প্রকৃত কদলি) ভিন্ন, এবং তোমার গলদেশে রজ্জু লাগাইয়া তোমাকে নাচান ভিন্ন, তোমার ভাগ্যে আর কি লাভ হইবে? "দোষ কারু নয় গো মা। আাম স্বখাদসলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥"—এই গান গাহা ভিন্ন তোমার অন্য উপায় নাই। এ তোমার "স্বখাদ সলিল"; ডুবিয়া মরার জন্যই ইহা তোমার দ্বারা কৃত। এখন ডুবিয়া মরিতে অনিচ্ছা কেন? প্রাচীন হিন্দুসতীনারীর অমৃত-সরোবর নানাভাবে ভরাট করিয়া দিয়া বর্ত্তমান যে আদর্শে এই গরল-কূপ খনন করিয়াছ,—তাহার ফল ভোগ অনিবার্য্য।

"রমণী বচনে সুধা, সে সুধা নয়, সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছা সুখে পান করিয়ে এখন বিষের জ্বালায় ছটফটি ॥"

এই এক বাটি তোমারই গরল কূপ হইতে তোলা। এই এক বাটিতেই যদি তোমার ছট্‌ফটানি ধরিয়া থাকে, তবে একবার মনে কর সেই কূপের জলরাশি এ সংসারে সমাজের কত অহিতকর, কত সর্ব্বনাশের কারণ। এখনই এই কূপ ভরাট করিয়া দিয়া সেই পূর্ব্ব আদর্শের অমিয়-সরোবরের সন্ধান করা কি উচিত নহে?

দাম্পত্যকলহকে বহু আড়ম্বরের পর অল্প ক্রিগ্না করে বলে। দাম্পত্য-কলহ—এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সৃষ্টি। ইহা নারীচরিত্রে মহাকলঙ্ক, ও ইহা সতীত্ব প্রমাণ করেনা। এখনও এমন ভাগ্যবান্ পতি ও ভাগ্যবতী পত্নী আছেন, যাঁহাদের সারাজীবনে পরস্পর কলহ দূরে থাকুক, কথান্তর বা ভাবান্তর পর্য্যন্ত হয় নাই। সে ছবি কি স্বর্গের ছবি নহে? কিন্তু সেরূপ দম্পতীর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। কলহ ও মনোবিবাদই এখন দাম্পত্যজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া পড়িয়াছে। এমনও সুখের জীবন দেখা যায় যে, স্বামীবীর লাঠী ধরিলেন, ত স্ত্রী বীররমণীও তাঁহার অভ্যস্ত ব্রহ্মাস্ত্র সম্মার্জ্জনী ধরিলেন; উভয় অস্ত্রের ধ্বনিতে ও কণ্ঠধ্বনিতে পাড়া কম্পিত হইল। পতিপ্রবর পরাস্ত হইয়া অনাহারে "আফিসে" বা কর্ম্মস্থলে গেলেন। সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিয়া আবার "ভাব" হইল। মন না মিলিলেও উভয় দেহ প্রয়োজনে আবার মিলিল। মন প্রাণের মিলন নাই, ধর্ম্মের কোন ভাব বা সম্বন্ধ নাই—অথচ

দেহের মিলন—ইহাই ত বেশ্যাবৃত্তি। তাহার ফলে কি প্রকৃতই বহু জারজ সন্তানের সৃষ্টি হয় না? পূর্ব্বোচ্চারিত মাত্র বিবাহ-মন্ত্র কি তাহাদের জারজত্ব দোষ প্রক্ষালনে সমর্থ হইতে পারে?

চাণক্যশ্লোকে আছে—"যাহার ভার্য্যা কুরূপা, পাপাচারিণী কলহপ্রিয়া ও উত্তরদায়িনী, সেই ব্যক্তি জরাগ্রস্ত; প্রকৃত জরা জরা নহে।" "যাহার গৃহে স্নেহশীলা মাতা নাই অথচ অপ্রিয়-বাদিনী স্ত্রী আছে, তাহার বনবাসই বিধেয়; অথবা তাহার গৃহই বন।" সাবেক বানপ্রস্থধর্ম্ম রহিত হইলেও, এখন এই সংসারে দেখা যায় যে, অনেক হিন্দুপতি সেই জন্য জরাগ্রস্ত ও বনবাসী বা বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী।

এক্ষণে ধনের আদরই বহুল। ধন থাকিলে ধর্ম্মকর্ম্ম আদি পালন ও লোকমত গ্রাহ্য না করিয়া সহজেই চলা যায়। সেই হেতু অনেক স্থলে দেখা যায় যে, ধনী গৃহের ভোগবিলাসিনীগণ সতীত্বের আদর—পতিসেবা আদি—বিশেষ কমাইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ যে বংশ ভূঁইফোড়—পাতাল ফোঁড়ের ন্যায় হঠাৎ ধনী ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রায়ই বিশেষ ভয়ের স্থান। কারণ তাঁহাদের সুসভ্যতার জ্বর হইতে না হইতে একেবারে ১০৫° ডিগ্রিতে উঠিয়া পড়ে। ধনী-বিলাসিনীগণ পতিভক্তি পতি-সেবা আদি দূরে যাউক, স্বামী ও সন্তানদিগের আহারাদি দিবার ভারও দাসদাসীর হস্তে দিয়া নিশিদিন রাজকার্য্যেই ব্যাপৃতা থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও স্বামীর ভাগ্যে গ্রীষ্মের সময় স্ত্রীর হস্তে হাত-পাখার হাওয়া খাওয়া ও তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ সেবা পাইবার সুযোগ ছিল; কিন্তু এক্ষণে বিজলিপাখার কল্যাণে সে সেবার দায়

হইতেও রমণীগণ রক্ষা পাইয়াছেন। এখন যেমন প্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ-তনয়কে বিবাহস্থলে কি করিয়া আচমন করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া না দিলে একেবারে অনভ্যাস বশতঃ তিনি তাহা করিতে পারেন না, (যদিও কৌলিন্য মর্য্যাদার জন্য হতভাগ্য কন্যাপক্ষীয়ের নিকট কয়েক সহস্র মুদ্রা বিবাহের পণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে অণুমাত্র লজ্জা বা দ্বিধা বোধ নাই),—সেইরূপ এখন কোন হিন্দুস্ত্রীকে কি করিয়া স্বামীকে প্রণাম করিতে হয়, তাহা না দেখাইয়া দিলে বোধ হয় তাহা তিনি দেখাইতে পারেন না।

হিন্দুনারীর ভক্তি ও ভালবাসার শেষ নাই—ইহাই সর্ব্ববিদিত ছিল। এখন যেন তাহার শেষ আছে—বা শেষ হইয়াছে, বলিয়াই দেখা যাইতেছে।

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

বলিয়া পূর্ব্বের যে গুরুভক্তির আদর্শ ধরা হইত, এখন এ বাজারে তাহা চলে না। এখন প্রকৃতপক্ষে গুরুবংশের বংশধর অনেক গুরু ঐরূপ "শুঁড়িবাড়ি যাওয়া" ও তাহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অপর গুণে গুণী দেখা যায়; এবং তাঁহারাও অপরের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়া গুরুগিরির স্থলে অনেক লঘুগিরি করিতে পারেন, কিন্তু তাহার ফল যে বিষময় তাহা বলাই বাহুল্য। নারীহৃদয়ের পবিত্রতা-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আসল ভক্তির অভাবে কতই নকল ভক্তি বা কপটতা দেখা গিয়াছে।

সত্যই সতীত্ব, এবং মিথ্যাই অসতীত্ব। সত্যকথা—সত্য

ব্যবহার অন্তর্হিত হইয়া মিথ্যা কথা ও মিথ্যা ব্যবহার প্রচলিত হইলেই সতীত্বের স্থান অসতীত্বে পূর্ণ করে। সত্যের আদর ও মিথ্যার অনাদর যতদিন ছিল, ততদিন সতীত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। কালবেশে এখন সত্যের অনাদর ও মিথ্যার বিশেষ আদর দেখা গিয়াছে। তাই তুলসীদাস দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"সাচ্চা কহে ত মারে লাট্টা। ঝুঠা জগৎ ভুলাই॥"—

অর্থাৎ—"সত্যকথা এখন বলিলেই তোমাকে লাঠী মারিবে; মিথ্যা কথা জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে।" কলিকালের ইহাই ধর্ম্ম দেখা যায়। সুতরাং মিথ্যা কথা ও মিথ্যা ব্যবহার এখন জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। সে হেতু যুগধর্ম্ম অনুসারে নারীগণ এখন অনেকে মিথ্যার আশ্রয়ে আসিয়া সত্যপথ—সৎপথ হইতে তফাৎ হইতেছেন।

হিন্দু-নারীসমাজে এক্ষণে সতীত্বের আদর কিরূপ, তাহার আভাস পাইতে গেলে, মাত্র তিনটি স্থানের জ্ঞানলাভ করিলেই যথেষ্ট হয়। হাঁড়ির সমস্ত ভাত কিরূপ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কয়েকটি মাত্র টিপিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

১। আধুনিক বিবাহ-বাসর।

২। আধুনিক গঙ্গাস্নান।

৩। আধুনিক তীর্থস্থান।

১। আধুনিক বিবাহ-বাসর—উহা বলিলে আধুনিক ধনী গৃহের বিবাহ-বাসর বুঝিতে হইবে। সে বাসরে স্ত্রী-স্বাধীনতার মধ্যে আনন্দ উৎসব দেখিতে হইবে। বেশভূষার পারিপাট্য ও আতিশয্যের মধ্যে হাস্য কৌতুক দেখিতে হইবে। ঠাট্টাতামাসা

কিরূপ নিম্নদিকে—অশ্লীলতার দিকে প্রকাশ পায়,—তাহা দেখিতে হইবে, ও দেখিতে জানিলে তথা হইতে অনেক দেখা শুনা হইতে পারিবে। কোন সুসভ্যা "ঠাট্টার সম্পর্কের" যুবতী, জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কখনও বেশ্যা বাড়ি গিয়াছ?" প্রশ্ন শুনিয়া সারাদিন অনাহারে উপদ্রবে ক্লিষ্ট জামাতা ক্রুদ্ধ অথচ সংযতভাবে উত্তর দিলেন—"ইতিপূর্ব্বে যাই নাই, এই আসিয়াছি।"

তৎপরে বাজারের বেশ্যা গায়িকাকে সে আসরে সকলের মধ্যে একাসনে বসাইয়া গান বাজনা চলিতে থাকে। গানগুলি যে কালীকীর্ত্তন বা হরিসঙ্কীর্ত্তন নহে ও বিশেষ কুরুচিসম্পন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। যে বেশ্যার সংস্পর্শ মহাপাপ, তাহার সঙ্গ নিঃসঙ্কোচে হইতে থাকে। সে কুদৃষ্টান্ত—সে কুআদর্শ—সতীনারীসমাজে যে কত অমঙ্গলকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত অধঃপতিতা হইলে তবে এ ব্যাপার সব যে ঘটিতে পারে, তাহা সমাজই বিবেচনা করিবেন।

২। আধুনিক গঙ্গাস্নান—ধর্ম্মের আবরণে কৃত অধর্ম্ম মহা অধর্ম্ম। কলিকাতা মহানগরীর গঙ্গার স্নানের ঘাটগুলি যদি কেহ চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া একদিন ভালরূপে দেখেন, তাহা হইলে হিন্দুনারীর বর্ত্তমান সতীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। পাপহারিণীর তটে কতই যে পাপের অবতারণা হয়, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। যে লজ্জা ভদ্রবংশীয়া নারীর পরিচয় প্রথমেই প্রদান করে, ইচ্ছা করিয়া নারীগণ,—বিশেষতঃ যুবতীগণ,—সে লজ্জার মস্তকে কিরূপে পদাঘাত করেন, তাহা

তথায় দেখা যায়। বাজারের বেশ্যারা—যাহাদের নির্লজ্জতার অবতার বলিয়া অপবাদ আছে—তথায় যে লজ্জাশীলতার পরিচয় দেয়, তথাকথিত ভদ্রবংশীয়ারা তাহা দেন না। তাঁহারা বেশ্যা-দিগকেও নির্লজ্জতায় পরাস্ত করেন। বেশ্যারা বস্ত্রত্যাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবৃত স্থানে বস্ত্রত্যাগ জন্য যায়, কিন্তু তাঁহারা তথায় যান না। তাঁহাদের সেই বস্ত্রত্যাগের ভঙ্গি যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন, ইচ্ছা করিয়া কতদূর নির্লজ্জ-তার পরিচয় দেওয়া হয়, বাধ্য হইয়া নহে। যাঁহারা লজ্জাশীলতার আবরণে "ভোর রাত্রিযোগে" গঙ্গাস্নানে বাহির হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যাহা হউক, বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভগীরথ আবার যেখানকার গঙ্গা সেখানে,—সমুদ্র-মন্থনের পর দেবতাগণ মন্থনদণ্ড মন্দরপর্ব্বতকে যেমন রাখিয়া আসিয়াছেন সেইরূপ—রাখিয়া আসুন, না হয় গঙ্গাস্নানের এই অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকুক।

৩। আধুনিক তীর্থস্থান—ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনাতেই তীর্থ মাহাত্ম্য। এখন যেন বোধ হয় অধর্ম্মভাবের উদ্দীপনাই তীর্থ-স্থানে যাইবার ফল ও উদ্দেশ্য। যে ভাবে পরপুরুষের "ঘেঁস" লইবার অভ্যাস তথায় হয়, তাহাতে মনে হয় যত শীঘ্র তাহা রহিত হয়, ততই মঙ্গল। ঘরে থাকিয়া কোন পুণ্যকর্ম্ম না করাও বোধ হয় ভাল, কিন্তু ঘরের বাহিরে পুণ্য করিতে গিয়া অপুণ্য সঞ্চয় কখনই ভাল নহে। তীর্থবিশেষে কিভাবে "সেবা দাসীর" সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও বিক্রয় অবাধে চলিতেছে,—সময়ান্তে তাহাদের দ্বারা

কি পাপস্রোতের বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা তৎসম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন।

পাশ্চাত্যদেশে নারীগণের রূপের বাহার বা জাহির হয়, ও দেশের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রধানা বা প্রথমা বা অদ্বিতীয়া সুন্দরী, কেবা দ্বিতীয়া সুন্দরী—ইত্যাদি প্রচারিতা হন। এদেশে যদিও এখনও ততদূর হয় নাই, কিন্তু রূপের প্রকাশ বা সুখ্যাতি হইলে অনেকেই আনন্দিতা হন, এবং রূপ থাকিলে তাহা অপ্রকাশিত না রাখিয়া যতটা প্রকাশ বা প্রচার হয়, তাহারও চেষ্টা থাকে। হিন্দুসতী-নারীর রূপ বা যাহা কিছু, সমস্তই নিজপতির তুষ্টি ও ভোগের জন্য। তাহার ব্যতিক্রম দেখিলেই বর্ত্তমানে সতীত্বের আদর্শ কত নিম্নে নামিয়াছে, তাহা বুঝা যায়।

শুনা যায় বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট আছেন; সুতরাং তাহার রাজা, মন্ত্রী ও বাহন,—তাহার জমিদার, পত্তনিদার, গাতিদার ও কোর্ফা প্রজা,—তাহার রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, খাঁ সাহেব ইত্যাদি, এবং আমলা, পেয়াদা ও বরকন্দাজ, এমনকি "ধামাধরা" প্রভৃতিও আছেন, কিন্তু তাহার চৌকিদার, বা সুসভ্য রাজধানী সঙ্গতভাবে বলিতে হইলে—পাহারাওয়ালা বা পুলিস—যেন দেখা যায় না। সেহেতু চুরি ডাকাইতির কিছুই দমন বা কিনারা হয় না; অশ্লীলতা—নির্ল্লজ্জতা—নিবারণেরও বিশেষ কিছু চেষ্টা দেখা যায় না। যাহাহউক বঙ্গসাহিত্যের আর যাহাই থাকুক, তাহার যেন "বাপ মা" নাই; থাকিলে এত বদখেয়ালী বা বদছেলের সংসর্গ বোধ হয় এরূপভাবে হইতে পারিত না;—অগ্লীল সাহিত্যের—কুগ্রন্থের তাহা হইলে দমন করা হইত।

সতীত্ব।

কুক্ষণে এক একটি কথা লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ দ্বারা লিখিত হয়, ও তাহা পঠিত হইয়া তাহার বিষময় ফল সমাজে ভোগ হয়। যে দিন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে বাহির হইয়াছিল যে—"পাশ্চাত্য জাতি চিরকাল ইহকালকে চাহিয়াছে ও তাহারা তাহা পাইয়াছে; এবং আমরা চিরকাল পরকালকে চাহিয়াছি, কিন্তু কিছুই পাই নাই,"—সে দিন যে এদেশের বিশেষ দুর্দ্দিন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এদেশ কখনও ইহকাল চাহে নাই, চিরকাল কেবল পরকালই চাহিযাছে ও কিছুই পায় নাই,—এ উক্তি সত্য হইতে বহুদূরে। ঐহিক বা জাগতিক উন্নতি হিন্দুগণ যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য, শিল্প আদিতেই প্রকাশিত আছে। নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ ব্যতীত, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির ঐহিক সুখ ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। এখন "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।" হিন্দুর অশেষ "কর্ম্মকাণ্ড" জাগতিক উন্নতিলাভের সোপান স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত ও ইহকালের উন্নতির জন্য অনুষ্ঠিত হইত ও তাহার ফল লাভও হইত, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? পরকালের সম্বন্ধে হিন্দুগণ যাহা পাইয়াছিলেন, জগতে কোনও দেশ তাহা পায় নাই, ও ঐ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান সমগ্র জগৎ হিন্দুশাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিতেছে দেখা যায়।

পরকাল যে কিছুই নয়,—পরকালের ভয় যে কিছুই নয়,—ইহকালই যে সব,—এই শিক্ষায় প্রাচীন সতীত্ব-আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ প্রভাব এদেশে অনুভূত হয়, সুতরাং তাঁহার ঐ লেখা এদেশে ইহকাল-সর্ব্বস্বতাকে

অনেক বাড়াইয়া দিয়া হিন্দুনারীসমাজকে পূর্ব্বগৌরব ভুলাইতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য পরমহংসদেব তাঁহাকে "মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি ?" এই প্রশ্ন করিয়া, "আহার নিদ্রা ও মৈথুন" এই উত্তর তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া—তাঁহাব পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে "মূলা খাইলে মূলারই ঢেঁকুর উঠে" বলিয়া তাঁহার ভিতর ইহকাল-সর্ব্বস্বতার পরিচয়ে তাঁহাকে তাঁহার উচিত আসনই দিয়া গিয়াছেন। যে নারী-সমাজ ইহকালকে যত আদর ও পরকালকে অনাদর করে, সে সমাজ ততই পূর্ব্বগৌরব ভুলিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট আদর্শ হিন্দু-পত্নী—সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর-চিত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে ভ্রমর-চরিত্রই সংসারে সাধারণ। সূর্য্যমুখী-চরিত্র যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। ভ্রমরের পতি-ভক্তি যেন কৃপণের ধন,—থাকা না থাকা দুইই সমান। তাই ভ্রমরের আদর্শে কত সংসার,—কত সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য ছারখার হইয়া যাইতেছে,—কত ভ্রমর নিজে নষ্ট হইতেছে,—কত গোবিন্দলাল, কত গ্রামের কত বংশ,—কত কৃষ্ণকান্ত রায়—নষ্ট হইয়া যাইতেছে। শান্ত, প্রিয়ভাষিণী, প্রিয়কারিণী, সূর্য্যমুখীর অভাব কত সংসারে পরিলক্ষিত হইতেছে।

যাঁহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও শিক্ষিতা বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহকালসর্ব্বস্বতার বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়। ভদ্রসমাজ-ভুক্ত ও উন্নতি-অভিমানযুক্ত নারীগণের সহিত অশিক্ষিত তথাকথিত অভদ্রসমাজের নারীগণের সতীত্ব-পরীক্ষা হইলে কে জয়লাভ করে তাহা বলা সহজ নয়। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার রাণাঘাট গ্রামে একবার

ঐরূপ পরীক্ষা একটি সত্যঘটনামূলে হইয়াছিল। তখন ৺শ্রীগোপাল পালচৌধুরী মহাশয় তথাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নায়েবের কোপে পড়িয়া উপদ্রুত হন ও তাহার প্রতীকারের চেষ্টায় উক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আইসেন। তখন বৈশাখ মাস অতীত,—কয়েক মাস অনাবৃষ্টিতে সব পুড়িয়া ছারখার হইতেছে। শস্যাদি ফসল তখন পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই, ও সেজন্য খুবই চিন্তার কারণ হইয়াছিল। জমিদার মহাশয় উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত বৈষয়িক কথাবার্ত্তার পর পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগণের সহিত আধুনিক ব্রাহ্মণগণের তুলনা করিয়া তাঁহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন ও সেইরূপ অনাবৃষ্টিতে তাঁহারা কোন প্রতিকার করেন না বা করিতে পারেন না ইত্যাদি বলেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলেন যে, বৃষ্টিপাত করান অতি তুচ্ছ ব্যাপার ও তাহা অতি সহজেই হইতে পারে। সামান্য পূজা ও সূর্য্য-অর্ঘ্য দিলেই অচিরে বৃষ্টি হইবে বলেন। জমিদার মহাশয় তাঁহার শক্তির পরিচয় লইবার জন্য ঐরূপ পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন, ও ঐ বৃষ্টিপাত দেখিবার জন্য অনেক ভদ্রলোক তাঁহার বাটীতে ঐ পূজাস্থলে আগমন করেন। ঐ ব্রাহ্মণ যথাবিহিত পূজাদির পর বলেন যে, অল্প একটু জমিতে তিনবার লাঙ্গল চষিতে হইবে ও কোন সতী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ঐ লাঙ্গল চালনা করিলেই শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। তাহা শুনিয়া অনেকেই ব্রাহ্মণের প্রতারণা অনুমান করেন, এবং কোন নারীই নিজ পুত্রকে ঐ কার্য্যে লাগাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাহা দেখিয়া "হ'রের মা"

নামে এক গোয়ালার বিধবা—অত্যন্ত কলহপ্রিয় বলিয়া যাহার খুব খ্যাতি ছিল—আপন পুত্র হ'রেকে ডাকিয়া ঐ লাঙ্গল ধরিয়া ব্রাহ্মণের "বুজরুকি" ভাঙ্গিতে বলে। হ'রে ঐ লাঙ্গল প্রথমবার চালাইবার পরই আকাশে খুব মেঘ দেখা দেয় ও ঝড় আরম্ভ হয়, এবং তৃতীয় বা শেষ বারের লাঙ্গল চালাইবার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হয়। অনেক প্রত্যক্ষ-দর্শী এখনও ইহার প্রমাণ দিতে পারেন বলিয়া মনে হয়। মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সতী নারীর সন্তান এ প্রকার কার্য্যের সাহায্য করিতে পারিত। এক্ষণে যদ্যপি ঐরূপ কার্য্যে ঐরূপ সন্তানের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহাকে আহ্বান করা যায়, তবে কয়জন ভদ্রনারী নিজ নিজ সন্তানকে ঐ কার্য্যে পাঠাইতে সাহস করেন ?

প্রায় ঐ সময়ে উক্ত রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আন্সুলিয়া গ্রামে কবিরাজ ৺লক্ষণ চন্দ্র সেন কবিভূষণ সুচিকিৎসায় বিশেষ প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রবচন—"প্রশস্তদেশসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতঃ"—অর্থাৎ "ভাল স্থানে উৎপন্ন ও ভালদিনে তোলা"—অনুসারে ঐরূপভাবে গাছগাছড়া সংগ্রহ করার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং

"ভিষক্ দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে॥"

অর্থাৎ—পীড়া আরোগ্য করার জন্য রোগী ও তাহার পরিচর্য্যা-কারক, দ্রব্যাদি বা ঔষধাদি ও চিকিৎসক—এই চারি বিষয়ের ও ব্যক্তির গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। ঔষধ বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত

করার জন্য তিনি অনেক সময় যে সকল ঔষধ ঢেঁকিতে কুটিয়া লইতে হইত, তাহাতে পাড় দিবার জন্য সতী স্ত্রীলোকের প্রয়োজন অনুভব করিতেন, ও বিশ্বাস করিতেন যে, সতী লক্ষ্মী নারীর সাহায্যে প্রস্তুত ঔষধ অতি পবিত্র ও অমোঘ শক্তিসম্পন্ন হইত; একদা তিনি কোনও জমিদার মহাশয় কঠিন পীড়িত হওয়ায় তাঁহার চিকিৎসার জন্য গমন করেন। পরে তথায় ঔষধ কুটাইবার জন্য ঢেঁকিতে পাড় দিবার সময় একজন সতী স্ত্রীলোকের সন্ধান করেন। অনেক স্ত্রীলোক ঐ পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পরে জমিদার মহাশয়ের সাধ্বী পত্নী উহা অবগত হইয়া তিনি নিজে ঐ পাড় দিবার কার্য্য করিলে চলে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। কবিরাজ মহাশয় তাহা আনন্দের কথা ও তাহাতে কোন বাধা নাই বলায় জমিদার-পত্নী স্বয়ং ঢেঁকিশালায় গিয়া পাড় দিয়া ঔষধ প্রস্তুতের সাহায্য করেন। সে ঔষধ সেবনে জমিদার মহাশয় সে কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করেন। এখন যদি কোন কবিরাজ মহাশয় ঔষধের বিশেষ বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য ঐরূপ সতী নারীর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে কয়জন নারী আগ্রহ সহকারে ঐরূপ সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়েন? মূর্খেরা অনেক কার্য্যে ছুটিয়া যায় বটে, কিন্তু এ কার্য্যের আহ্বানে অনেক মূর্খ বোধ হয় জ্ঞানী হইয়া পড়েন, এবং অনেক বিদ্যাধরীও বোধ হয় এ ক্ষেত্রে পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন!

সেকালে হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন, দশবিধসংস্কারযুক্ত জীবন-যাপন-পদ্ধতি, ধর্ম্মজ্ঞান, শিক্ষা দীক্ষা—সমস্তই মানুষকে পশুত্বের অবসর না দিয়া দেবতার ন্যায় পবিত্র করিত। সেহেতু তখনকার

স্ত্রী বিবাহের পর দেবতা স্বামীই প্রাপ্ত হইতেন, এবং সেরূপ স্বামীকে দেবতাজ্ঞান করিতে বিশেষ কোন আয়াস পাইতে হইত না। স্বভাবতঃই দেবতুল্য স্বামীকে নিজ স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ ও পবিত্র হৃদয়-আসনে দেবতা বলিয়াই বসাইতে পারিতেন, এবং স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে সেবাভক্তি ও পূজা করিতে কোন বাধা থাকিত না। তাহাতে প্রমাণ হয় যে, প্রকৃত হিন্দুত্বেই প্রকৃত সতীত্ব, এবং প্রকৃত সতীত্বেই প্রকৃত হিন্দুত্ব। একটি থাকিলেই অপরটিকে থাকিতেই হইবে।

সত্বগুণ প্রধান হইলে,—সাত্বিক জীবনলাভ হইলেই, আহারে বিহারে সত্বগুণী হইলেই, হিন্দুত্ব সুরক্ষিত হইলেই,—সতীত্ব-রক্ষা সহজ হয়। সেহেতু সাত্বিকতাই সতীত্ব সৃষ্টি ও রক্ষা করিতে পারে। আহারবিহারের দোষে, সত্বগুণ নষ্ট হইয়া তমোগুণী হইলে জঘন্যগুণবৃত্তি বৃদ্ধি পায় ও তাহাতে সতীত্বের হানি হয়।

এখন সাবেক হিন্দুত্ব বিরল হইতেছে। তাহা ম্লেচ্ছাচার বা কদাচার, অসংযম ও বিলাসিতা ব্যভিচারের সংযোগে সাবেক পবিত্রতা হারাইতেছে, এবং তাহার ফলে পূর্ব্ব সতীত্বের উজ্জ্বল আদর্শ মাত্রআদর্শরূপেই রহিয়া যাইতেছে, ও তাহা দেখিয়া কেহ নিজ জীবন গঠন করিতে অভিলাষ করিতেছেন না। কথায় বলে—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।" প্রকৃত হিন্দুত্ব বা প্রকৃত সতীত্বরূপ হীরার ধার তাই এক্ষণকার নানা ব্যভিচার, ম্লেচ্ছাচার ও অহিন্দুত্বের ভেড়ার শৃঙ্গে পড়িয়া ভগ্ন হইতেছে। হীরার ধারও, এখন, তাই এত ভোঁতা হইয়া যাইতেছে। তাহার ফলে, দেবত্বলাভ দূরে থাকুক, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভই হইতেছে না;

পশুত্বই রহিয়া যাইতেছে। হিন্দুর সে যজ্ঞ নাই,—সে তপস্যা নাই,—দেবগণের সে যজ্ঞভাগ নাই,—দেবতার কৃপাও নাই, দেবত্বও নাই। দেবতার কৃপাই দেবত্বলাভের উপায়। হিন্দু-জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, দেবত্বলাভের উপায়ও তাই আর অবলম্বিত হয় না। এখন কামানলেই সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করা হইতেছে। এখন কামানল প্রলয়কালের সম্বর্ত্তক অগ্নির মূর্ত্তিধারণ করিয়া সব যেন ভস্মীভূত করিতেছে। এখন আর অগ্নিদেবের ঘৃতাহুতি নাই। ঘৃতের ন্যায় বস্তু আগুনে পুড়াইয়া নষ্ট করা এখন পাগলের কার্য্য বলিয়াই ধরা হয়। কামিনী-রূপ-শিখায় ঘৃতাপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান্ জীবনী-শক্তির সর্ব্বদা আহুতি প্রদান কিন্তু পাগলের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। মানুষ এখন অতিশয় চতুর হইয়া পড়িয়াছে, ও সেজন্য অতি চতুর বায়সের ন্যায় কুভক্ষ্য ভোজনেই তৃপ্তিলাভ করিতেছে। দেবগণ-প্রদত্ত দ্রব্য তাঁহাদিগকে দান না করিয়া আপনার জন্য ভোজন ও গ্রহণ করিয়া স্তেন বা চোর হইতেছে, ও যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃতে বিরক্তি দেখাইতেছে। উহার ফল, পশুত্বের উপরে উঠিবার শক্তিহীনতা।

প্রকৃত হিন্দুত্বই প্রকৃত সতীত্ব ও প্রকৃত সতীত্বই প্রকৃত হিন্দুত্ব। হিন্দুত্বের শিক্ষা—"অহম্ আত্মা"—আমি সেই আত্মা। আমি দেহ নহি; আমি বা আত্মা দেহকে ছিন্নবস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র বা দেহ ধারণ করেন। আত্মাকেই ভাল বাসিবার শিক্ষা,—দেহকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিক্ষা। দেহসুখের জন্য আত্মার দুর্গতিবিধান মহাপাপ। পবিত্র আত্মার আধার

বলিয়া দেহকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখার ব্যবস্থা। কারণ অপবিত্র আধারে পবিত্র দ্রব্য থাকিতে পারে না। অপবিত্র আসনে কি পবিত্র নারায়ণ শিলা রাখা যায়? সেইজন্য আত্মাকে কোনরূপ কলুষিত করিতে না দিবার জন্যই দেহকেও কোনরূপে কলুষিত করিতে দেওয়া হয় না। দেহ কলুষিত হইলে প্রিয়তম আত্মাও কলুষিত হইতে পারেন, সেজন্য দেহকে সর্ব্বদা অতি পবিত্র রাখার ব্যবস্থা। সতীত্বই হিন্দুত্বের পরিণতি হেতু হিন্দুধর্ম্মের উক্ত শিক্ষা হিন্দু-নারীগণের মজ্জাগত হইয়া থাকিত। সেজন্য তাঁহারা দেহকে কলুষিত হইবার সম্ভাবনা দেখিলে পবিত্রতার বেদির সম্মুখে আত্মোৎসর্গ দ্বারা দেহনাশ করিতেন। তাঁহারা দেহকে কিছুতেই অপবিত্র হইতে দিতেন না। এই বঙ্গদেশে এবং বীরস্থান—সতীত্বের স্থান—রাজস্থানে—কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেও শত্রুহস্তে পড়িলে সতীত্বনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া দেহকে তুচ্ছবোধে—কত শত সতী—হিন্দু রাজপুতললনা—দলে দলে জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সতীত্ব তুচ্ছ দেহ বা প্রাণ অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট কত অধিক আদরের বস্তু ছিল। হিন্দুত্ব তাঁহাদিগকে ঐরূপ সতীত্বের শিক্ষা দিয়াছিল। এই শরীর আত্মা-পক্ষীর "হাড়মাসের খাঁচা" মাত্র,—ইহা তাঁহারা বুঝিতেন। তাই অপবিত্র হইবার পূর্ব্বেই—সতীত্বরত্ন হারাইবার পূর্ব্বেই সেই অসার খাঁচা পুড়াইয়া সাররত্ন—সতীত্বরত্নসহ সার আত্মা অমরধামে চলিয়া যাইত। তাঁহারা দেহ-কোশ হইতে আত্মা-অসি নিষ্কাশিত করিয়া লইয়া এ পাপসংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন। শূন্য কোশ অনলে ভস্মীভূত হইয়া যাইত। যৌবন, শারীরিক অতুল

সৌন্দর্য্য, ধনরত্ন, রাজত্বসুখ—সবই তুচ্ছ বোধ হইত। সেই উচ্চ ও মহৎ আদর্শ আজ কোথায়? দেহকে এত প্রিয় ও আত্মাকে এত অজ্ঞানাচ্ছন্ন কিসে করিল? ইহার একমাত্র উত্তর—অহিন্দুত্ব অর্থাৎ অসতীত্ব। হিন্দুনারীর জন্মগত অধিকার দুর্লভ সতীত্ব-ধন পোড়াপেটের দায়ে—এক মুঠা ভাতের জন্য বিসর্জ্জন কি কম অধঃপতন? সে ভাতের অভাবে দেহ নষ্ট করার—প্রাণত্যাগ করার ইচ্ছা না হইয়া, সতীত্ব নষ্ট করার প্রবৃত্তি কি কম অধঃপতন? অভাবে স্বভাব নষ্ট? পূর্ব্ব সতীত্বভাবের অভাবই এখনকার কুস্বভাব। সেইজন্যই উহা কথার ছলনা মাত্র। নতুবা পূর্ব্ব স্বভাব থাকিলে, এমন কোন অভাব অনুভূত হইতে পারে না, যাহাতে সে স্বভাব নষ্ট হইতে বা করিতে পারে। সতীত্বরক্ষার জন্য মরিতে ভয়? দেহরক্ষার এত যত্ন? এ দেহ ত থাকিবে না,—শৃগাল কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইবে কিম্বা দেহের চিতা-ভস্ম পবনে একদিন ত উড়াইবেই। তবে এই এত অনিত্য দেহে এত নিত্য বস্তু-জ্ঞান কেন? হিন্দুত্বের—সতীত্বের ত এ শিক্ষা নহে! সতীত্ব ধন হারাইয়া কাঙ্গালিনীর ঘৃণিত জীবনযাপন কি মরণের অধিক নহে? মরণ ত একবার, কিন্তু সেই ঘৃণিত অসতী-জীবনে যে পদে পদে মরণ। একবার মরণে ভয় হয়, কিন্তু পদে পদে মরণে ভয় হয় না? সতীত্বের পূর্ব্ব আদর্শ ভুল হইয়া এখন বেশ্যার বাহ্য সুখময় জীবনের আদর্শে বোধ হয় বেশ্যাত্ব গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু বেশ্যার জীবন কি সুখময়? ঐ যে বেশ-ভূষার পারিপাট্য, ঐ যে ভুবনমোহিনী পরপুরুষমনোমোহিনী হাবভাব, ঐ যে সুমধুর বিজলিহাসি, তাহার নিম্নেই প্রাণভরা

দুঃখকাদম্বিনীর ঘোর ঘনঘটাই দৃষ্ট হয়,—উহা পেশাদারের পেশাদারী,—দোকানদারী মাত্র। ঐ হাসি প্রাণের হাসি নহে; প্রাণে কান্নার বন্যা বহিতেছে,—প্রাণে—অন্তস্তলে—অনুতাপ ও দুঃখের আগ্নেয়গিরির উত্তাপে ভিতরটা দিবারাত্র জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে। পাঁজার উপরের মসৃণ প্রলাপের তলে কি ভীষণ অগ্নি রহিয়াছে, তাহাই সুশীতল জ্ঞানে তথায় উঠিলে পুড়িয়া মরিতেই হয়। বাহিরের চটকের তলে তাহাদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে। বাহিরের চটকের লোভে যে ভুলে, তাহারও পারণাম পাপের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করা। যাহাই চক্‌চক্ করে, তাহাই মূল্যবান্ কাঞ্চন বা মণি নহে। অসতী কাচমাত্র,—সতীই প্রকৃত কাঞ্চন, প্রকৃত রত্ন। সাবেক রত্নের আদর্শ দূরে ফেলিয়া, কাচকে কাঞ্চন জ্ঞান করিয়া তাহাকে আদর্শ করিবার পূর্ব্বে ছার প্রাণ বিসর্জ্জনই প্রকৃত সুবুদ্ধির পরিচয় নহে কি?

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতার (নবম অধ্যায় ৩১ শ্লোকে) অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! আমার ভক্ত যে কখনও বিনষ্ট হয় না—ইহা তুমি নিঃসঙ্কোচে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার; এবং (ষষ্ঠ অধ্যায়—৪০ শ্লোকে) বলিয়াছিলেন—"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—অর্থাৎ—"হে পার্থ! শুভকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।" ভগবান্ বা ভগবতীই হিন্দুত্বে বা সতীত্বে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান। সতীত্বই ভগবান্ বা ভগবতী। ভগবান্ বা ভগবতীর ভক্তজন যেমন

কখনও বিনষ্ট হন না, সেইরূপ শুভকারী, সতীত্বধন রক্ষাকারী কখনও দুর্গতিপ্রাপ্ত হন না; সতীত্বের ভক্ত—সতী-নারী—কখনও বিনাশ বা দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে।

পণ্ডিতবর রঘুনন্দন যখন নদীয়ার মহারাজা স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় প্রথম আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গাতীরে একজন হিন্দুস্ত্রীলোককে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতে উদ্যত দেখেন, ও তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। কারণ জিজ্ঞাসায় অবগত হন যে, ঐ স্ত্রীলোকটি ঐ ঘাটের নিকটে স্বামীব সহিত বাস করেন ও কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিলেন। হঠাৎ অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টি আ বঁ। ও তাহাতে তিনি বাধ্য হইয়া ঐ গঙ্গার ধারের মন্দিরের মধ্যে একটিতে প্রবেশ করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার পর একজন মুসলমানও তাঁহাকে না দেখিয়া ঐ মন্দির মধ্যে আশ্রয় লয। ঝড়বৃষ্টি থামিলে প্রথমেই ঐ মুসললানটি মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, ও পরে ঐ স্ত্রীলোকটিও মন্দির হইতে বাহির হইযা নিজ বাটীতে যান। উভয়কে এক মন্দির হইতে ঐ ভাবে বাহির হইতে অপরে দেখিতে পাইয়া কুৎসা রটনা করে, ও তাঁহাকে পতিতা-জ্ঞানে তাঁহার স্বামী যাহাতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন তজ্জন্য পীড়াপীড়ি হয়। স্বামী কিন্তু তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সন্দিহান হন নাই এবং তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন নাই। সমাজ তজ্জন্য খড়গহস্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মহারাজার নিকট অভিযোগ করেন। তিনি পণ্ডিত-

মণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটির অগ্নিপরীক্ষা বিধান করেন, এবং স্থির হয় যে, যদি তপ্তলৌহ তাঁহার হস্তে দিলে তাহা ধারণ করিতে পারেন ও হস্ত যদি দগ্ধ না হয়, তবেই তিনি সতী গণ্য হইবেন, ও বিপরীতে অসতী বিবেচিত হইবেন। পরীক্ষার সময় এই বলিয়া তাঁহার হস্তে উত্তপ্তলৌহ দেওয়া হয়—"যদি যবনসংসর্গ না হইয়া থাকে তবে হাত পুড়িবে না।" কিন্তু উহাতে তাঁহার হাত পুড়িয়া যায় ও তিনি তাহা ধারণ করিতে পারেন নাই। সেজন্য সমাজ তাঁহাকে অসতী গণ্য করে; কিন্তু তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অসতী গণ্য না করায় ও পরিত্যাগ না করায়, সমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে ও অশেষ লাঞ্ছনা প্রদান করে। তাহাতেই তিনি স্বামীকে সেই অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজ তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাইতে-ছিলেন বলেন। সব শুনিয়া রঘুনন্দন তাঁহাকে নিরস্ত করেন ও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলেন। পরে পণ্ডিতপ্রবর যথাসময় রাজসভায় উপনীত হইয়া ঐ কথার উত্থাপন করেন, এবং ঐ অগ্নি-পরীক্ষা ঠিকভাবে করা হয় নাই, এইরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে যে কথা—"যদি যবনসংসর্গ হইয়া থাকে তবে হাত পুড়িবে"—বলিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার অপর কোন ভাবে বা কারণে যবনভাবপ্রাপ্তি ঘটিলে—যাহা নানাভাবে হইতে পারে—ঐ পরীক্ষায় তাঁহার উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর ছিল না; নিজ স্বামিসংসর্গেও যবনসংসর্গ হইতে পারে। সেজন্য "যদি নিজ স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সংসর্গ হইয়া থাকে তবেই হাত পুড়িবে"—এই বলিয়া পুনরায় অগ্নি-

পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। মহারাজা ও সভাসদ্‌গণ তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া তাহাতে সম্মত হন; এবং পুনরায় ঐ কথা বলিয়া তাঁহার হস্তে তপ্তলৌহ দিলে সেবারে তিনি তাহা ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, ও তাঁহার হাত পুড়ে নাই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সতীত্বধনে জলাঞ্জলি দেন নাই, ইহাই স্থির হয়। পরে সমাজ আর তাঁহাদিগকে লাঞ্ছনা দিতে পারে নাই। তাঁহারা আবার পূর্ব্বগৌরবমণ্ডিত থাকিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

ঐ ঘটনায় দেখা যায় যে, প্রকৃত সতীত্বের ভক্ত সাধ্বীনারী কখনও নষ্ট হন না বা দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। পরীক্ষায়—ভীষণ পরীক্ষায় পড়িতে পারেন। ভগবতীর অংশ সতী নারী ভগবতী জগজ্জননী দ্বারা সতত সুরক্ষিতা থাকেন। উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসারিণী নারী আজ কি বিরল নহে?

এক্ষণে "আত্মহত্যা মহাপাপ" এই শাস্ত্রবচনই অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিপালন করিয়া ধর্ম্মপালন করা হইয়া থাকে। খলের ছলের অভাব হয় না। সতীত্বধন হারাইয়া ভিখারিণী হইয়া পদে পদে মহাপাপ করিয়াও ধর্ম্মটি পালন করা চাই। এখনকার ধর্ম্মপালন প্রায় ঐরূপই হয়। যেখানে নীচ স্বার্থ বজায় থাকে, সেইখানেই ধর্ম্মপালনের আগ্রহ, এবং যেখানে ঐ স্বার্থে আঘাত লাগে, সেই খানেই শাস্ত্রবচনের অপালন দ্বারাই শাস্ত্রমর্য্যাদা দেখান হয়। ধর্ম্মরক্ষার জন্য—সতীত্বরক্ষার জন্য যে দেহবিসর্জ্জন, তাহা সাধারণ মরণ নহে। তাহা মরণ নহে—তাহাই জীবন,—তাহাই অক্ষয় স্বর্গভোগ। ধর্ম্ম অভাবে—সতীত্ব অভাবে যে নারকীয়

জীবন,—তাহাই প্রকৃত মরণ,—তাহাই প্রকৃত অনন্তনরকপ্রাপ্তি। দেহের পবিত্রতা-রক্ষার জন্য—সতীত্বরত্ন রক্ষার জন্য যে মরণ, তাহাই আদর্শ মরণ; তাহাই অনন্ত জীবন,—কারণ সে কীর্ত্তি অনন্তকালস্থায়ী। গুণই কল্পান্তস্থায়ী হয়। জগতে প্রকৃত গুণের তাই এত আদর,—ও তাহার জয় সর্ব্বত্রই ঘোষিত হয়।

———

সতীত্ব।

১০ (গ) ভবিষ্যৎ আদর্শ।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের মধ্যে ভূত ও অতীত কালেরই যেন প্রাধান্য দেখা যায়। অতীত কালই যেন ধারণা বা স্মৃতির বিষয় হয়। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যেন ধরা যায় না। মনে হয় যেন মহাকাল সুদীর্ঘকাল-সূত্র যাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা আপন হস্তস্থিত সুবৃহৎ তর্কুগাত্রে অতি তাড়াতাড়ি জড়াইয়া গুটাইয়া লইতেছেন। বর্ত্তমান প্রতিমুহূর্ত্তই নিমেষে অতীতে মিশিয়া যাইতেছে, ও ভবিষ্যৎও প্রতিমুহূর্ত্তেই বর্ত্তমানে মিশিয়া পরমুহূর্ত্তেই সেই অতীতগত হইতেছে।

অতীতেই ভারতের সমস্ত গৌরব নিহিত রহিয়াছে। অতীতের সেই সীতা সাবিত্রী আদির সতীত্ব-বীণা-ঝঙ্কার,—সেই অপরূপ স্বর-লহরী,—সমগ্র জগতের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিত। জগৎ উৎকর্ণ হইয়া সেই অমৃতময় স্বরধারাপানে নিমগ্ন থাকিত। কালের প্রভাবে সেই স্বর্গীয় বীণার তার একে একে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সে বীণা যেন নীরবপ্রায় হইয়াছিল। ইংরাজী বাজনা—খৃষ্টধর্ম্মের জয়ঢাক—পাশ্চাত্যশিক্ষার নানাভাবের নানা বাদ্যযন্ত্র,—সে বীণার ক্ষীণস্বরকে ডুবাইয়া দিতেছিল। হিন্দু-ধর্ম্মের,—সতীত্বধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। যে অবস্থা আসিলে ভগবান্‌কে অবতার-দেহ-ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যে আসিতে হয়, সেই অবস্থা আসিয়াছিল।

সতীত্ব ঃ

গত প্রায় একশতাব্দীর মধ্যে ভারতের সর্ব্বস্থানে সে জন্য অনেক মহাপুরুষ, সাধুপুরুষ, সাধক ও সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দস্বামী, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু, সঙ্গদেব মহারাজ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, হরিগুরু স্বামী, মহাত্মা বামাক্ষেপা, রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, শিবনারায়ণ স্বামী, বল্লভাচার্য্য, নিম্বকাচার্য্য, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা রামচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ স্বামী—প্রভৃতি অনেক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ভারতের অধর্ম্মের স্রোত নিবারণ জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কশাঘাতে খৃষ্টধর্ম্মের জয়ঢাক নীরবপ্রায় হইয়াছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষার নব-অনুরাগ-বন্যায় পড়িয়া যাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এবং অনেকে সস্ত্রীক উক্ত কোন না কোন সদ্‌গুরুর শ্রীপদাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া—গুরু-"পাদাম্বুজ-দীর্ঘ-নৌকা"য় স্থান প্রাপ্ত হইয়া—অকূলপাথার বা সলিল-সমাধি হইতে,—সে বন্যার প্রবল খরস্রোত হইতে,—নিরাপদে কূলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাপজীবন-স্রোত ফিরিয়া প্রতি জীবনে পুণ্যস্রোত বহিয়াছিল। মহাপুরুষদিগের শ্রীকরস্পর্শে ভারতের সতীত্ব-বীণার ছিন্ন তারগুলি একে একে আবার সেই বীণা-গাত্রে স্থানলাভ করিয়াছিল,—আবার সেই জগৎবিমোহিনী ঝঙ্কার,—সেই মূর্চ্ছনা—শ্রুতি বা রেশ—ভারতবর্ষে ও তথা হইতে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরম পবিত্র ধর্ম্মজীবন,—তাঁহার অতীব সরল

ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের কঠিন তত্ত্বসকলের সমাধান ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়,—তাঁহার অমৃতময় উপদেশ ও কথা,—তাঁহাকে আধুনিক জগতের আদর্শপুরুষ ও শিক্ষাগুরু বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী—শ্রীশ্রীমতী সারদাদেবী—শ্রীশ্রীমা—র দেব-চরিত্র তাঁহাকে যুগাবতার তাঁহার স্বামীর উপযুক্তা স্ত্রীস্বরূপে—বর্ত্তমান যুগে স্বামিভক্তিতে—স্বামীর সেবায়—স্বামীর ধর্ম্মপালনের সহায়তায়—আদর্শ রমণী বলিয়া জগৎ গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। পবসহংসদেব "সরল মূর্খ" সাজে "বাউলের দল" মত আসিয়া অবতারের কার্য্যান্তে স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। সে দলের শিক্ষা—তাঁহার শুভাগমনের উদ্দেশ্য সমগ্র জগতে প্রচারিত ও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। অপ্রকাশ্যভাবে—নিজে নিজের শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া—প্রিয়তম শিষ্য, তাঁহার ভক্তদলের মধ্যে সেই শতদল, "সেই লালচক্ষু রুই," তাঁহার সেই "নারায়ণ"—নরেন্দ্র-নাথের—স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা জগতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। "নরেন্দর শিক্ষে দেবে"—তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। কৌমারবৈরাগ্যবান্ যুবকদল ভারতের ভাবী আশাস্থল হেতু তাঁহার শ্রীপদাশ্রিত সুরেন্দ্রনাথের "বরাহনগর মঠ" রূপ অঙ্কুর হইতে "বেলুড়মঠ"—মহাদ্রুমের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতের—জগতের তাহাই এখন কেন্দ্রস্থল। দীপ্তদিবাকরের ন্যায় উহা সমুদয় জগতে ভারতের সনাতনধর্ম্মশিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণ করিতেছে, এবং সূর্য্যের ন্যায় জগতের—ভারতের অশেষ-কল্যাণসাধন করিতেছে। দারিদ্র্য ও নানারোগগ্রস্ত ভারতের-

দরিদ্রসন্তানকে নারায়ণ জ্ঞানে প্রাণপণ সেবাধর্ম্ম কি জগতে অতুলনীয় নহে? তাহাই কি আদর্শজীবন নহে?

অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কামিনীকাঞ্চনত্যাগের শিক্ষা দিবার জন্য ও তাহার আদর্শ রাখিবার জন্যই,—বর্ত্তমান অসংযম ও ব্যভিচারের স্রোতে বাধা দিবার জন্যই,—মানুষ "মান-হুঁস" বলিয়া মানুষের "মান" বা আত্মসম্মানজ্ঞান ও "হুঁস" বা চৈতন্য-সম্পাদনের জন্যই,—কৌমারবৈরাগ্যবান্ যুবকদলই দেশের ভাবী উন্নতির মূল হেতু সেইরূপ সুসন্তান যাহাতে জন্মগ্রহণ করিতে ও দেশের ভাবী আশাস্থলের অনুরূপ কার্য্য করিতে পারে,—তাহার সম্যক্ শিক্ষা দিবার জন্যই,—যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

পরমহংসদেবের অবতার জ্ঞানে পরম বিশ্বাসী,—তাঁহার পরম ভক্ত ও জ্ঞানী,—তাঁহার "ভৈরব" নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ—যাঁহার "বিশ্বাস আঁকড়াইয়া পাওয়া যাইত না"—তাঁহাকে তাঁহারও স্ত্রী এবং বিবাহসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"সংস্কারের জন্য বিয়ে কর্‌তে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন ক'রে হবে?" "আমার ভাব কেবল নজীরের জন্য।" "আমার অবস্থা নজীরের জন্য। তোমরা সংসার করো—অনাসক্ত হ'য়ে। গায়ে কাদা লাগ্‌বে, কিন্তু ঝেড়ে ফেল্‌বে,—পাঁকাল মাছের মত। কলঙ্কসাগরে সাঁতার দেবে, তবু কলঙ্ক গায়ে লাগ্‌বে না।"

তাঁহার বিবাহ-সংস্কার নজীরের জন্য। তিনি পত্নীকে কিরূপে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার নজীর দিয়া

গিয়াছেন। সাংসারিক "বদ্ধজীব" সব ত্যাগ করিতে পারিবে না,—"সকলেই প্রায় কলাই ডালের খদ্দের" দেখিয়া, মনে মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করার উপদেশ তিনি দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন—"যে স্ত্রীসুখ ত্যাগ ক'রেছে—সে'ত জগৎসুখ ত্যাগ ক'রেছে। ঈশ্বর তার অতি নিকটে।" তিনি সাধারণ লোককে সংসার বা স্ত্রী ত্যাগ করিতে বলেন নাই,—সংসারে স্ত্রীর সদ্‌ব্যবহার —ধর্ম্মের সহায়তাকারিণীর ন্যায় ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী ভোগের জিনিস বটে, কিন্তু ধর্ম্মসঙ্গতভাবে— সংযতভাবে ভোগ জন্য ব্যবস্থা করিতেন। ভোগ করিতে গৃহী সকলকে একেবারে নিষেধ করিতেন না, কিন্তু উপভোগে আপত্তি করিতেন।

ভোগ ও উপভোগে—পতি ও উপপতি, বা পত্নী ও উপপত্নীর ন্যায় স্বর্গনরক প্রভেদ। এই উপসর্গ "উপ" কতই উপসর্গ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বত্রই বিপরীত বা কুভাব সূচনা করে। কেবল "কারে" পড়িয়া "উপকার" হয়। সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে॥" অর্থাৎ—

"কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কখনই কামনা শান্ত হয় না ; বস্তুতঃ ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়।" উপভোগের ইচ্ছা সে হেতু সর্ব্বশঃ নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

সেই জন্য তিনি ঐ উপভোগে বিরত হইবার উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন—"তোমাদের (সংসারীর) পক্ষে স্ত্রীলোক

একেবারে ত্যাগ নয়। স্ব-দারায় গমন দোষের নয়। তবে ছেলেপুলে হ'য়ে গেলে ভাইভগিনীর মত থাকৃতে হয়।"

অসংযমী পিতামাতার অসংযমী সন্তান যে দেশের বিশেষ অমঙ্গলকর তাহা বুঝিয়া সংযমশিক্ষা করিয়া প্রকৃত সুশিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত হইয়া পিতামাতা সংসারে চালবেন—তাহাই তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভগবানে ভক্তি লাভ করিয়া বিস্তার সংসার করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট ধার্ম্মিক ও বিশুদ্ধমতি বালকের বড়ই আদর ছিল। তিনি অবিদ্যাপ্রসূত বালকের স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না। ধাতুপাত্র বা রৌপ্যাদি ধাতু স্পর্শ বা অসতী স্ত্রীলোকের দ্বারা শ্রীপাদস্পর্শ "সিঙ্গি-মাছের হানার ন্যায়" অসহ্য ক্লেশকর জ্ঞান করিতেন। সে তনু মন প্রাণ—কি ধাতুতে গঠিত ছিল, তাহা যিনি যত বুঝিবেন, তিনি ততই উন্নত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রী কিরূপ পবিত্র হইবেন,—কিরূপ পতিভক্তি, পতি-সেবা দ্বারা সতীধর্ম্মপালন করিবেন, তাহা তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমা—নিজ অনুপম জীবনে পদে পদে দেখাইয়া অনুপম আদর্শ বর্ত্তমান কালে (হায় ! আর বর্ত্তমান নহে !) রাখিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু "মা" বলিয়া ভগবানের উপাসনা করিয়া বা ডাকিয়া যে সুখ পায়, এত সুখ আর কিছুতেই পায় না। "মা" বলিয়া ডাকিয়া যেন বড়ই নির্ভয় হয়। সেই "মা" বলিয়া ডাকিতে, সেই "মা" বলিয়া পূজা করিতে যেন হিন্দু ভুলিয়া যাইতেছিল। তাই কি ভাবে আবার "মা" বলিয়া ডাকিতে হয়, "মা" বলিয়া পূজা করিতে হয়, মা ভগবতীর এক একটি রূপ নারীমাত্রকে কি-

ভাবে "মা ভগবতী" জ্ঞানে পূজা করিতে হয়,—তাহাই যেন আবার ভাল করিয়া শিখাইবার জন্য পরমহংসদেব আসিয়াছিলেন। হিন্দুপত্নী হইয়া কিভাবে চিরব্রহ্মচারিণী থাকিয়া স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে হয়, তাহা পদে পদে শিখাইবার জন্যই যেন শ্রীশ্রীমা আসিয়াছিলেন। হিন্দুর বিবাহিত জীবনের কি উদ্দেশ্য ও গন্তব্য পথ ও শেষ সীমা কি,—ইহাই যেন সেই স্বর্গীয় আদর্শ দম্পতীর সারাজীবনব্যাপী অলৌকিক শিক্ষাপ্রদান। সে আদর্শ—সে শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকারী হইলেই প্রত্যেক হিন্দুজীবন ক্রমোন্নতির পথে নিশ্চিতই উঠিবে।

শ্রীশ্রীমার জন্মভূমি হুগলি জিলার অন্তর্গত জয়রামবাটীতে এবং বেলুড়মঠেও মাতৃ-মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে, ও ঐ আদর্শ স্থায়িভাবে রাখা হইয়াছে। এখন সে আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়া সেই আদর্শ অনুকরণে জীবন গঠিত করিবার সুপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান হিন্দুনারীসমাজে দেখিতে পাইলেই ঐরূপ আদর্শ আসিবার ও রাখিয়া যাইবার সুমহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়। বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে হিন্দুনারীসমাজ প্রকৃত হিন্দুত্ব—সতীত্ব শিক্ষার জন্য সেই দেব-মন্দিরস্থিত আদর্শ নারী-মূর্ত্তি—মাতৃমূর্ত্তির শ্রীপাদপদ্মে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিয়া তাহা হইতে আদর্শ গ্রহণে কৃতার্থ হইবেন—ইহা আশা করা দুরাশা নহে। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হইলে শ্রীরাধায় ভক্তি হওয়াই স্বাভাবিক। ঐ দুর্লভনারী-জীবনই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে আদর্শ—ইহাতে সন্দেহ নাই।

"মা"কে প্রাণ ভরিয়া "মা" বলিয়া ডাকিতে হিন্দু যে চির-অভ্যস্ত! মা'র সকল অভয়প্রদ পাদপদ্ম কেন, মা'র সর্ব্বশান্তিপ্রদ

ক্রোড়ে যে হিন্দুসন্তানের জন্মগত চির-অধিকার! মা বলিয়া লাফাইয়া মা'র কোলে উঠিবে—ইহা যে হিন্দুর চির আশা, চির-আকাঙ্ক্ষা। মা নামে যে পাষাণ গলে! সেই হিন্দু কি আজ সেই অভ্যাস, আশা, আকাঙ্ক্ষা—সব ছাড়িতে পারিবে? কখনই নহে। এত আর "পাতানো মা" নয়, এ যে সেই সনাতনী মা। "কুপুত্র যগুপি হয় কুমাতা কখন নয়।" সন্তানও যদি কু হয় তাহা হইলেও "মা" কি সন্তানকে ছাড়িয়া দিবেন? কখনই না। মাতৃ-মন্দিরে ঐ দেখ—বরাভয়করা মা হাস্যমুখে বলিতেছেন —"কখনই না।"

"জানিনা কেবা এসেছি কোথায়।
কেন বা এসেছি কেবা ল'য়ে যায়॥"

—কিন্তু যে যেখানেই আসিয়াছি—আমরা সকলেই সেই "মা"র সন্তান। এস, সকলে মিলিয়া সেই মাতৃ-মন্দিরে আন্তরিক ভক্তি ভরে পূজা করিতে যাই। "করহে চেতন, যে আছ চেতন।" "যে আছ চেতন, ঘুমাওনা আর।" এস, একবার সমস্বরে—তারস্বরে "মা"কে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে শিখি। এস, সকলে সমপ্রাণে সমস্বরে বলি—

"মা! যদি তোমার কোলে উঠিবার পবিত্রতা না আসিয়া থাকে, একবার তোমার শ্রীপাদপদ্মে তোমার অকৃতী অধম সন্তান-গণকে একটু স্থান দিয়া তোমার ঐ অভয় চরণছায়ায় অভয়ে রাখ মা! তুমি যে অভয়দায়িনী! তোমার হিন্দুসন্তানগণ যে মাতৃ-হীনের ন্যায় চারিদিকে বড় ভয়ে ভয়ে—ত্রিতাপে তাপিত হইয়া—শুষ্কপ্রাণে—শুষ্কমুখে—শুষ্ককণ্ঠে—অতি দীনহীনভাবে দিনযাপন

করিতেছে! দীনে দয়া কর, দীনে দিন দাও মা দীনদয়াময়ি! দয়াময়ী নাম সার্থক কর মা! দীনতা দূর কর মা! মা থাকিতে মাতৃহীন থাকা যে মা! অসহ্য কষ্টকর। অন্তর্যামিনি! অন্তর-ব্যথা অন্তর কর মা!" তাহাতে অন্তর-ব্যথা নিশ্চয়ই পলাইবে।

অধুনা এক শ্রেণীর নারীর সৃষ্টি দেখা যায়, তাঁহারা নাকি কাহারও স্ত্রী হইবেন না বা মা হইবেন না; তাঁহারা স্বাধীন জীবন যাপন করিবেন। ইহাকে "অনাসৃষ্টির সৃষ্টি" বলা যাইতে পারে। তাঁহারা কাহারও কন্যা বা ভগিনী যাহা হইয়া গিয়াছেন তাহার আর চারা নাই। এখন আর কাহারও স্ত্রী বা মাতা হইবেন না—এই সঙ্কল্প। তাঁহারা তবে করিবেন কি? দেশের কাজ? উহা একটি "হজমি গুলি" বিশেষ। তাঁহাদের চরিত্রে কটাক্ষপাত করিলে রক্ষা থাকিবে না। মূলমন্ত্র ভুলিয়া গিয়া পরম "কাস্ত্রীতা" (কাপুরুষতা বলিলেও চলে) দেখাইয়া পরম "হিংস-সহযোগ" অবলম্বনে তাহা হইলে তাঁহারা আমার আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া দিয়া নিরানন্দের বাজার বসাইয়া দিবেন। ব্রহ্মচর্য্য—সংযম—সাত্ত্বিকতার মোটেই চাষ হইল না, অথচ ফস্ করিয়া সেরূপ নির্ম্মল চরিত্রের এত ফসল কি করিয়া কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা বুঝা ভার। "ফুস্‌মন্ত্রের চোট" ভিন্ন উহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? ঐরূপ শ্রেণী সমাজের ইষ্টকারিণী বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেই পুরুষ শাস্ত্রমতে বিবাহ করিতে বাধ্য, বিবাহিত জীবন ভিন্ন পুরুষকে সমাজে রাখা অনিষ্টকর জ্ঞানে সকলকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইত। যিনি বিবাহ না করিতে চাহিতেন, তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী

হইয়া সমাজের বাহিরে যাইতে পারিতেন। এখন উল্টা স্রোতে বিবাহত্যাগিনী নারীর উদ্ভব হইতেছে। সমাজ তাহা কি চক্ষুতে দেখিতেছেন বা দেখিবেন, তাহা বলা দায়। তবে যে তাহাকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিবেন সেরূপ আশা করা দুরাশা না হইতে পারে। অস্বাভাবিক নারীজীবন কৃত্রিম জীবন বলিয়া ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহার আদর না হওয়াই মঙ্গলজনক ও উচিত।

আমিষও নয়, নিরামিষও নয়—এ কিরূপ আহার তাহা বুঝা যায় না। না মৎস্য, না মাংস, না হংসডিম্ব,—এযে কি, তাহা ধারণায় আসে না। এ অশ্বডিম্ব ভিন্ন আর কি মনে হইতে পারে? তাঁহারাই নাকি আবার ভবিষ্যতের আদর্শস্থানীয়া বলিয়া বিবেচিত হইতে চাহেন। ভগবানের চিড়িয়াখানায় কাল-মাহাত্ম্যে যে কত জীবের আবির্ভাব প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন। "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" অর্থাৎ "রাজকুলে ও স্ত্রীজাতিকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়" বলিয়া যে বচন শুনা যায়, খুব সম্ভবতঃ সেই বচনের সার্থকতা চক্ষুর উপর দেখাইবার জন্য ঐ শ্রেণীর স্ত্রীজাতির উদ্ভব হইতেছে। সমাজ এখন ঐ বচন স্মরণ রাখিলে ও বিস্মরণ না হইলেই মঙ্গল; নতুবা মহা অমঙ্গলের মেঘ সমাজ-গগনে অচিরে ঘনীভূত হইয়া আসিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

দেশ পরাধীন, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক হইয়াও স্বাধীন। বাটিটি পাথরের, কিন্তু আমি সোণার পাথর বাটি। আমি অংশ হইলেও, সমগ্র যাহাই হউক, আমি তাহার চেয়ে বড়—এই বুদ্ধি

সন্তোষ।

উদ্দাম মন-রূপ-কংশ-কারাগারে হাতপা লোহার শিকলে বাঁধা, বুকে মস্ত একখানি পাথর চাপান,—তবুও দেবকীরাণীরা স্বাধীন। পদে পদে পরাধীনতার শোথ বা গোদ, তথাপি সেই পদে প্রতিপদে স্বাধীন পদবিক্ষেপে নৃত্য করিবার সাধের বিষফোড়া। সিন্দুকের চাবিটি পরের হাতে থাকিলেও, তাহার ভিতরকার সর্ব্বস্ব আমার —স্বাধীন আমার,—এই জ্ঞান। বিবেকভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ— সব ভ্রংস বা নষ্ট হইয়া না গেলে, এরূপ বুদ্ধির উদয় হয় না। কংস-কারাগারের ঐ পাথর ও লোহার সংসর্গে মনপ্রাণ সবই পাথর ও লোহা হইয়া গিয়াছে। মাখম তাহার স্বাভাবিক কোমলতাগুণ ত্যাগ করিয়া কি প্রক্রিয়ায় বজ্র হয় তাহা বুঝা ভার। অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতির ফল, তাহা নিশ্চয়, কিন্তু স্বাধীনতার জ্ঞান বা বুদ্ধি দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রকৃত "স্ব" এর জ্ঞানে নিঃস্ব না হইলে স্ব-র্গের স্ব'র এরূপ কুস্বর হইত না। হিন্দুদেশে হিন্দুর চক্ষুতে দেখিয়া যিনি ঠিক স্ব না বুঝিয়া, ঠিক স্বএর অধীন না হইতে পারিয়া এরূপ বিকৃত স্ব'র অধীন হইতে পারেন, তাঁহার স্থান আলীপুরে হইবে কি বহরমপুরে হইবে তাহা বুঝা যায় না। "স্ব" তে "আমি" যোগ করিলে স্বামি বা স্বামী হয়, কিন্তু "আমি" যোগে কাহাকেও আর স্বামী হইতে দিবনা—এই ধারণা। স্ব অর্থে ঐশ্বর্য্য, সেহেতু স্বামী ঐশ্বর্য্যের রাজানএবং স্ত্রী ঐশ্বর্য্যের রাণী। যে স্বামিহীন, সে ঐশ্বর্য্যহীন, অতি দান, অতি দরিদ্র। স্ব অর্থে আত্মা ; স্ব অর্থে সুখাধিষ্ঠান স্বর্গ, যে স্বর্গ ঈশ্বররূপের নামান্তর মাত্র। তন্ত্রমতে স্ব অর্থে স্বাধিষ্ঠান চক্র। ভক্তিশাস্ত্রমতে স্ব শব্দে অসাধারণ

বস্তু। হিন্দুর যে মতেই যাওয়া যায়, স্ব ঠিক বুঝিলে স্ত্রীলোক হইয়া কখনও স্বামিবিরতি আসিতে পারে না। হিন্দুমত ভিন্ন স্ব-অধীনতা বা স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থবোধ হয় না। অর্থবোধ না হইয়া মাত্র শব্দবোধে তুমুল শব্দমাত্রই হয়, কার্য্য তাহার কেবল অকার্য্যই হইয়া থাকে।

স্বাধীন-প্রকৃতি রমণী ভারত-উদ্যানে নূতন ফুল; এ ফুল শিমূল ফুলের দ্বিতীয় সংস্করণ। কিন্তু এ ফুলের গুণে অনেক ভ্রমরের সহজেই আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তখন স্বাধীননারী স্বাধীনভর্তৃকা হইয়া পড়িতে পারেন।

"কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি তদন্তিকম্।
বিচিত্রবিভ্রমা মত্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা॥" অর্থাৎ—

যাঁহার গুণে আকৃষ্ট কান্ত তাঁহার পার্শ্বত্যাগ করেন না, যাঁহার বিভ্রম বিচিত্র, যিনি উন্মত্তা, তাঁহাকে স্বাধীনভর্তৃকা বা স্বাধীনপতিকা বলে। উন্মত্ততাই উন্মত্ততা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে। উন্মত্তার কখনও সুবুদ্ধি বা বুদ্ধির স্থিরতা থাকিতে পারে না। তাহার সাথীগণের দশাও তদ্রূপই হয়। মনুষ্য সামাজিক জীব, সুতরাং সমাজে থাকিলেই অপরের সঙ্গ করিতেই হয়। নারীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট না হইয়া থাকা জগতে সাধারণতঃ দুঃসাধ্য বলিতে পারা যায়। স্বাধীনভর্তৃকার আকর্ষণের কথা না বলিলেও চলে।

সুতরাং "স্বাধীন জেনানা" র প্রাদুর্ভাব দেশের শুভকর কি অশুভকর তাহা আর বলিতে হইবে না। জগতের ইতিহাস

পাঠ করিলে তাহার ক্রিয়া বুঝিতে পারা যায়। স্বাধীনপ্রকৃতি নারীর আবাসস্থল ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সে স্বাধীনতাবৃক্ষের কিরূপ ফল ফলিতেছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। আমেরিকার একজন বহু অভিজ্ঞ বিচারক তাঁহার সুদীর্ঘকাল বিচার বিভাগে থাকার ফলে বলিয়াছেন যে, তথায় ১৬ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর বয়সের নরনারী দ্বারা ভয়ানক আদালতগ্রাহ্য অপরাধ সকলের মধ্যে শতকরা ৭৫ টি সাধিত হইয়া থাকে। ভারতে জেল সমূহের বিবরণী পাঠে অপরাধী নরনারীর সংখ্যা ও পরিচয় দেখিয়া ঐ সব স্বাধীন দেশের তুলনায় কিছুই নহে বলিতে পারা কঠিন। "প্রবাসী" নামক মাসিক পত্রিকায় ১৩২৬ সালের ভাদ্রসংখ্যায় "জেলে স্ত্রী কয়েদী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে ঐ বিষয়ের জ্ঞানলাভ হইবে। যে ভাবে নারী-স্বাধীনতার বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ভারতের পক্ষে ইউরোপ বা আমেরিকার নিকটবর্ত্তী হইতে যে দীর্ঘকাল লাগিবে, তাহা না হইতেও পারে। জগৎ যে শিক্ষা দিতেছে,—ভারত যে শিক্ষা দিয়াছে,—তাহা দেখিয়া শিক্ষা না করিয়াও "শিক্ষিতা" নাম গ্রহণের চেষ্টা বা ইচ্ছা মাত্র বাতুলতা নহে কি?

নারীজাতি মাতা হইবেন না,—এ অতি অস্বাভাবিক ও বিচিত্র। বাঙ্গালায় "মা", সংস্কৃতে "মাতা", পারসীতে "মাদর", গ্রীক ও লাটিনে "মাটর", জার্ম্মানে "মুতের", ইংরাজীতে "মদর্"—পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই মা নামের এক ভাবই দৃষ্ট হয়, সকলদেশেই যে শব্দেই হউক, মা'র অর্থ, ব্যবস্থা ও কথা আছে। নারী হইয়াও কখনই মা হইবেন না—এ যেন সমুদ্রজলকে লবণহীন বা ফেনহীন করিবার

প্রয়াস, বা কোন নদীকেই আর সমুদ্রে পড়িতে না দিবার ব্যাপার বা ব্যবস্থা। যাহা হউক, এই পরাধীন দেশের স্বাধীনা দেবকী রাণীগণ গর্ভে কৃষ্ণ উৎপন্ন না করিয়া কিরূপে হস্তপদের শৃঙ্খল বা বক্ষের পাষাণমুক্ত হইবেন বা কারামুক্ত হইবেন, তাহা বুঝা ভার। পুত্র লব ও কুশের জন্ম না হইলে কি উপায়ে সীতার বনবাসের অবসান হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে কি ?

শিব গড়িতে গেলে কেবল সাদা রং দেখিয়া গড়াইলে ত চলিবে না। মাথায় ছোটবড় দশআনা ছয় আনা ঘাড় কামান চুল ত শিবঠাকুরের নয়; তাঁহার ত জটাজূট। চক্ষু ত ঐরূপ কটা নয়; গোঁফ ত ঐরূপ নাসিকার নিম্নে মাত্র কয়গাছি শুঁয়া নয়, লেজ ত নাই। এ কি গড়ান হইতেছে তাহা ভবিষ্যৎই দেখাইবে। তবে বর্ত্তমানে সতর্ক না হইলে ভবিষ্যতে দেখিতে গেলে এত বিলম্ব হইয়া পড়িবে যে, আর সংশোধনের সময় বা উপায় থাকিবে না। তখন সেই গঠিত কথিত দেবমূর্ত্তি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এ সোনার ভারত লঙ্কার ন্যায় ছারখার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে—

"যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি স্বভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥"

অর্থাৎ যে সময়ে স্ত্রীলোকগণ অতিদুর্দ্দান্ত, কর্কশ ও কলহপ্রিয় হইয়া আপন ভর্ত্তাগণকে নিন্দা করিতে থাকিবে, সেই সময়ই প্রবল কলিকাল। একি তাহারই পূর্ব্ব সূচনা ?

যাহাহউক আজন্ম কঠোরতপস্বিনী—চিরব্রহ্মচর্য্যচারিণী আদর্শ-

সন্তোষচন্দ্র ।

পত্নী "শ্রীশ্রীমা" ভবিষ্যতে সতীশের আদর্শস্থানীয়া হইবেন, কিম্বা এই সকল শ্রীশ্রীমাসীমাতা ঠাকুরাণীরা ভবিষ্যতের আদর্শ-স্থানীয়া হইবেন,—তাহা সমাজের সুধী ব্যক্তিগণেরই বিবেচনা-সাপেক্ষ। যথোচিত বিবেচনার অভাব হইলে, কালে যে অনেককেই বলিতে হইবে—"মাসি! তুমিই আমার ফাঁসির কারণ"—ইহাতে সন্দেহ নাই।

সতীত্ব।

২। জগতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির বা মনুষ্যসমাজের উপর ইহার প্রভাব।

ধর্ম্মজগতে প্রবেশ লাভ না হইলে—শাস্ত্রসঙ্গতভাবে জীবন-যাপন করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ না করিলে—প্রকৃত ধার্ম্মিক না হইলে,—শাস্ত্রের অর্থ ও ধর্ম্মের মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝা যায় না। ধর্ম্মজীবন-যাপনের বিধিনিষেধের কঠোরতা থাকায় যাঁহারা সে কঠোরতা সহ্য না করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে যান, তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন না, অথচ নিজেদের সুধার বুদ্ধি আছে এই অভিমান থাকায় ধর্ম্মে কিছুই নাই—এই ধারণা করিয়া ফেলেন। সতীত্ব-ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এরূপ হয়—ইহা বলা যাইতে পারে।

ধর্ম্মপথ অতি কঠিন, আর পাপপথ অতি সহজ ও সুগম, ইহা সত্য। কিন্তু কঠিন চিরকালই কঠিন থাকে না, এবং সহজও চিরকালই সহজ থাকে না। ধর্ম্ম-পথে চলিতে চলিতে কালে তাহার কঠিনতা দূর হইয়া, ক্রমে তাহা সহজ হইয়া আসে; এইরূপ অধর্ম্ম-পথে চলিতে চলিতে তাহারও সহজ ভাব দূর হইয়া নানা কাঠিন্য, জটিলতা, রোগ আদি আসিয়া পড়ে।

পুরুষের সংস্বভাব ও নারীর সতীত্ব একই ধর্ম্ম। শরীর, মন ও বাক্যে পবিত্রতা বা নির্ম্মলতাই নরনারীর সৎচরিত্র বা সতীধর্ম্ম।

সতীত্ব ঃ

নরনারী সৎ ও সতী হইলে, তবেই সতীত্ব-ধর্ম্মের প্রভাব অনুভব করিতে পারেন, নতুবা পারেন না।

যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা—ইহার মধ্যে একটি থাকিলেই বিষম অনিষ্ট ঘটায়, আর যেখানে এই চারিটিই মিশিয়া ক্রিয়া দেখায়, তাহার ফল যে কত ভয়ানক, তাহা বলাই বাহুল্য। অবিবেকিতা পশুত্বজ্ঞাপক। বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধি থাকে বলিয়া মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহা না থাকিলে, মানুষও যাহা, পশুও তাহা ; বরং মানুষ পশু অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়ে। নীতিশিক্ষার মধ্যে স্ত্রীপুরুষ অযথাভাবে আকৃষ্ট না হইয়া উভয়ে নির্ম্মল চরিত্র থাকার যে শিক্ষা, তাহাই প্রধান ও উচ্চতম শিক্ষা। চোর, ডাকাইত, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ইত্যাদি না হইতে পারেন, কিন্তু কামেন্দ্রিয় জয় করিয়া পরস্পর নির্ম্মল থাকার চরিত্র দেখাইতে অনেকেই অশক্ত হইয়া পড়েন।

পুরুষজাতি নিজের স্ত্রী ভিন্ন জগতের সমুদয় স্ত্রীলোককে মা'র মত দেখিয়া চলিবেন, এই শিক্ষাই পুরুষজাতির চরিত্র-রক্ষার প্রকৃত শিক্ষা। নারীজাতি মাতৃজাতি ; সুতরাং নারী নিজ পতি ভিন্ন জগতের আবালবৃদ্ধ পুরুষকে সন্তানের ন্যায় দেখিবেন—এই শিক্ষাই স্ত্রীজাতির চরিত্র-রক্ষার প্রকৃত শিক্ষা। উভয় জাতির ঐরূপ শিক্ষাজনিত সদাচরণই সতীধর্ম্ম সুন্দরভাবে রক্ষা করিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যতই উচ্চশিক্ষা হউক না কেন, নরনারী ঐ সতীধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে, মহা অশিক্ষিতের ন্যায় কার্য্যই করিয়া থাকেন। আজকাল শুনা যায় যে, নরনারীর জীবনের

দুই দিক্ আছে। এক দিক্ প্রকাশ্য দিক্, যাহাকে ইংরাজীতে public life বলে, আর অপর দিক্ অপ্রকাশ্য দিক্, যাহাকে ইংরাজীতে private life বলে। অপ্রকাশ্য দিকে নজর দিবার সভ্যজগতের অধিকার নাই। সে দিকে নরনারী অতি পশু থাকিলেও কিছুই যেন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এইরূপ মনে করিতে বলা হয়। প্রকাশ্য দিকে কোন দোষ না থাকিলে, তাহাকে মন্দ বলার ক্ষমতা থাকে না। পুরাকালে ভগবান্ দৈত্যনাশের জন্য নর-সিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; আধ সিংহ ও আধ নরাকার। এখনকার সমাজে পাশ্চাত্যশিক্ষায় মহা সুশিক্ষিত নরনারীও সেইরূপ নর-ছাগ-মূর্ত্তি ও নারী-ছাগী-মূর্ত্তি,—নর-বৃষ-মূর্ত্তি ও নারী-গাভী-মূর্ত্তি ইত্যাদি—নর-পশু-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চলিতেছেন দেখা যায়। তাঁহাদের অপ্রকাশ্য দিক্‌টা দেখিলে ঘৃণার আসে। অপ্রকাশ্য দিক্‌টা প্রকাশ হইয়া পড়িতেও কিন্তু অধিক বিলম্ব হয় না।

উচ্চ-শিক্ষা, উচ্চ-সমাজ প্রভৃতি যেখানেই উচ্চ উচ্চ রব, সেই খানেই উচ্চ উচ্চ গলদ। ঐ যে উচ্চসমাজ বা high circle বলিয়া যে "চিজ"টি শুনা যায়,—যাহার ভিতর নড়ন চড়ন করা অনেকেই সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ জ্ঞান করেন,—ঐ বৃত্তের মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়া দেখা যায় যে, ঐ বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত সব রেখাই—সব নরনারীই—এক প্রকার লম্বা,—সব সমান,—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ;—কেহই কম নহেন। যেখানেই ঐশ্বর্য্যের আধিক্য, সেখানেই অসংযমের ও ব্যভিচারের আধিক্য প্রায় দেখা যায়। কালমাহাত্ম্যে পুরুষের মন যেমন এখন দাসীতে টানে বা চুরি করে, নারীর মনও

এখন সেইরূপ দাসে টানে বা চুরি করে দেখা যায়। তিনিই যথার্থ শ্রীমান্ বা ধনী, যাঁহার সমস্তই সন্তোষ ; এবং সেই ব্যক্তিই যথার্থ দরিদ্র, যাহার তৃষ্ণার বিরাম নাই। সেই হেতু দেখা যায় যে, কথিত ধনীসমাজে তৃষ্ণার—কাম-পিপাসার—বিরাম নাই ; তাহা আর মিটিতে চাহে না। সে তৃষ্ণার জ্বালায় পাত্রাপাত্র ভেদ থাকে না,—পাইলেই "চুমুক" দিয়া বসেন। অভাব বোধ আর যায় না ; অভাবে স্বভাব নষ্ট। অভাবের অরুন্তুদ তাড়নায় দিগ্বিদিকশূন্য ভাব। সে শ্রেণীর নরনারীগণ সুযোগ সুবিধার সময় পাইলে সে সময়ের সদ্‌ব্যবহার না করিয়া ছাড়েন না। সতীত্বের খাতিরে "একঘরে" হইয়া থাকা সে সমাজে মহা কষ্টকর। সতীত্ব তথায় অন্ধকার,—অসভ্যতার বা নির্বুদ্ধিতার অন্ধকার বলিয়া বিবেচিত হয়। সভ্যতা ও ব্যভিচারের আলোকের সম্মুখে সে অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না। আলোকে আলোকময় বটে, কিন্তু আলোকের নিম্নেই গভীর অন্ধকার দেখিয়া ভয়ে শরীর কাঁপিয়া উঠে। তাহাতেই দেখা যায় যে, অনেক সুচতুর "বন্ধু" সস্ত্রীক সে সমাজে নড়ন চড়ন করার মত অর্থ না থাকায় ও একাকীই তথায় মিশিলে ক্ষতি না হইয়া লাভ আছে দেখিয়া, একাকীই সে সমাজে গতিবিধি করিতে ব্যস্ততা দেখান। নিজের গরিব স্ত্রীকে লইয়া সে সমাজে চলিতে ফিরিতে সাহসী হইতে দেখা যায় না। যিনিই সে সাহস দেখাইতে যান, তিনিই প্রায় পস্তাইয়া থাকেন।

তথাকথিত সভ্যশ্রেণী হিন্দুত্বের ন্যায় সতীত্বকেও "গোঁড়ামি" বলিয়া ঘৃণার চক্ষুতে দেখেন। প্রকৃতই গোঁড়ামি বর্বরজনোচিত ও ভদ্রসমাজের গ্রাহ্য নহে বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা বিবেচিত হয়।

অতীন্দ্র।

"গোঁড়া" লেবু অতি টক ও মন্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথা-কথিত সভ্যজগৎ এই গোঁড়া ত্যাগ করিয়া যে "কাগজি" বা "পাতি" ভাব দেখান, তাঁহাদের সে "কাগজি" ভাব মাত্র কাগজ কলমের ব্যাপার,—প্রকৃত নহে। তাঁহাদের সেই "পাতি" ভাব রাজহংসের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং গোঁড়ামিকে ঘৃণা করিলেও তাঁহারা গোঁড়ার অধম টক হন। তাঁহাদের সে অম্লত্ব অসহ্য, এবং সতীত্বের দুগ্ধে তাহার এক ছিটা লাগিলেই সব নষ্ট হইতে দেখা যায়।

নারীকে মাতৃজ্ঞান না করিয়া, ও পুরুষকে পিতৃজ্ঞান বা সন্তানজ্ঞান না করিয়া—স্ত্রীপুরুষের অবাধ অগাধ মিলন দেখিলে বৃষগাভীপাল বা ছাগছাগীপাল মনে পড়ে। অপর দিকে যতই উচ্চশিক্ষার গর্ব্ব থাকুক, অসংযম জন্য বা ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে তাঁহারা পশুর অধম আচরণ করেন। পশুদের মধ্যেও ভোগ-ব্যবহারের এক একটা কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। শুনা যায় যে, পশু-রাজ সিংহ এক বৎসর অন্তর সিংহীর সঙ্গে মিলিত হয়। গাভীদেরও উপযুক্ত কাল না আসিলে তাহারা যখন তখন বৃষ অন্বেষণ করে না। কিন্তু নরনারীর সম্ভোগেচ্ছার কোন কালাকাল বিচার নাই। এই ব্যভিচার-স্রোত হইতে রক্ষা করিতে হইলে স্ত্রীপুরুষের অগাধ অবাধ মিলন বন্ধ করিতে হয়। বৃষকে যদি শৃঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া খোঁয়াড়ে রাখা যায় এবং গাভীর শৃঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া গোয়ালে রাখা যায়, এবং উভয়ের অবাধ অগাধ মিলন বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, অর্থাৎ উভয়কে পৃথক্‌ভাবে রাখার ব্যবস্থা হয়, তবেই এ রোগের প্রতীকার হওয়া সম্ভব; নতুবা নহে।

অসৎপুরুষের নিকট স্ত্রীলোকের সতীত্ব-মহিমা নাই, এবং অসতীর নিকটও সৎপুরুষের সাধুতার মহিমা বা সমাদর নাই। তাহার কারণ তাহারা সে মহিমা বুঝিতে পারে না, ও সেই জন্য তাহাতে সম্মান বা সমাদর প্রদর্শন করে না। এত নারী-নিগ্রহ তাই সংঘটিত হয়। সুসভ্য ইংলণ্ড আদি দেশের নারীনিগ্রহের কথা পড়িলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। তথায় নারীনিগ্রহ অনেক সময় ছলনা মাত্রও শুনা যায়। তথায় গর্ভবতী অবিবাহিতা অনেক নারী পুরুষকে প্রলোভনে ভুলাইয়া ঐরূপ সংঘটন করায়, এবং পূর্ব্বগর্ভের পিতৃত্ব উক্ত পুরুষের উপর চাপাইবার জন্য বলপ্রয়োগের অভিনয় দেখায়। তথায় নারীর দ্বারা পুরুষের উপর বলপ্রয়োগের কথাও শুনা যায়। সুসভ্য সাগরপারের মহিমা অপার। সে মহিমা-স্রোত ভারত-সাগরের কূলে আসিয়াও লাগিয়াছে; সে জন্য ভারতে অজ্ঞাত বিদেশী অনেক পাপও এখন যেন সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে।

যদি কোন যুবক নিজ অর্থ-মোহে বা রূপ-মোহে পরস্ত্রী ক, খ, গ, ঘ, ঙকে বশ করিতে পারে, কিন্তু অপর পরস্ত্রী চ যদি তাহার অর্থ ও রূপের প্রলোভন পদাঘাতে দূর করিয়া দেন ও তাঁহাকে সে ছলে বলে কৌশলে কিছুতেই হস্তগত করিতে না পারে, তবেই চ যে সতী স্ত্রী, ও চ'এর সতীত্ব-প্রভাব সে যুবক বুঝিতে পারে। নতুবা সতীত্ব যে কি, তাহার ধারণা সে করিতে পারে না।

সেইরূপ যদি কোন স্ত্রীলোক নিজ রূপ-মোহে,—ছলে বলে কৌশলে—অনেক পুরুষকে বশীভূত করার পর কোন প্রকৃত চরিত্রবান্ পুরুষকে কোনও রূপে—শত প্রকার ছল বল কৌশল

প্রয়োগ করিয়াও—না পায়, তবেই সে সেই পুরুষের সাধুতার প্রভাব বুঝিতে পারে; নতুবা তাহা বুঝিতে পারে না।

রাবণ সতীস্ত্রীর প্রভাব, ও শূর্পণখা সৎপুরুষের প্রভাব তাই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

সতীত্বের প্রভাব অসতের প্রভাবকে পরাভূত করিলে, তবেই অসতে সতীত্বপ্রভাব বুঝিতে পারে; তাহার পূর্ব্বে সম্যক্ পারে না। সতীত্বের প্রভাব বুঝিবার পর তবে সতীত্বের মহিমা বা গৌরব বুঝিবার অধিকার জন্মে। তাহার পূর্ব্বে কেহ সে অধিকার লাভ করিতে পারে না।

কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধিই প্রকৃত সতীত্ব। প্রথমেই মনের উপর কার্য্য হয়। মনের বিমলতা থাকিলে তবে শরীরে ও বাক্যে বিমলতা আসে, এবং প্রকৃত সতীত্বও বজায় থাকে। বাক্যে যতই অশ্লীলতা থাকুক তাহাতে ক্ষতি কি?—শরীরের পবিত্রতা ত নষ্ট হইল না; কিম্বা শরীরের যতই অপবিত্রতা আসুক না কেন,—আমার মনের পবিত্রতা ত নষ্ট হইল না,—এবং আমি সৎ বা সতী থাকিলাম—এইরূপ যাঁহারা মনে করিয়া সেইরূপ সব কার্য্য করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, ও সতীত্বের মর্য্যাদা তাঁহাদের দ্বারা রক্ষা হয় না। মনে পরপুরুষকে কুভাবে চিন্তা করিলেও সতীত্ব থাকে না। স্বপ্নেও পরপুরুষচিন্তা বা সম্ভোগ নিশ্চয়ই সতীত্বনাশক। ব্যভিচার প্রথমেই মনেই হইয়া যায়,—শরীর পর্য্যন্ত যাইতে হয় না। মনের পবিত্রতা নষ্ট হইলেই,—ইচ্ছা করিয়া মনের পবিত্রতা নষ্ট করিলেই,—সতীত্ব নষ্ট হইয়া যায়। সতীত্বের এমনই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। সেইজন্যই

সতীত্ব।

সতীত্ব রক্ষা করিতে গেলে মনকে সর্ব্বতোভাবে পাপচিন্তা হইতে দূরে রাখিতে হয়। বিবেক ও সংযমই মনের প্রকৃত রক্ষক। তাহাদের হস্তে মনের রক্ষার ভার দিলেই তবে মনের প্রকৃত বিমলতা রক্ষা করিয়া যথার্থ সতীত্ব বজায় রাখা যায়।

"ভালবাসা" "ভালবাসা" করিয়া যে আন্দোলন শুনা যায়, তাহা প্রকৃত ভালবাসা নহে। পশুভাবে দেহের মিলনেই সে ভালবাসার পরিণতি, ও তাহা হইয়া গেলেই ভালবাসা শেষ হইয়া যায়। সে ভালবাসা মিথ্যা ভালবাসা,—সে দেবতা নহে, সে দানবী। দেবতা জ্ঞানে তাহার পূজা করিতে গিয়া দেহ-সংযোগ আসিয়া পড়ায় সব মাটি হইয়া যায়। তখন সতীত্ব-পুষ্প দানবের পূজায় নষ্ট হইল দেখিয়া অনুতাপ আসে। সতীত্ব,—প্রকৃত বা অকৃত্রিম ভালবাসা—নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিণতি। প্রকৃত ভালবাসা থাকিলে,—যথার্থ প্রেম থাকিলে,—দেহ-সংযোগ আদি কিছুই দরকার হয় না। ভালবাসিয়াই ভালবাসার তৃপ্তি লাভ হয়। সতীত্ব সেই যথার্থ প্রেমের শেষ ফল। ইহা অতীব দুর্লভ রত্ন, যথা তথা দেখা যায় না।

যথার্থ সতীনারীর মনে যদি একটুও কালিমা না লাগে, অথচ কোন দুর্বৃত্তদ্বারা তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অর্থাৎ বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও জোর পূর্ব্বক যদি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও বোধহয় তাঁহাকে যথার্থ সতীশ্রেণী হইতে বাদ দেওয়া যায় না। মনে যদি পাপ স্পর্শ না করিয়া থাকে, তবে দেহের সেই পাপ বা মলিনতা বোধহয় শাস্ত্র সঙ্গত প্রায়শ্চিত্ত

আদি দ্বারা দূর হইয়া যায়। মনের পবিত্রতাই সতীত্ব বটে, তাই বলিয়া ইচ্ছা করিয়া শরীরের একটুও পাপ করিলে সতীত্ব রক্ষা হয় না।

সাধারণতঃ দেহের অশ্লীল সংযোগ হইলেই "সতীত্বনাশ" করা হইল বলা হয়। পরপুরুষের দেহ হইতে সেজন্য নারী-দেহ পৃথক্ রাখিলে সতীত্ব সুরক্ষিত থাকে। শ্লীল সংযোগও নিন্দনীয়; কারণ কখন কোথা হইতে ঐ শ্লীল সংযোগ তাহার শ্লীলতার সীমারেখা অতিক্রম করিবে, তাহা জানা যায় না। সেই-জন্য পরপুরুষের শরীর হইতে সতী স্ত্রী তাঁহার দেহ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র না রাখিলে সতীত্ব রক্ষা হয় না। ইচ্ছাপূর্ব্বক অতি সামান্য কুস্পর্শও সতীত্বের হানিকর হয়। সেহেতু অতীব সাবধানতা অবলম্বন বা রক্ষা না করিলে, প্রকৃত সতীত্ব রক্ষা করা হয় না। কিন্তু যদি কোন যথার্থ সতীনারীর দেহ তাঁহার রোগবিশেষের আক্রমণ হেতু অচৈতন্য অবস্থায় থাকা কালে কোন পাষণ্ড দ্বারা আক্রান্ত হয় ও তিনি তাহা কিছুই জানিতে না পারেন, তাহা হইলেও তাঁহার সতীত্বনাশ হয় নাই বলিলেই বোধহয় সুবিচার করা হয়, ও দেহে যে অন্যায় কার্য্য হইয়া গিয়াছে, শাস্ত্রসঙ্গত প্রায়শ্চিত্ত আদি দ্বারা সে পাপস্খালন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। মনের প্রকৃত পবিত্রতা না থাকিলে, শরীর অপবিত্র না হইলেও তাহাও সতীত্ব-নাশক বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং মনের প্রকৃত পবিত্রতা থাকিলে সতীনারীর সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বে ও জোরপূর্ব্বক বা তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাঁহার শরীরের উপর কৃত মহাপাপও বোধ হয় প্রকৃত সতীত্ব-নাশক হইতে পারে না।

মনই প্রথম বা প্রধান; ইচ্ছায় দেহে বিন্দুমাত্র পাপই সতীত্ব-নাশক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সতীত্বের দারুণ অভাব যেখানে দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত তুলনা করিলে, সতীত্বের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যদি কোন ভারতবাসী ভারতের বাহিরে, যেখানে সতীত্বের কোন মূল্য নাই বলিলেও চলে, সেখানে সেই সব দেশীয় নারীগণের ক্রিয়াকলাপ দেখেন, তবেই তাহার সহিত তুলনায় ভারতললনার সতীত্ব-প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। নরকের ছবি দেখিলেই স্বর্গের ছবির প্রাধান্য আপনিই অনুভবে আসে। যদি কোন ভারতবাসী ইউরোপের নানাদেশে গিয়া তথাকার নারী-চরিত্র দেখিবার অবসর পান, তবেই তিনি ভারতের সতীনারীর আদর না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুইডেনের হ্রদস্নানের যাত্রীগণের শরীর সংস্কারাদির কুৎসিৎ যে সকল ব্যাপার সেখানকার নারীগণের দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে হিন্দুনারীর—সতীচরিত্রের—প্রভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয়। ঐ সব দেশের প্রকাশ্য স্নানাগার-আদির ব্যভিচার দৃষ্ট হইলে, নারীর লজ্জা ও সতীত্ব কি গৌরবের বস্তু, তাহা বুঝা যায়।

বুয়রযুদ্ধের সময় যখন ম্যাফেকিং জয় হয়, ও সেই জয়সংবাদ লণ্ডনে পঁহুছে, তখন সেখানকার নরনারী জাতীয় আনন্দ উৎসবে মত্ত হইয়া যেরূপে নৃত্য করিয়াছিলেন, অথবা গত জর্ম্মান মহাসমর-বিরতির সংবাদে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর তারিখে লণ্ডন নগরে সেই অতীব অশ্লীল, নির্লজ্জ, সঙ্কোচহীন, স্ত্রীপুরুষের অবাধ অগাধ চুম্বন আলিঙ্গনের তাণ্ডব নৃত্য ও পৈশাচিক দৃশ্য যাঁহারা নয়ন-

গোচর করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই সে দৃশ্য স্মরণ করিলেই হিন্দুনারীর স্বভাবসিদ্ধ সতীত্বের প্রভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতীনারীর পবিত্রপদে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিদানের সাধ করিতে পারেন। কোন ভারতবাসী আপনাদিগের জাতীয় মহোৎসবের দিন আসিলে ঐরূপ সভ্যতার আদর্শে জাতীয় উৎসব সংগঠিত ও সংঘটিত হয়, ইহা বোধ হয় ইচ্ছা করেন না। ঐরূপ সভ্যতা ভারতবাসার ধাতুগত নহে ও তাহা নিশ্চয়ই অসহ্য বোধ হয়। মনে হয় আর সুসভ্য হইয়া কাজ নাই, অসভ্য হইয়াই থাকি। অসতীত্বের প্রভাবই সতীত্বের প্রভাব উন্মূলন করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাই দেখা যায় যে, আজকাল অনেক ইংরাজেও ইংরাজ মহিলাদের পরিবর্ত্তে ভারত মহিলার, এবং অনেক ইংরাজ মহিলাও ইংরাজের পরিবর্ত্তে ভারতবাসী ভদ্রলোকেব পাণিগ্রহণ করিয়া দাম্পত্যসুখে সুখী হইবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন।

সতীত্ব।

৩। ইহার শুভাশুভ ফল।

বিচিত্রতা বা নানাপ্রকার ভাবই সৃষ্টির বিশেষত্ব। ভগবানের সৃষ্টিতে—এই ব্রহ্মাণ্ডে—সে জন্য কত প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বা ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। একই দ্রব্য বা প্রাণী অসংখ্য হইলেও প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মানুষ সকলেই, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে, এমন কি যমজসন্তানগণের মধ্যেও মুখ বা স্বরের বিশেষ বিভিন্নতা পবিলক্ষিত হয়। উহাই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সৃষ্টিকৌশল। ঐ কৌশল জন্যই স্বর্গ-নরক, সত্যলোক রসাতল, ব্রহ্মা ও কৃমিকীট প্রভৃতি অতি উচ্চ ও অতি নীচ স্থান বা ভাব দেখা যায়। এই পৃথিবীতে অতি স্থূল পর্ব্বত ও অতি সূক্ষ্ম পরমাণু, অতি পবিত্র গঙ্গাজল ও অতি অপবিত্র স্থানের বিষ্ঠামূত্রপূর্ণ জল, অতি সুখাদ্য সুধা ও অতি অখাদ্য গরল, অতি উজ্জ্বল আলোক ও অতি নিবিড় অন্ধকার—সেইজন্য দৃষ্ট হয়। মনুষ্যসমাজেও সেইজন্য পরস্পর বিসদৃশ পাপপুণ্য, ভালমন্দ, পণ্ডিতমূর্খ, ধনীদরিদ্র, বালকবৃদ্ধ, সুরূপকুরূপ, সতীঅসতী, ধর্ম্মঅধর্ম্ম প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। মনুষ্যসমাজে বা এই বিশ্বে কেবল ভাল জিনিসই থাকিবে, কোনও মন্দ জিনিস থাকিবে না,—এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রত্যেক মনুষ্য-সমাজে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক পবিত্রতার সৃষ্টি স্থিতি ও লয় নারীগণের দ্বারা যেরূপ হয়, সেরূপ আর কিছুতেই

হয় না। নারীচরিত্রের পবিত্রতার উপরই সামাজিক পবিত্রতা নির্ভর করে, এবং নারীর দূষিত চরিত্রই সমাজ-দেহে সর্ব্বপ্রকার দূষণ বা অপবিত্রতা বিসর্পিত করে। সেইজন্য নারীকে দেবীর ন্যায় নিষ্কলঙ্কচরিত্র রাখিতে পারিলেই, সমাজে দেব-চরিত্র সৃষ্টি ও রক্ষা হয়। কারণ নারীজাতি মাতৃজাতি। চরিত্র বা আচরণ বা ব্যবহার অনুসারেই এই নারীই দেবী হন ও দেবীর ন্যায় পূজিতা ও কল্যাণদায়িনী হন ; আবার চরিত্রদোষে এই নারীই দানবী বা রাক্ষসী হয়, এবং সেই ভাবে ঘৃণিতা ও ভয়ঙ্করী অর্থাৎ অতিশয় ভয়ের ও অমঙ্গলের কারণ হয়।

শারীরিক ও মানসিক গঠনাদিহেতু স্ত্রীজাতিকে পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী—এই চারি জাতিতে, এবং পুরুষ-জাতিকে শশ, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব—এই চারি জাতিতে বিভক্ত করা হয়।

নারী-জাতির চরিত্র অনুসারে তাহাকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা—

(ক) সাধ্বী অর্থাৎ কেবল মাত্র নিজ পতির ভোগ্যা।

(খ) বেশ্যা—অর্থাৎ সকলের ভোগ্যা।

(গ) কুলটা—অর্থাৎ অপ্রকাশ্য বেশ্যা, বা জনবিশেষের বা বিশেষ জনগণের ভোগ্যা।

মনুষ্যসমাজে নারীগণের মধ্যে এই তিনপ্রকার নারী দেখিতে পাওয়া যায়। সাধ্বী নারী নরসমাজের মাথার মণি ; কারণ তিনি সে সমাজে পবিত্রতা ও সুশৃঙ্খলতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষার সর্ব্বপ্রধান সহায়। বেশ্যা সমাজের শত্রু হইলেও প্রকাশ্য

সতীত্ব ঃ

শত্রু বলিয়া বরং ভাল। কিন্তু যে মুখে মিত্রতা দেখায় ও কার্য্যে ঘোর শত্রুতা করে, সে অতীব ভীষণ শত্রু। সম্মুখসমর সহ্য করা যায় ও তাহার প্রতীকার করা যায়, কিন্তু মেঘের আড়াল হইতে যে শত্রু শক্তিশেল বর্ষণ করে ও সমাজকে বিধ্বস্ত করে, সেই কুলটা নারী যে সমাজের অতিশয় অহিতকারিণী ও শত্রু, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগের পূজিতা-কুলকামিনীগণ মধ্যে পরিগণিতা থাকিবার ইচ্ছাও থাকে, এবং কুলত্যাগিনী হইয়া প্রকাশ্য কলঙ্কলেপনেও অনিচ্ছা থাকে; অথচ কুলকামিনীগণের স্তায় সতীত্বরক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের থাকে না। অবিবাহিতা, সধবা ও বিধবা এই তিম অবস্থার কুলটা স্ত্রী সমাজের মহা অনিষ্টকারিণী ও কণ্টকস্বরূপ।

পাপ-জলে বেশ্যা-কুম্ভীর থাকে; সুতরাং সে পাপ-জল-পথে বিচরণ না করিলেই যুবক বা পুরুষ চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু কুলটা স্ত্রীলোক "ঘরের ঢেঁকিই কুমীর" হয়, এবং তাহারাই আবার "খাল কাটিয়া কুমীব" আনে। তাহাদের হস্ত হইতে বালক, যুবক বা পুরুষগণকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপাব। তাহারা "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" সদৃশ,—এক কলসী বিষের উপরি-ভাগে—মুখে—মাত্র কিঞ্চিৎ দুগ্ধ স্বরূপ। মুখের দুগ্ধ বা অমৃত দেখিয়া সমাজ প্রতারিত হয়, এবং পরে সে কলসীর বিষ-আস্বাদনে জর্জ্জরিত হয়। তাই কি হিন্দুসমাজ আজ এত জর্জ্জরিত?

---

(১) সাধ্বী বা সতী স্ত্রী।

কেন স্ত্রীলোক সতী হন বা থাকেন অর্থাৎ সতীত্বের সৃষ্টি ও স্থিতির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ নির্ম্মল সাত্ত্বিক-চরিত্র পিতামাতার ঔরসে ও গর্ভে সতী কন্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুসংস্কার হেতু সতীত্বের অমোঘ বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই সতীত্বের বীজই কালে অতি মনোহর ফুলফলভরা সতানারীর দেহ-বৃক্ষে পরিণত হয়। পূর্ব্ব সংস্কার তাঁহাদিগকে পাপ ও প্রলোভনকে আন্তরিক ঘৃণা ও পরিহার করিতে স্বভাবতঃই শিক্ষা দেয়, ও সৎকুলে জন্মেন বলিয়া পাপকার্য্যে লজ্জা বোধ থাকে; এবং নিজেরাও স্বাত্ত্বিক, নির্ম্মল জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ প্রাপ্ত হইয়া বিমল পবিত্র সতী-জীবন অতিবাহিত করেন। চলিত কথায় বলে—"জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন দেবতা নিয়ে।" উহা প্রতিজীবনেই সত্য বলিয়াই দেখা যায়। সতী কন্যা জন্মিয়া কালে বিধাতার ইচ্ছায় আপন মনোমত পবিত্র-চরিত্র দেবোপম পতি প্রাপ্ত হন। দেবীর সহিত দেবের সংযোগ বিধাতাই বিবাহে করিয়া দেন। উভয়েই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-পথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কালে সতীকন্যার পিতামাতা হন। এই ভাবেই হিন্দুনারীর মধ্যে সতীর সৃষ্টি ও স্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে সতীত্বের অপার মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। "যত সব নাড়াবুনে, সব হ'ল কিত্তুনে কিত্তুনে।" কাজেকাজেই সেই পূর্ব্ব কীর্ত্তন এখন অতি বিরল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি সেই পূর্ব্ব কীর্ত্তনে—সেই পূর্ব্ব উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া হিন্দু পিতামাতা শাস্ত্রমত নিজ

নিজ জীবন যাপন করেন, তবে সতীকন্যার জন্মই সাধারণ নিয়ম ও অসতী কন্যার জন্ম সে নিয়মের কদাচিৎ ব্যতিক্রমমাত্র হয়। বিবাহ করা ও পিতামাতা হওয়া প্রত্যেক জীবনেই তাই অশেষ দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেরূপ বুনিবেন, সেইরূপ শস্য পাইবেন—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কুপিতা কুমাতা হইয়া সন্তানবীজ বুনিলে কুসন্তানই পাইবেন, এবং তাহা পাইয়া সারাজীবন জ্বলিবেন, পুড়িবেন, ও সমাজকেও জ্বালাইবেন ও পুড়াইবেন। পক্ষান্তরে সুপিতা সুমাতা হইয়া সুসন্তানের বীজ বুনিলে সুসন্তানই পাইবেন ও তাহা দ্বারা সারাজীবন সুখ ও শান্তি পাইবেন ও সমাজকেও সুখশান্তি বিতরণ করিবেন। সুতরাং পিতামাতা হওয়ার কত দায়িত্ব, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তবে পিতামাতা হইবার কার্য্য করিতে হয়; ইহাই শাস্ত্রের বিধি। ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে কার্য্য করার জন্য শাস্ত্রের উপদেশ। শাস্ত্র মানিলে,—ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিলে,—পরে পস্তাইতে হয় না, অনুতাপের তুষানলে পুড়িতে হয় না। কিন্তু শাস্ত্রবিধি ও সদাচার না মানিলে মানুষকে পশু হইতে হয়, এবং পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া পশুস্বভাবের সন্তানপ্রাপ্তি হয়। "ভেবে করা ও ক'রে ভাবা" র প্রভেদ এতই অধিক। শাস্ত্রকারগণ সেইজন্য "ক'রে ভাবা" হইতে আমাদিগকে সহস্র প্রকারে রক্ষা করার জন্য ও "ভেবে করা" র প্রবৃত্তি দিবার জন্য কতই ক্লেশ স্বীকার করিয়া কত উপদেশ ও বিধিনিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

যে দেশে "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ,—যে দেশে "জননী স্বর্গের অপেক্ষাও গরীয়সী" বলিয়া শিক্ষা,—যে

দেশে পুত্র পিতামাতার সুখ ও তৃপ্তির জন্য প্রাণদান করিতে কুণ্ঠিত হইত না,—যে দেশে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন,—সেই দেশে—সেই ভারতবর্ষে—শাস্ত্র মান্য না করার ফলে শত শত পিতৃহন্তা, মাতৃহন্তা, পিতামাতার অবমাননাকারী কুসন্তান রাশি রাশি জন্ম গ্রহণ করিতেছে,—ইহা কি কম পরিতাপের কথা? পশুজীবন যাপন করিয়া পশুপ্রকৃতির সন্তানের জন্মদান করিয়া, সেই পশু কর্তৃক নিহত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কুবায়ু সৃষ্টি করিলে তাহা ঘূর্ণিবায়ুতে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। পুরুষের সাধুতা ও নারীর সতীত্বই সেইজন্য সুসন্তানের সৃষ্টি করিতে পারে, এবং পিতামাতা ও সমাজকে সুখী করিতে পারে। তাহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফলভোগ মনুষ্যজীবনে ও সমাজে অনিবার্য্য। ভদ্র সমাজে বাস সেইজন্য অশেষ দায়িত্বপূর্ণ। দায়িত্বজ্ঞানহীন নরনারী তাই সমাজের পরম শত্রু বলিয়া বিবেচিত হন। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নরনারীই সেজন্য সমাজের প্রকৃত হিতকারী। সমাজরক্ষার জন্যই শাস্ত্রমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া হিন্দুত্ব ও সতীত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। তাহার অভাবেই হিন্দুগণ ব্যক্তিগতভাবে ও সমাজগতভাবে এত দীন, এত হীন, এত দুর্ব্বল, এত ক্লিষ্ট--এত জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন। ব্যভিচার বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া—নিজধর্ম্ম না ছাড়িয়া—পরধর্ম্ম ভয়াবহ জ্ঞান করিয়া আবার ঘরের ছেলে—হিন্দু, ঘরে—হিন্দুত্বে ফিরিয়া আসিলেই, —আবার হিন্দুর আহার বিহারে মনোনিবেশ করিলেই বর্ত্তমান দীনতা, হীনতা, দুর্ব্বলতা, ক্লেশ ও জীবন্মৃতভাব চলিয়া যাইবে।

মোহ-মেঘ কাটিলেই আবার সাধুত্ব ও সতীত্বের তপন উদিত হইয়া সমাজ-হৃদয় সুখের আলোকে প্লাবিত করিবে; নতুবা নহে।

(২) বেশ্যা ও (৩) কুলটা।

বেশ্যার সৃষ্টি ও স্থিতির কারণ অনুসন্ধানে অনেক কারণ দেখা যায়, কিন্তু বেশ্যার লয় সম্বন্ধে উপায় বা কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন।

ভগবান্ মনুষ্যের মধ্যে যে স্বাধীনতার ভাব দিয়াছেন, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে; উহা স্বাধীনতার ভাণ মাত্র। যেমন কোন পশুকে একটি খোঁটায় ছোট বা বড় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সে আপনাকে স্বাধীন বিবেচনা করে, নরনারীও সেইরূপ কর্ম্ম-ফলেব দড়িতে মৃত্যুর খোঁটায় বাঁধা থাকে। দড়ি ১০ হাত হউক বা ১০০ হাত হউক,—দড়ির দীর্ঘতা অনুসারে সে আপনাকে স্বাধীন ভাবিয়া সেই পরিধির ক্ষেত্রে বিচরণ করে, এবং কতই গর্ব্ব, কত কর্ম্মই করে। ক্রমে কর্ম্মসূত্র বা দড়ি জড়াইতে জড়াইতে মৃত্যু-খোঁটায় প্রত্যেককেই আসিয়া পড়িতে হয়। তাহার পর কি হয় তাহা ভগবান্ই জানেন, এবং হিন্দুশাস্ত্রকারগণও জানিতেন। ধর্ম্ম বা বিবেকের, ভগবান্ বা কর্ম্মফলের ও মৃত্যুর অধীন থাকিয়াও তাহাতে সম্মান ও ভয় না করিয়া চলিলেই, সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করা হয়; এবং সেই স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলেই পাপ ও কুচরিত্রের সৃষ্টি হয়। পাপ-প্রবৃত্তিতে পড়া বা তাহার বশীভূত হওয়া বা না হওয়া নরনারার সাধ্যায়ত্ত; যিনি নিজ

জীবনের স্বাধীনতার সদ্‌ব্যবহার করিয়া উক্ত ধর্ম্মজ্ঞান ও বিবেকাদির অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলেন, পাপ-প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে আপনার অধীনে আনিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান ও বিবেকাদির অধীন থাকিয়াও যিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নিজ স্বাধীনতার অসদ্‌ব্যবহার করেন, তিনিই পাপ-প্রবৃত্তির দ্বারা পাপ-পথে চালিত হন, পরে ক্রমেই উৎসন্ন যান। যে নারী ঐরূপ নিজ স্বাধীনতারূপ শক্তির অপব্যবহার করে, সে সতীত্বধর্ম্ম ও বিবেকাদির অধীনতা ও গণ্ডি ত্যাগ করিয়া পাপ-প্রবৃত্তিরাশির বশীভূতা হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী বা বেশ্যা হয়। বেশ্যার কন্যা বেশ্যা হইয়া বেশ্যার বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। প্রতি সমাজে এ সংসারে এই বেশ্যার সৃষ্টি ও স্থিতি প্রয়োজন হেতু অবহমানকাল হইতে এই শ্রেণী পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে দেখা যায়। বেশ্যার দ্বারা সমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধিত হয় সত্য, এবং যাঁহারা তাহাদিগকে সমাজ-গাত্র হইতে অপসারিত ও দূরীভূত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সেই সাধু উদ্দেশ্যও ধন্যবাদের যোগ্য। সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিবেন, ইহা স্বাভাবিক। সে হেতু বেশ্যাচরিত্র কখন ভদ্রসমাজে সুখ্যাতির সামগ্রী নহে, ইহা নিশ্চিত।

ঘৃণিত জীবনকে ঘৃণা করাও চলে, বা দয়ার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করাও চলে। পুরুষ শতপাপ করিয়াও, শত সতীনারীর ধর্ম্মনাশ করিয়া,—তাহাদিগকে কুলের বাহির করিয়া,—সমাজের বাহির করিয়া—তাহাদিগকে বেশ্যাদলভুক্ত করিয়া দিয়া,—

তাহাদের ঘৃণিত জীবনের বিশ্বকর্ম্মা হইতে পারেন, এবং আপনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অর্থে, প্রতিপত্তিতে ও কপটতায় ভদ্রসমাজভুক্ত থাকিবার গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিয়া আপনার কাম-বজ্রাহত সেই নারীগণকে তখন বেশ্যা বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত ও গ্রীবা বক্র করিয়া—মেনকা ও বিশ্বামিত্রের চিত্রের পুনরভিনয় করিযা—চলিয়া যাইতে পারেন। পুরুষের সাত খুন কেন, সাত শত খুনও মাফ হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের এক খুনও মাফ হয় না; সময়ে সময়ে খুন না হইলেও অস্ত্রধারণ মাত্রও মহাপাপ ও তাহা মাফের বা ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এ বিবেচনা করেন কে? না পুরুষ। এই কি পুরুষের কার্য্য? ইহা অপেক্ষা কাপুরুষতা মনুষ্য-জীবনে বোধ হয় হইতে পারে না। তুমি পুরুষ, একজন অবলার চরিত্রের বা মনের সাময়িক দুর্ব্বলতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া,—তঞ্চক ও দস্যুর ন্যায় তাহার সতীত্ব-রত্ন লুঠ করিয়া,—তাহাকে পথে বসাও;—তুমিই পথে বিষ্ঠাত্যাগ কর, আবার তুমিই কিনা চক্ষু লাল কর? ধিক্ তোমার মনুষ্যত্বে,—ধিক্ তোমার পুরুষত্বে! স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ স্ত্রীলোকের দ্বারা হয় না; পুরুষের দ্বারাই হয়। স্ত্রীলোক দূতী হইয়া সতীত্ব-হত্যার সাহায্য করিতে পারে বটে, কিন্তু পুরুষের হস্তস্থিত ও চালিত অসি ভিন্ন সতীত্ব-শির ছিন্ন হয় না। পুরুষই সতীত্বের হত্যাকারী—আততায়ী। তুমি অশেষ পাপী হইয়া নিজ পুরুষ জন্মের দোহাই দিয়া তুমি ভণ্ড সাধু সাজিলে ও তোমারই কৃত-কর্ম্মের ফল বেশ্যাকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিলে তোমার অতি নীচ চরিত্রই সূচনা করে। তোমার প্রলোভনে পড়িয়া পিচ্ছিল পথে

একবার পা পিছলাইয়াছিল বলিয়া তুমি তাহাকে অকাতরে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিবে, কিন্তু নিজে ভদ্রলোক সাজিয়া দৃঢ়ভূমিতে থাকিবার ইচ্ছা দেখাইলে তোমাকে পশুর অধম বলা যায় না? ঐ বেশ্যা-জীবনের অশেষ দুর্গতির জনক তুমিই পুরুষ বা তোমারই ভাই "ব্রাদার"; তাহার ভগিনী বা "সিস্‌টার" নহে। সুতরাং যে পুরুষ নিষ্পাপ, বেশ্যাসৃষ্টি বা তাহার দলপুষ্টি সম্বন্ধে কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যিনি সংশ্লিষ্ট নহেন, তিনি বেশ্যাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করুন, তাহার প্রতি তিনি দয়ার লেশমাত্র দেখাইতে কুণ্ঠিত হউন, তাহাতে তাঁহার গুণ ভিন্ন দোষ নাই। কিন্তু যে পুরুষ নিজে পাপী, বেশ্যাসৃষ্টির সম্বন্ধে যিনি অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত, তিনি তাঁহারই কৃতকর্ম্মের ফল সেই বেশ্যাকে কেবল ঘৃণার চক্ষুতেই দেখিবেন ও তাহার প্রতি দয়ার লেশ মাত্র দেখাইবেন না,—এইরূপ হইলে মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করা হয় না। অবশ্য কোন পুরুষ বয়সের ও সঙ্গের দোষে পাপ-পথে চালিত হইবার পরে নিজ চরিত্র-সংশোধন করিয়া অনুতাপ-অনলে দগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারেন, এবং কুপথ ও কুসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু যে স্ত্রীলোক তাঁহার পূর্ব্ব পাপ-পথের সহপথিক ছিল, সে তাহার পাপজীবনে প্রকৃত অনুতাপ বশতঃ ঘৃণা বোধ করিলে, তাহার উদ্ধারের ও সৎপথে চলিবার ও থাকিবার সহায়তা করা উচিত বলিয়াই বোধ হয়। সেহেতু অনুতপ্তা পতিতা নারীর উদ্ধারসাধনায় যে সমাজ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, সে সমাজ মনুষ্য-সমাজের হিতকারী হেতু ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সতীত্ব ঃ

বেশ্যার কন্যা যে বেশ্যা, সে পাকা বেশ্যা। তাহার অনুতাপও নাই,—নিজ চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সৎপথে চলিবার ইচ্ছাও নাই; সেহেতু সেরূপ পাকা বেশ্যার প্রতি সমাজের আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন নিন্দনীয় নহে, বরং সুখ্যাতির বিষয়। কিন্তু যে নারী "এক পুরুষে" বেশ্যা, বা একবার ভুল করিয়া ফেলিয়া পাপ-পথে প্রলোভনের বশে চলিয়া পতিতা হইয়াছে, সে যদি পুনরায় উঠিবার জন্য সরলভাবে চেষ্টা ও ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি সামাজিক কঠোরভাবের লাঘব করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন ও তাহাকে উঠিবার সাহায্য করা প্রত্যেক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সবল সমাজেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে সমাজ নিজেই দুর্ব্বল, পতিতাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া পাপ-জলে পড়িয়া ও ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে নিজে বলবান্ না হইয়া বা অধিকতর বলবান্ সমাজের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ উদ্ধারকার্য্য করিতে যাওয়া উভয়তঃ অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক।

জনসমাজে বেশ্যার অবস্থান বিশেষ অনিষ্টকর হইলেও উহা একটি অপরিহার্য্য অহিত। উহা জনসমাজ সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্মরণাতীত কাল হইতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশীয় নৃপতি বিশেষের সুশাসন বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন যে, বারবিলাসিনীগণ রজনীতে প্রকাশ্যপথে পতিত থাকিলেও পবনদেব পর্য্যন্তও তাহাদের বস্ত্র স্পর্শ বা উন্মোচন করিতে সাহস করিতেন না। তাহাতেও দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বেশ্যা সমাজে বর্ত্তমান আছে। বাষ্পীয় শকটের এঞ্জিনে বাষ্প-বৃদ্ধি হইলে, অতিরিক্ত বাষ্প ছাড়িয়া দিবার একটি দ্বার বা নল

থাকে, তাহাকে (Safety valve) বাষ্প নির্গমের দ্বার বলে ও তাহার সাহায্যে বর্দ্ধিত বাষ্প ছাড়া হয়। নতুবা ঐ বাষ্প অতি কঠিন লৌহনির্ম্মিত সেই এঞ্জিন-গাত্র বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকে। জনসমাজরূপ এঞ্জিনে গণিকাগণ সেই অতিরিক্ত বাষ্প বাহির করিয়া দিবার দ্বারস্বরূপ। উহা না থাকিলে সমাজ-গাত্র সুকঠিন ও সুদৃঢ় হইলেও তাহা বিদীর্ণ ও নষ্ট করিয়া দিয়া মহা অনর্থ সাধন করিত। বড় বড় সহরে সাধারণের জন্য মলমূত্র ত্যাগের স্থান থাকিয়া যেরূপ সাধারণ লোকের উপকার বোধ হয়, বেশ্যালয়ও সেইরূপ শারীরিক বেগত্যাগের স্থান বলিয়া সাধারণ লোকে তাহা আবশ্যক ও উপকারী মনে করে। অতি কদর্য্য হইলেও ঐরূপ স্থান না থাকিলে, সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নিজ ঘরবাড়ি পরিবার ছাড়িয়া যাহারা বিদেশে থাকিতে বাধ্য হয় অর্থাৎ সপরিবারে কর্ম্মস্থলে বাস করা যাহাদের অর্থের অনাটন আদি কারণে সম্ভব হয় না, এবং যাহাদিগকে বহুকাল বিদেশেই থাকিতে হয়, তাহাদের শারীরিক প্রয়োজন যদি বেশ্যার অভাবে না মিটিত, তাহা হইলে সমাজে ভদ্র-পল্লীও নিরাপদ থাকিত না।

বেশ্যাসঙ্গ যে ঘোর নৈতিক অবনতি, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শারীরিক নানাপ্রকার অতি কুৎসিত রোগ বারাঙ্গনাশরীর হইতে তাহাদের সঙ্গকারী পুরুষের সাহায্যে সমাজশরীরে প্রবেশ-লাভ করে। তাহাদের মোহিনী শক্তিতে,—হাবভাবরসালাপে—কত তরলমতি যুবকদল নষ্ট হইয়া যায়। একবার তাহাদের বাহু-লতায় বেষ্টিত ও আবদ্ধ হইলে, উদ্ধারের আশা অতি অল্প হইয়া

যায়। ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। মাকড়সা যেমন জাল প্রস্তুত করিয়া তাহা পাতিয়া রাখে এবং কোন কীট-পতঙ্গ একবার তাহাতে পড়িলে যেমন সেই মাকড়সা লালায় তাহাকে জড়াইয়া সেই জাল হইতে মুক্ত হইতে দেয় না, বারবণিতার জালে পড়িলে পুরুষেরও সেইরূপ নিস্তার থাকে না। ব্যাধ যেমন পশুপক্ষী মারিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়া রাখে এবং অনেক সময়ে সুমধুর বংশীধ্বনিতে পশুদিগকে আকৃষ্ট করিয়া সেই জালে ফেলে, বারস্ত্রীগণও সেইরূপ পুরুষ ধরিবার জন্য রূপের জাল পাতিয়া বসিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে সুমধুর কণ্ঠে—সঙ্গীতে—আকৃষ্ট করিয়া পুরুষকে সেই জালে ফেলে ও মারিয়া ফেলে। সে জালে একবার পড়িলে অতি বলবান্ ব্যক্তিরও রক্ষা থাকে না। অনবরত অযথা ব্যবহারে তাহাদের রূপলাবণ্য অল্পকাল মধ্যেই হ্রাস বা বিনাশপ্রাপ্ত হইলেই, নানা কৌশল অবলম্বন দ্বারা তাহারা যৌবন ও রূপলাবণ্যের চটক বজায় রাখিতে চেষ্টা করে, ও বেশ-ভূষার পারিপাট্যে লুপ্ত সৌন্দর্য্যের ক্ষতিপূরণের প্রয়াস পায়। উদ্দেশ্য—পুরুষের মনোবিমোহন ও তাহাদের রুধির গ্রহণ ও তদ্দ্বারা নীচজীবিকা অর্জ্জন।

কথায় বলে—"সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" বেশ্যাসঙ্গ চরম অসৎসঙ্গ ও সর্ব্বনাশের মূল। নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষের শুক্রসংস্রবে তাহাদের দেহ দূষিত-রক্ত বিষের পুতুলের মত। অতি নীচপ্রবৃত্তি ও অশুচি হেতু তাহাদের মন নরক। দুগ্ধে অম্লসংযোগমাত্র তাহা যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ বেশ্যা-গমন দ্বারা শীঘ্রই রক্তের বিকৃতি ঘটে, এবং পুরুষকে অতিশয়

লম্পট, কামুক ও কুক্রিয়াসক্ত করিয়া তুলে, ও তাহার সম্মুখে নব নব পাপ-পথ উন্মুক্ত করে। উত্তেজনাবৃদ্ধির জন্য ও অবসাদ নাশের জন্য মদ্যপান আসে। উত্তেজনার উপর উত্তেজনায় ও বহুসময় কামচিন্তাবশতঃ অপরিমিত শুক্রক্ষয় হয়, এবং উত্তেজনার পর অবসাদ, ও আবার উত্তেজনা ও অবসাদ,—এইরূপে দেহ মনে নানা কুৎসিত ও উৎকট রোগ আনিয়া অকালে শমনভবনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। কলিরাজের রাজধানী সেই বেশ্যালয়ে কাম ব্যর্থ হইলে মধ্যম সহোদর ক্রোধ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বা তৃতীয় সহোদর লোভ কপটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নরহত্যা, নারীহত্যা চুরি আদি কত পাপকর্ম্মদ্বারা চিরনরকের ব্যবস্থা হয়। অর্থ-সংগ্রহ জন্য দরিদ্রব্যক্তির চুরি ডাকাইতি পর্য্যন্ত করিতে হয়। বেশ্যাসঙ্গে মনুষ্য আর মনুষ্যপদবাচ্য থাকে না, পশুর অধম ঘোর নারকীয় কীটে পরিণত হয়। দুঃখের বিষয় তাহারাই আবার সমাজের ভদ্রপরিবারভুক্ত, এবং অনেক সংসারে কর্ত্তা বা "হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা"। ঐরূপ দারুণ কুচরিত্র লোক সমাজভুক্ত থাকিলে এবং কোন বাটির কর্ত্তা হইলে, সেই বাটি হইতে সমাজের মহা অনিষ্ট ঘটে। কুচরিত্র কুলাঙ্গারগণ সমাজে ও গৃহে করেনা এমন কুকার্য্যই নাই। কামাতুর পাষণ্ডগণের সম্বন্ধ বিচার থাকেনা, কারণ তাহারা মহা অন্ধ হয় এবং মহান্ধের ন্যায় তাহারা সংসারে চলে। তাহাদের দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান্ থাকে না। তাহাতেই দেখা যায় যে, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, কন্যা, পুত্রবধূ, গুরুপত্নী, শিষ্যা বা শিষ্যপত্নী, যুবতী বিমাতা, মাসী, পিসী, ভ্রাতৃবধূ, খুড়ী, জেঠী, শাশুড়ি—তাহাদের নিকট অগম্যস্থান কিছুই থাকে না। অথচ নরাকৃতি

সেই পশুসকল ভদ্রলোক সাজিয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল কাটাইতেছে। বাটীর কর্ত্তা ঐরূপ চরিত্রের হইলে তাহার বাটীতেই গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া পরিবার মধ্যেই বেশ্যাবৃত্তিশিক্ষার পাঠশালা খোলা হয়, এবং পরিবারস্থ বালকবালিকাগণকে সেই পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়া কর্ত্তাগৃহিণী নিজেরাই নষ্টামির গুরুমহাশয়গিরি ও গুরুমহাশয়াগিরি করিতে থাকেন। তাঁহারা কুপথের পথিক হইলে, বাটীর অধীনস্থ ব্যক্তিগণের তাহাতে বাধা দিবার শক্তি থাকে না, এবং সে বাটীর সকলেই সেই কুশিক্ষা পাইয়া কুপথের পথিকই হয়। সেরূপ গৃহে ধর্ম্ম, নীতি, পুণ্য আদি ভাল জিনিস কিছুই থাকে না—সম্বন্ধবিচার উঠিয়া যায়,—এক কিম্ভূত কিমাকার ভাব ধারণ করে। সেই গৃহের সহিত সমাজের বৈবাহিক সম্বন্ধে ও আদান প্রদানে সমাজের কত পুণ্যবান্ গৃহে সেই ব্যভিচারের বীজ ছড়াইয়া পড়ে। সেইরূপ কুবংশে ব্যভিচারজাত অনেক কুজন্মা সন্তানও অনেক সময় সুজন্মার পরিচয়ে সমাজে চলিয়া যায়। সে গৃহের কোন কন্যা অন্য ভদ্রসংসারে পুত্রবধূরূপে গমন করিয়া কালে আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্ব্বনাশ করে। কোন পুত্র জামাতারূপে অন্য ভদ্রগৃহে গিয়া সে সংসারের মহা অনিষ্ট করে। কোন ভদ্রসন্তান সেরূপ গৃহে জামাতাস্বরূপ প্রবেশ করিলে, সে গৃহের সংক্রামক ব্যভিচাররোগে আক্রান্ত হইয়া সৎচরিত্রে, ভদ্রতায় ও কুলশীলে জলাঞ্জলি দেয়। এইরূপে কতভাবে ও কতদিকে যে পাপের, অধর্ম্মের, অসতীত্বের স্রোত সমাজে প্রবাহিত হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বুঝিয়াই বা করিবেন কি? এ সর্ব্বনাশের প্রতিকার করা বড়ই কঠিন।

যাহাহউক প্রতি সমাজেই উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীর নরনারী থাকিবেই। ধর্ম্মে, অধর্ম্মে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ঐশ্বর্য্যে, রূপলাবণ্যে—প্রত্যেক বিষয়েই তিন প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই বলে বটে, কিন্তু যারপরনাই চেষ্টা করিয়াও সকল সময় কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না দেখা যায়। মনুষ্য-শক্তির উপর আর একটি কি শক্তি যেন কার্য্যকরী থাকিয়া উত্তম মধ্যম ও অধম শ্রেণীতে যেন বিভক্ত ও আবদ্ধ করিয়া রাখে। আবার জনসমাজে সকল শ্রেণীর দ্রব্যই যেন নিজ প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে। সৃষ্টির সবই যেন অনন্ত; পাপপথও অনন্ত,—পুণ্যপথও অনন্ত। উদ্ভিদ্‌জগৎ, প্রাণিজগৎ —সবই অনন্ত। অথচ প্রত্যেকটির কোন না কোন উপকারিতা বা প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা কোনও জিনিসই যেন বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই বলিয়া মনে হয়। বিষধর সর্পও সময়বিশেষে সেইজন্য এ সংসারে প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া গণ্য হয়, কারণ সেই বিষও মানব-জীবনে রোগের ঔষধসম্বন্ধে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। বেশ্যার ন্যায় জঘন্য শ্রেণীর সৃষ্টিস্থিতিও সে জন্য সংসারে নিতান্ত নিস্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না। সে শ্রেণীও যেন সমাজের কোনও না কোনও কল্যাণসাধনের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার এই সৃষ্টিতে স্থান পাইয়াছে। ঐ শ্রেণীর নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কামমূর্ত্তি নররাক্ষসগণের হস্ত হইতে ভদ্রসমাজের কুলস্ত্রী—সতীগণের সতীত্বরক্ষার এক বিশিষ্ট উপায়, এবং ভদ্রসমাজ-কলঙ্কের বিশেষ প্রতিষেধক।

দ্বিতীয়তঃ—বারবিলাসিনীগণের নৃত্যগীত আদি দর্শনে যে পুরুষের আন্তরিক ও অদম্য স্পৃহা থাকে, তাহা চরিতার্থ হয়। অনেক সময় ভোগ না করিলে রোগ যায় না। কুপ্রবৃত্তির স্পৃহা বদ্ধমূল থাকিলে তাহা চরিতার্থ না হইলে,—ভোগ না করিলে,—সে রোগও প্রায় সারে না। ভোগের দ্বারা যেন সে রোগও সারিতে দেখা যায়। লণ্ডননগরে টেম্‌স্ নদীর নিম্নের অদ্ভুত সুড়ঙ্গপথ, যাহার "উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর," না দেখিলে,—তাহাতে যাতায়াত না করিলে, তৃপ্তিলাভ দুর্লভ। দেখিয়া তৃপ্তিলাভ,—বাসনার তৃপ্তিলাভ,—পরে মঙ্গলজনক হয়।

তৃতীয়তঃ—আলোকের সহিত অন্ধকারের তুলনা করিয়া অন্ধকার হইতে আলোকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ জন্য অন্ধকারের সৃষ্টি। তুলনার বস্তু না থাকিলে সংসারে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। সেহেতু নরকের ছবি, নররাক্ষসী তমোময়ী বেশ্যামূর্ত্তির সহিত, স্বর্গের ছবি,—দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী সতীমূর্ত্তির উপমা রাখিবার জন্যই বেশ্যাসৃষ্টি। অসতীর তুলনায় সতীর গৌরব বিস্তৃত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঘূর্ণিবায়ুর প্রতাপে স্থানের মহা অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেই স্থানের অনেক দূষিত বায়ু ও দ্রব্য অচিরে দূরীভূত হয়। মহা অমঙ্গলকারী ঘূর্ণিবায়ুরও উপকারিতা সংসারে পরিলক্ষিত হয়। সেহেতু বেশ্যা বা কুলটার অসতীত্বরূপ ঘূর্ণিবায়ু যে স্থানে আবির্ভূত হয়, তথায় মহা-অনিষ্ট সাধন করে সত্য, কিন্তু এ সংসারে তাহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, ইহা বলা যায় না।

মহামায়া জগজ্জননী বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া এই দুই মায়ার

সাহায্যে এই সংসার-লীলা করিতেছেন। বিদ্যামায়ার রূপ বিদ্যা-রূপিণী সতী স্ত্রীলোকে, ও অবিদ্যামায়ার রূপ অবিদ্যারূপিণী অসতী স্ত্রীলোকে প্রকাশিত হয়। বিদ্যারূপিণী স্ত্রীলোক ভালদিকের—উচ্চদিকের—যথা প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য যাহাতে লাভ হয় সেই দিকে দিক্‌পত্নীরূপে, এবং অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীলোক মন্দ দিকের—নিম্ন দিকের, যথা অজ্ঞান, মোহ, অধর্ম্ম, পাপ আদি যাহাতে লাভ হয় সেই দিকে দিক্‌পত্নীস্বরূপে, মহামায়ার সংসার চালনায় সাহায্য করিতেছে। উভয় রূপই মহামায়ারই রূপ। বিদ্যা রূপিণী সতীসাধ্বীগণ সংসারে পুরুষকে ধর্ম্মের দিকে—ধর্ম্মপথে অগ্রসর করান, এবং অবিদ্যারূপিণী বেশ্যা ও কুলটাগণ পুরুষকে অধর্ম্মের দিকে—অধর্ম্ম-পথে চালিত করে। বেশ্যা ও কুলটাগণও মহামায়ার একটি রূপ হেতু তাহারাও নগণ্যা নহে; তাহাদেরও অদ্ভুত ও অসীম ক্ষমতা আছে।

শাস্ত্রে দেখা যায় যে, স্বর্গেও বেশ্যা আছে। যাঁহারা নারীর রূপ-ভোগের কামনা করেন অথচ সুকর্ম্মবশে স্বর্গেও যান, তাঁহারা নাকি সেই স্বর্গবেশ্যা, বিদ্যাধরী বা অপ্সরা ভোগ করেন, এবং "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ স্বর্গসুখ ভোগের পর তাঁহাদের পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করেন। অপ্সরোলোকে সুরসুন্দরীগণ অবস্থান করেন। স্কন্দপুরাণ—কাশীখণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধে—নবম অধ্যায়ে এই অপ্সরো-লোকের বর্ণনা আছে। ত্রিলোকবিজয়ী অনঙ্গের ইহারা মোহনাস্ত্র-স্বরূপ। উর্ব্বশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, মেনকা, পুণ্ডরিকা, সুকেশী, সুবাহু, সুরথা, রুচিরা, প্রমাথিনী, সোমা, পুঞ্জিকাস্থলা,

সঙ্গীত্ব।

রম্ভা, অলম্বুষা, সুমধ্যা, ঘৃতাচি, হেমা, বামনা, নাগদন্তা, মিশ্রকেশা ও বিশ্বাচী—ইহারাই ষষ্টিসহস্র সংখ্যার মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধা। তাহারা স্থিরযৌবনা ও স্থিরলাবণ্যা। কথিত আছে, যে সকল নারী মাসোপবাস ব্রত করিয়া একবার, দুইবার, বড় জোর তিনবার দৈবযোগে ব্রহ্মচর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহারা এই অপ্সরোলোকে যাইয়া থাকে, এবং যে সকল পতিব্রতা রমণী বলবান্ পুরুষ কর্তৃক বলপূর্ব্বক আক্রান্ত হইয়া স্বামী বোধেই তাহার সহিত কখন সঙ্গ করিয়াছে তাহারা, ও যে সকল রমণী স্বামী প্রবাসে থাকাকালে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে দৈবাৎ একবার ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হয়, তাহারা, এই অপ্সরোলোকে বাস করে।

দেবগণের ভোগ্যা এই বিদ্যাধরীগণ দেবতাগণের কার্যে, আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। যদি কোন মনুষ্য উগ্রতপস্যাদ্বারা দেবগণের শক্তি আদি প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস পান, তবে এই সব বিদ্যাধরী তাঁহাকে প্রলোভন দ্বারা পাতিত করিবার ও তাঁহার সেই তপস্যাভঙ্গের জন্য প্রেরিত হয়। উৎকট তপস্যার উৎকট পরীক্ষাও হয়। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হয়। মর্ত্ত্যের বিদ্যাধরীগণও মানুষের পরীক্ষার জন্যই নিযুক্ত আছে। মানুষের শরীর বা চর্ম্ম থাকিলেই মানুষ হয় না। সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যপালন দ্বারা পশুত্বত্যাগ হইয়া মনুষ্যত্বলাভ হইয়াছে কি না, ও মনুষ্যজন্মেরও যে সকল সিদ্ধি বা সফলতা আছে তাহা পাইবার বা রক্ষা করিবার যোগ্য হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষিত হইবার জন্যই মানুষ জীবন-পথে অসতী বা বেশ্যা দেখিতে পায়। জীবন-পরীক্ষায় অসতীনারী বা বেশ্যা অতি কঠিন প্রশ্ন। এই সুকঠিন

প্রশ্নের যিনি সদুত্তর দিতে পারেন, তিনিই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংযম ও বিবেকের পাঠাভ্যাসে রত থাকিলেই, এই কঠিন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে মানুষ সমর্থ হইয়া সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সে পাঠ যাহার অভ্যস্ত নাই, সে-ই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। উত্তীর্ণ হইলেই মনুষ্যত্ব ও ঊর্দ্ধগতিলাভ ও দেবত্বপ্রাপ্তির যোগ্যতা আইসে; অনুত্তীর্ণ হইলে পশুত্বেই স্থিতি ও অধিকতর পশুত্বপ্রাপ্তি ও অধোগতি লাভ ঘটে। সেহেতু অন্তর্জ্জগতেও অসতীর কার্য্যকারিতা আছে! উন্নতি-লাভের পথে অসতী মহাকণ্টক বটে, কিন্তু সে কণ্টক সৃষ্টিকর্ত্তাদ্বারাই সংসার-পথে বিকীর্ণ রহিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা বড়ই দুর্ব্বোধ ও কঠিন পরীক্ষক। তাঁহার প্রশ্ন-নির্ব্বাচনও এই জীবন-পরীক্ষায় সেইজন্য বড়ই কঠিন। কিন্তু তাঁহারই অনুমোদিত শাস্ত্রাদির শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ দ্বারা পাপপথ ও কুপ্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া তাঁহার কঠিন কঠিন পরীক্ষাতেও অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এখান হইতে প্রস্থান কালে—মরণকালে—তাহার জন্য তাঁহার একখানি প্রশংসাপত্র বা সার্টি-ফিকেট পাওয়া যায়। তাহা পরকালে বড়ই উপকারে লাগে। আবার ফিরিয়া আসিলেও উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারা যায়। ভগবানের কার্য্য বড়ই দুর্ব্বোধ, কিন্তু সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাঝ দরিয়ার তিনি ফেলিয়া দেন বটে, আবার ডাঙ্গায় বসিয়া টানিয়া তুলেন। কেন ফেলা, কেন তোলা,—কেন এত পরীক্ষা,—কেন এ খেলা,—তিনিই জানেন।

———

সতীত্ব।

৪। বংশবিশেষে ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উপর ইহার আধিপত্য বা অনুপ্রবেশ।

কালে হিন্দুনারীর সতীত্বের তেজঃ অনেক স্থলে হীনপ্রভ হইলেও একেবারে লোপ পায় নাই, এবং লোপ হইতেও পারে না। পূর্ব্বআদর্শ দেশকালপাত্রভেদে ঠিক পূর্ব্বমত না থাকিলেও, সাধ্বীনারীর মহিমা এখনও এজগতে অতুলনায়; এখনও এদেশে যাহা আছে, তাহা জগতে আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাঝে মাঝে তাহার জ্বল দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। সহমরণ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও অনেক সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু-বেদনা অসহ্য বোধ করেন, ও স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া এক চিতায় স্বামীর সঙ্গে শায়িতা হইয়া ভস্মীভূতা হয়েন। কেহ বা অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে দেহত্যাগ করিয়া স্বামিবিরহের দুঃসহ জ্বালা হইতে জুড়াইবার জন্য একই চিতায় স্থান পান। সে দিব্য দৃশ্য দেখিলে হিন্দুর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। সে ছবি হৃদয়ে যে কত ভাবতরঙ্গ তুলে, তাহা যিনি দেখিবার ভাগ্য করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন ও ইহার মহিমাও বুঝিয়াছেন! সেই অবস্থা সাধ্বী হিন্দুরমণীর অতি লোভের বস্তু। সেরূপ মরণ অমর জীবনলাভের সোপান। হিন্দুনারীর সেরূপ মরণ অপর হিন্দুনারীর আদর্শ।

যে যে বংশে ঐরূপ সাধ্বী স্ত্রীর জন্ম ও মৃত্যু হয়, সেই সেই বংশ চিরকাল ধন্য হইয়া থাকে ও সেহেতু সমাজে সে বংশের অতুলনীয় আদর ও সম্মান লক্ষিত হয়। শ্রীগীতায় (৩য় অধ্যায়, ২১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—

"যৎযদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ—"শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোক তাহা তাহা করে, তিনি যাহা প্রমাণ করেন লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।" সতীই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ; তাঁহারা সতীত্বের মহৎ পরিচয় দিয়া স্বর্গে গমন করিলে সে আদর্শ বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। যে বংশের কোন স্ত্রীলোক কুলত্যাগিনী হইয়া ঘোর কলঙ্ক অর্জ্জন করে, সে বংশ চিরকাল কলঙ্কিত হইয়া থাকে ও ভবিষ্যৎ বংশে পাছে সে পাপবীজ ছড়াইয়া পড়ে, এই ভয়ে সেই বংশের কন্যা কেহ গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। কিন্তু যে বংশ ঐরূপ সতী নারীর দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে, সেই সতীত্ব-বীজ নিজ বংশে রোপণ করার জন্য কত লোক সেই বংশের কন্যা নিজ গৃহে আনিবার জন্য কত আগ্রহ করিয়া থাকেন। সতীত্ব ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অশেষ কল্যাণকর জ্ঞানে ও অসতীত্ব তাহাদের পক্ষে পরম অশুভকর জ্ঞানে, লোকে সতীত্বের আদর ও অসতীত্বের ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। সতীর আদর্শে বংশ উজ্জ্বল হয় ও অসতীর প্রাদুর্ভাবে বংশ অতি হীন ও মলিন হয় ; এজন্য ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শুভার্থে সতীত্বের আদর্শ ও প্রভাব অটুট থাকাই উচিত। মাতা গুণবতী সতী

হইলে কন্যাও মাতার গুণ লাভে সমর্থা হন, এবং মাতা অসতী হইলে কন্যাও অসতী হয়—এ ধারণা সমাজের হৃদয়ে বদ্ধমূল।

সভ্যতার অবতার পাশ্চাত্যদেশের লোকের নিকট সে দেশে কুক্কুর, ঘোটক আদি জন্তুর সদ্‌বংশ বা উচ্চবংশ বা উচ্চ পিতামাতার বংশে জন্ম আদরণীয় হয়; কিন্তু মানুষের বেলা তাহার বংশের কোন আদর নাই বলিলেই হয়। অসভ্য ভারতবর্ষ কিন্তু মনুষ্যের সদ্‌বংশ আগে আদর করে। সুজন্মার সম্মান ও আদর, এবং কুজন্মার বা বিজন্মার অসম্মান ও অনাদর ভারতে চিরপ্রসিদ্ধ। সেহেতু ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শুভকামনায় সতীত্ব যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা অতীব মহৎ। কোন গাভী প্রচুর দুগ্ধবতী হইলে, অনেকেই সেই গাভীর একটি বৎস পাইবার জন্য লালায়িত হন। কারণ যে গাভী /৫সের দুগ্ধ দেয় তাহার বাছুরও সেইরূপ দুগ্ধ দিবে, এই ধারণা থাকে। এই ধারণা ভুল ধারণা নহে; কারণ "বাপ্‌কা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া"র শিক্ষার গুণে যেমন কিছু না কিছু গুণ থাকিবেই, "মা'কা বেটী"র—সতী মাতার কন্যার—সেই সতীত্ব-সুবাস কিছু না কিছু থাকেই, এবং অসতী মাতার কন্যার সেই অসতীত্ব-দুর্গন্ধেরও কিছু না কিছু থাকিয়াই যায়। মাতার অসতীত্ব-কলঙ্কের ন্যায় দুরপনেয় কলঙ্ক আর নাই, ও তাহা সেই কুগর্ভজাত সন্তানেও বিসর্পিত হইতে পারে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস।

সতী নারী রত্নগর্ভা হন। সে গর্ভে রত্নই প্রসব হয়। সে গর্ভে পুত্র জন্মিলে সে পুত্র-রত্ন হয়, এবং কন্যা জন্মিলে সে

কন্যারত্ন হয়। সতীর বংশই সদ্‌বংশ বা ভদ্রবংশ। সদ্‌বংশজাত কন্যা সকলে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। অসতীর বংশই অসদ্‌বংশ বা কুবংশ। কুবংশজাতা কন্যা অশেষ দুর্গতির মূল। সে জন্য কোন বংশের কলঙ্ক প্রচারিত হইলে, সে বংশের কন্যা কেহ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। "কৌকের" দোষ গুণ সমাজ খুব দেখিয়া থাকেন। তাহা দেখিয়াই গুণের পক্ষপাতী হন ও দোষের পক্ষপাতী হইতে পাবেন না। সতীত্বের এমনই প্রভাব! অসতীত্বের প্রভাবও কম নহে। কোন বংশে অনেক সতী নারী থাকিলেও যদি একজনমাত্র নারী কলঙ্কিতা বলিয়া ঘোষিত হয়, তবে সেই বংশটাই একেবারে হীন ও কলঙ্কিত হইয়া যায়। সেই বংশ একেবারে "মার্কামারা" হীন ও নীচ হইয়াই থাকে। সকলেই সাবধান হইয়া সে বংশের সহিত আদান প্রদান রহিত করিতে ইচ্ছুক হন। সতীত্বেব ন্যায় বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে ও অসতীত্বের ন্যায় বংশের মুখে কালিমা লেপন করিতে জগতে আর কিছুই নাই। লোকে সাধারণতঃ বলে—"মরার চেয়ে গালি নাই।" কিন্তু হিন্দুর পক্ষে "অসতীর সন্তান"—ইহা অপেক্ষা মর্ম্মভেদী অপমানজনক অসহ্য গালি আর নাই। সমাজে সেরূপ সন্তান বিরল নহে। তাহাদের হাজার বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা থাকিলেও, তাহাদের মাথা যেন সর্ব্বদাই নীচু থাকে। মাথা হেঁট রাখিবার কারণসকলের মধ্যে মাতার পাপই অদ্বিতীয়। মাতার পাপে সেরূপ সন্তানের জীবন আজীবন বিষময় হইয়াই থাকে। সেরূপ অভদ্রবংশ ভদ্রবংশের সহিত মিশিতে পারে না; সর্ব্বদাই হেয় ভাবেই থাকিয়া যায়।

সতীত্ব ঃ

চাণক্য লিখিয়াছেন যে, স্বেচ্ছাচারিণী হইলে নদী ও নারী আপন কুলকে পাতিত করে। সুতরাং সেইরূপ নদীর কূল ও নারীর কুল কখনই নিরাপদ হইতে পারে না। আবার সতীনারীই জগদ্ধাত্রী। তাই চাণক্য লিখিয়াছেন—

"গোভির্বিপ্রৈশ্চ বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ।
অলুব্ধৈর্দানশীলৈশ্চ সপ্তভির্ধার্য্যতে মহী॥"

অর্থাৎ গো, বিপ্র, বেদ, সতীনারী, সত্যবাদী, অলুব্ধ ও দানশীল, এই সপ্ত বস্তু ও ব্যক্তির ধর্ম্মেই সংসার ধারণ হইতেছে। পৃথিবীতে এই সকল বস্তু ও লোক না থাকিলে পৃথিবী লোপ পাইত।"

প্রকৃতই সতী নারীর অভাবে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম ও সুখ লোপ পায়। সেইজন্যই ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রসূতি যাঁহারা, তাঁহাদের সতীত্ব বা নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ভবিষ্যতে অশেষ সুখোৎপত্তির হেতু এবং তাঁহাদের অসতীত্ব বা কলঙ্কিত চরিত্র যে ভবিষ্যতের অশেষ দুঃখের হেতু, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

———

সতীত্ব।

৫। বাল্যাবধি শিক্ষা ও পরিচালনার অত্যাবশ্যকতা ও সারবত্তা।

সতীত্ব-শিক্ষা কেবল পুস্তকপাঠে সম্পন্ন হয় না। মুখের কথায় অপর বিদ্যা শিক্ষা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সতীত্বের শিক্ষা মাত্র মুখের কথায় প্রকৃতভাবে দেওয়া বা শিখা যায় না। সুতরাং তাহা কোন বিদ্যালয় হইতে শিখিতে পারা সম্ভব নহে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহই উহার বিদ্যালয়, এবং গৃহস্থ নরনারীর—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী আদির—সৎচরিত্র, সাত্ত্বিক স্বভাব ও সতীত্বের উচ্চ আদর্শই উহার শিক্ষা-পুস্তক। সেই পুস্তক চক্ষুতে পড়িলেই,—সতীত্বের পূজা ও আদর এবং অসতীত্বের অনাদর ও ঘৃণা—ইহা পদে পদে দেখিতে পাইলেই,—সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও সাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত প্রতিপদে দেখিতে পাইলেই,—সতীত্ব-শিক্ষার অবসর ও সুযোগ হয়। মাতা, ভগিনী ও আত্মীয়াগণের হৃদয়-বর্ত্তিকায় সতীত্ব-দীপ প্রজ্বলিত দেখিতে পাইলেই, বালিকাগণ তাহা হইতেই নিজ নিজ হৃদয়-বর্ত্তিকায় সতীত্ব-দীপ জ্বালিয়া লইতে পারে; নতুবা সে দীপ নিজ সংসারে নির্ব্বাপিত থাকিলে, অপর প্রদীপ জ্বালাইবার সম্ভাবনা থাকে না। সতীত্ব অনুকরণ করিয়া বা দেখিয়া শিখিবার জিনিষ; ধারণায় উহার গুণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা যথার্থ শিখিতে পারা যায় এবং সম্যক্ উপলব্ধি হয়। অমুক অমুক ব্যাঙ্কে বা ধনাগারে এত লক্ষ বা কোটি টাকা আছে—

ইহার তালিকা শিক্ষার দ্বারা কেহ তাহার একটি পয়সাও যেমন পাইতে পারেন না, সেইরূপ সতীত্ব সম্বন্ধে চরিত্র অঙ্কন করিয়া যত শিক্ষাই দেওয়া হউক না কেন, কিন্তু সমাজ মধ্যে তাহার জীবন্ত চিত্র গৃহে গৃহে মাতা ভগিনী ও আত্মীয়াগণের মধ্যে বিদ্যমান না দেখিলে, মাত্র বাচনিক শিক্ষায় কোন ফলোদয়ই হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে বালক ও যুবকগণ যে আধুনিক প্রথামত শিক্ষা লাভ করিয়া বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতেছেন বা হইতে যাইতেছেন, তাহার সারবত্তা কি? উহা কি নিতান্ত অসার ও মিথ্যা নহে? ঐরূপ বিদ্যাশিক্ষার কি ফল লাভ হইতেছে? সৎশিক্ষার কথা অনেক পড়া হইল এবং অনেক কথা শুনা হইল বটে, কিন্তু তাহার কার্য্য বা চরিত্রগঠনের ফল কি হইল? বড় বড় পুস্তকে বিদ্যা ও নীতিকথা অনেক লিখিত আছে, ও তাহা পঠিত ও মুখস্থ বা অভ্যস্ত হইতেছে বটে, কিন্তু বালকবালিকা ও যুবকযুবতীগণ তাহাতে কি উপকার পাইতেছেন? বর্ণপরিচয় হইবার পর প্রথম ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ ধরা হইল। বালকবালিকাগণ যুক্ত অক্ষর শিখিবার প্রথমেই "ঐক্য" শব্দ লিখিল; তৎপরে "বাক্য" শব্দ শিখিল; তৎপরে "মাণিক্য" শব্দ শিখিল। প্রথম পাঠে প্রথম ছত্রে "কখনও কাহাকে কুবাক্য বলিও না" শিখিল; পরে "সদা সত্য কথা বলিবে" শিখিল; ক্রমে ক্রমে "কদাচ পিতামাতার অবাধ্য হইও না" ইত্যাদি কত ভাল কথাই শিখিল। ক্রমশঃ কত ভাল ভাল বই—কত বড় বড় বই পড়িল, কতই শিখিল, ও প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু ঐ

শিক্ষিতের প্রকৃত শিক্ষালাভ কি হইল ? তাহার চরিত্রগঠনসম্বন্ধে কি হইল ? শিক্ষা বা চরিত্রগঠন প্রকৃতপক্ষে কিছুই হইল না ! প্রথম শিক্ষা "ঐক্য"—তাহার ত কিছুই শিখিল না ; শিখিল অনৈক্য,—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পূর্ব্বপুরুষ, ধর্ম্ম ও সমাজ ইত্যাদি সকলের সহিত অনৈক্যই তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইল। কেবল "বাক্যে"র ঝুড়ি হইয়া"মাণিক্য" উপার্জ্জনে বাহির হইল ; কিন্তু ঝিনুক পর্য্যন্ত উপার্জ্জন হইল না। কুবাক্য ভিন্ন সুবাক্য মুখ হইতে বাহির করিতে শিখিল না। "সদা" দূরে যাউক, ভ্রমেও সত্যকথা মুখ দিয়া বাহির করিতে শিখিল না,—কদাচ পিতামাতার বাধ্য হইতে শিখিল না। তবে এ শিক্ষার ফল কি ? সুধাময় বা বিষময় ? যাহারা কোন বই পড়ে নাই বা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজভুক্ত নহে, এমন ইতর অসভ্য ব্যক্তি যাহাকে বলা হয়, তাহাদের মধ্যেও যে সত্যের,—সতীত্বের,—ও বাধ্যতা আদি সৎগুণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষিত ও সভ্য সমাজে অনেকস্থলে তাহা দেখা যায় না কেন ? তবে এ শিক্ষার ফল কি ? পুরুষ এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যে ফললাভ করিতেছে, নারীও এই শিক্ষায় শিক্ষিতা হইলে সেই ফলই লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে নারীকে আর সেই ধর্ম্মহীন জঘন্য শিক্ষায় শিক্ষিতা না করাই কি সমাজের মঙ্গলকর নহে ও পিতামাতার কর্ত্তব্য নহে ?

বিদ্যা কি ও অবিদ্যা কি, জ্ঞান কি ও অজ্ঞান কি, সুশিক্ষা কি ও কুশিক্ষা কি, সুসংস্কার কি ও কুসংস্কার কি,—মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি,—এসব এখন পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষা হইতে জানিতে হইতেছে, এবং আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণের প্রদর্শিত পথ রুদ্ধ

হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে ও তাহার দর্শিত পথে শিক্ষালাভ করিয়া আমরা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার অবসরও আমাদের নাই। পতন আরম্ভ হইলে তাহার বেগে স্থির হইয়া থাকিবার সাধ্য থাকে না, এবং ক্রমশঃই অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্যশিক্ষার ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য হইতে অব্যাহতি না পাইলে, আপনাদের দুরবস্থা কতদূর হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করার ক্ষমতাও হইতেছে না।

আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাই, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বিদ্যা ও অবিদ্যার পার্থক্য যাহা দেখাইয়াছেন, পরবর্ত্তী ঋষিগণ—ভগবান্ ব্যাস আদি সমাজমধ্যে তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। জ্ঞান অর্থে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি বা আত্মা কি, ইহা জানা। বিদ্যা অর্থে —আমি দেহ নহি, আমি সেই চৈতন্য বা আত্মা—এই নিশ্চয়-বুদ্ধি। পাশ্চাত্যদেশে "আপনাকে জান" (Know Thyself) বলিয়া যে জ্ঞানের উপদেশ আছে, তাহাতে "দেহ" জানিয়া "মন" জানিতে গিয়াছেন দেখা যায়, কিন্তু "আত্মা" ধরিবার উপায় পান নাই। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান তাঁহারাও পান নাই ও সেইজন্য অপরকে দিতেও পারেন নাই। সে হেতু সভ্য পাশ্চাত্য-দেশে বা ইউরোপীয় সভ্যতামুগ্ধ আধুনিক ভারতবর্ষে প্রকৃত বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান যে কিরূপ, তাহা পাওয়া যায় না। অবিদ্যা সংসারের হেতুভূত। সেই অবিদ্যা নাশ করিয়া যথার্থ বিদ্যালাভ দ্বারা মুক্তিপথে চলিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যশিক্ষায় কিন্তু ঐ বিদ্যা যে কি, তাহার ধারণাই কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাজেকাজেই অবিদ্যার শিক্ষাই হইতেছে।

পাশ্চাত্যদেশ যে বিদ্যার আদর করেন ও শিক্ষা দেন, তাহা অবিদ্যার অপর মূর্ত্তি। আমাদের শাস্ত্রমত পরাবিদ্যা অভ্যাস করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন। পরাবিদ্যাভ্যাস করিতে করিতে অপর বিদ্যা যে সকল আছে, অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা ইত্যাদিও সহজেই লাভ হইতে পারে। এক্ষণে প্রকৃত অবিদ্যায় শিক্ষিত বৃথাবিদ্যাভিমানিগণ প্রাচীন-কালের শিক্ষিত প্রকৃত বিদ্যাকে নিন্দা করিবেন বা তাহার প্রতিবাদ করিবেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে। উহা চিরকালই হইয়া আসিতেছে।

প্রকৃত পরাবিদ্যা অভ্যাসের অমৃত-আস্বাদন না করিতে পারিলেও, অপরাবিদ্যার যে কোন ফল নাই, ইহা বলা যায় না। উহা মনের কিঞ্চিৎ বলের (তাহা আসুরিক হইলেও) বৃদ্ধি ও পুষ্টি করিতে পারে, ও উচ্চতর পরাবিদ্যালাভের সোপান সৃষ্টি করিয়া উচ্চতর আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত করিতে পারে।

বর্ত্তমানকালে সেহেতু বিদ্যাশিক্ষার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য স্থির করা অতীব জটিল প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল সমাজে দেশকালপাত্রভেদে শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। এক্ষণে বালকবালিকা ও যুবক যুবতীগণকে প্রকৃত চরিত্রবান্ ও চরিত্রবতী, —প্রকৃত গুণবান্ ও গুণবতী,—প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত ও শিক্ষিতা, অর্থাৎ প্রকৃত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তদ্বিষয়ে অনেক মনীষী ব্যক্তিই চিন্তা করিতেছেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"অশেষ জ্ঞান ও

অনন্তশক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ঐ কথা অন্য প্রকারে এইভাবে বলা যাইতে পারে মানবের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখনও জ্ঞানী বা শক্তিমান্ হইতে পারিত না। বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায় সকল তাহার অন্তরে কোন প্রকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না। কিন্তু যে সকল আবরণ তাহার অভ্যন্তরে জ্ঞান ও শক্তিপ্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান, সেই সকলকে অপসারিত করিতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে। ঐ আবরণসমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি শত সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে সর্ব্বজ্ঞ এবং জগৎ-সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত করিয়া তুলে। অতএব ঐ আবরণ সমূহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায় সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।"

অশেষপ্রতিভাসম্পন্ন বিবেকানন্দ স্বামীজীর হৃদয়-বৃক্ষে সমাজের অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষা আদি কতই সদনুষ্ঠানের সঙ্কল্পরূপ সুফলপ্রসূফুল অঙ্কুরিত ছিল, কিন্তু দেশের দারুণ দুরদৃষ্ট হেতু কালের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে সে মহৎ বৃক্ষ অকালে ছিন্ন ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভগবান্ যদি আর কিছুকাল এ মরজগতে তাঁহাকে থাকিবার অবসর দিতেন, তবে দেশ দেখিতে পাইত সে বৃক্ষ কত অমৃতফলপূর্ণ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিত। দেশের

নিতান্তই যে দুর্ভাগ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজ যে হিন্দুবিধবাগণ বর্ত্তমান সামাজিক দুর্গতি ও কর্ত্তব্যহীনতার দিনে আত্মীয়স্বজনদ্বারা উপেক্ষিতা হইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পর-মুখাপেক্ষী হইয়া নয়নজলে ভাসিতেছেন,—নিজ ভরণপোষণ নির্ব্বাহ জন্য মহাচিন্তাস্রোতে ভাসিতেছেন—তাঁহাদের সেই অসহায় অবস্থা স্বামীজীর প্রাণ কাঁদাইয়াছিল, এবং তিনি তাহার প্রতীকারের জন্য বহু সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের ঐ অভাব দূর করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার সময় পান নাই।

যাহা হউক, তাঁহার ইচ্ছা ও অনুমোদিত প্রণালী অবলম্বনেই সিষ্টার নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত ও তাহার শাখা বিদ্যালয় অন্যান্য স্থানে স্থাপিত হয়। হিন্দুবালিকা-গণকে কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহা ঐ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় ও "মহাকালী পাঠশালা"র ন্যায় বালিকাবিদ্যালয় দেখাইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মভাব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক "লেখাপড়া" শিক্ষাদানই ঐ সকল বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ব্যবস্থা; তাহাই যথোচিত সুব্যবস্থা।

খৃষ্টান পাদ্রিগণের প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাদুর্ভাব দেশের ছোট বড় সর্ব্বস্থানেই দৃষ্ট হয়। উহাই ছেনির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ-প্রবেশের ন্যায় সামান্য প্রারম্ভ হইতে বিরাট অমঙ্গল-কার্য্যের সূচনা করে। তাহাই "চঞ্চুপ্রবেশো মুষলপ্রবেশঃ।" ভারতহিতৈষিগণের সেবাযত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটী নাই; তবে আমাদের যে কঠিন প্রাণ, তাই এখনও কোনওরূপে বাঁচিয়া

আছি। যাহা হউক, ঐরূপ বিদ্যালয়ে হিন্দুবালিকাদিগের যে ভয়ানক কুশিক্ষা লাভ হয়, তাহা অতীব শোচনীয়। বালকবালিকার তরুণ হৃদয়ক্ষেত্র অতি সরস ও উর্ব্বর। যেরূপ বীজ তাহাতে বপন করা যায়, সেইরূপ ফসল তাহাতে ফলিয়া থাকে। সুতরাং বিধর্ম্মিগণের প্রদত্ত কুশিক্ষায় যে কত কুফল প্রসব করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কুশিক্ষা একবার লাভ হইলে তাহা ভুলাইয়া দেওয়া বা দূর করা, সুশিক্ষা প্রদান করা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। সুতরাং হিন্দুবালিকার হৃদয়-ক্ষেত্রে কোন কুশিক্ষার বীজ বা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধভাব যাহাতে কখনও না পড়ে, তজ্জন্য প্রত্যেক হিন্দু পিতামাতার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক; হিন্দুবালিকাগণের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের বাল্যকালোচিত যে সকল ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা আছে তাহা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলে, পরিপূর্ণ পাত্রে যেমন অপর কোন দ্রব্য ধরে না, সেইরূপ সুনীতি আদিতে পরিপূর্ণ হৃদয়ে অপর কুশিক্ষা স্থান পায় না। বালিকা বয়সের যে সকল ছোট ছোট ব্রতপূজাদি, সংযম ও উপবাসাদি শাস্ত্রে আছে, তাহার অভ্যাস ও পালন নিতান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রের ছোট ছোট বিধি নিষেধ আদিতে বালিকা বয়স হইতে সুঅভ্যস্ত থাকিলে, পরে বড় হইলে বড় বড় বিধিনিষেধে অশ্রদ্ধা বা অনাদর হইতে পায় না, ও সেই সব পালন করিবার সদিচ্ছা ও শক্তি আইসে; নতুবা হয় না। বালিকাই যৌবনে পত্নী ও প্রৌঢ়ে গৃহিণী হন। সুতরাং বালিকাবয়সের সুনীতি আদি শিক্ষার উপর ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। সুপত্নী ও সুগৃহিণী

কিসে হওয়া যায় তাহার সুশিক্ষা ও সুঅভ্যাস বাল্যকাল হইতেই না হইলে বা পাইলে,—সুপত্নী ও সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য কি তাহার শিক্ষা বা আদর্শ বালিকা বয়সে মনের মধ্যে—ধারণায়—ধরাইয়া না রাখিলে,—পরে ধরান কঠিন হয়। "এইটি করিতে নাই, করিলে পাপ ও দোষ হয়, ও অন্যায় ; অন্যায় কার্য্য জীবনে কখন করিতে নাই, ও যে করে তাহার সহিত কখন মিশিতে নাই"—এবং "এইটি করিতে হয় ও করিলে পুণ্য ও ভাল হয়, ও তাহা ন্যায্য ও কর্ত্তব্য, এবং ন্যায্য ও কর্ত্তব্য কার্য্য সারাজীবন করিতে হয়, ও যে সেরূপ করে তাহাকে সকলে সৎ বা ভাল বলে ও ভাল বাসে, ও সেইরূপ সৎচরিত্রই মিশিবার উপযুক্ত পাত্র"—এইরূপ ধারণা বা স্বভাবসকল বালিকাবয়সে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে নিশ্চয়ই সুফল ফলে ; তাহার অভাবে কুফল লাভই সুনিশ্চিত। "এ কার্য্য করিতে নাই কেন ?"—এরূপ তর্ক করাও অন্যায় ; শাস্ত্র বলিতেছেন বা গুরুজনগণ বলিতেছেন বলিয়া তাহা অবশ্য পালনীয়,—এইরূপে শাস্ত্রে ও গুরুজনবাক্যে অগাধ শ্রদ্ধা বাল্যকাল হইতে সৃষ্টি করিয়া রাখিতে পারিলে, তাহার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে সৎস্বভাব ও স্বধর্ম্ম ভক্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

বাল্যে ঐরূপ সৎশিক্ষার অভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দু যুবতীগণ—"এ করিলে কি হয় ? ও করিলে কি হয় ? এতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয় না !" ইত্যাদি বলিতে বলিতে ও শাস্ত্রনির্দ্দেশ সব উড়াইয়া দিয়া স্বেচ্ছাবশে চলিতে থাকেন, ও তাঁহাদের মহাভারতখানি আর কিছুতেই অশুদ্ধ হইতেছে

না,—এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিপথে চলিয়া থাকেন। কিন্তু সতীত্বের ব্যাঙ্কে ঐরূপ লেখা "চেক্" কাটিতে কাটিতে দেখা যায় যে, ঐ ব্যাঙ্ক তাঁহাদের লিখিত "চেকে" আর সম্মান দেখাইতে পারেন না, ও অসম্মানিত "চেক" ফিরাইয়া দেন; তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, সতীত্ব-ব্যাঙ্কে তাঁহাদের আর কপর্দ্দক মাত্রও জমা নাই, সব খরচ করিয়া ফেলিয়া দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন। তখন দেখেন যে, তাঁহাদিগের কল্পিত মহাভারত খানি সম্পূর্ণই অশুদ্ধ ও লোপ হইয়াছে। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোকে বলে "মহাভারত! মহাভারত!!" প্রকৃতই সতীত্ব সন্তানোপম দেবর ও দেবোপম লক্ষ্মণের প্রদত্ত সীতা দেবীর সেই গণ্ডি; তাহা হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইলেই—এক চুল বাহির হইলেই—সর্ব্বনাশ হয়।

"পতি পরম গুরু"—মাত্র চিরুণীতে এ লেখা পড়িয়া পতিকে পরমগুরু জ্ঞান করা যায় না, বা তদ্দারা প্রকৃত সতীত্বশিক্ষাও হয় না। ঐ লেখাযুক্ত চিরুণী মাথার চুলে আটকাইয়া রাখেন বটে, কিন্তু মাথার ভিতরে তাহার কোনই ধারণা রাখেন না; ঐ লেখা ধারণ করা হয় মাত্র, কিন্তু উহার শিক্ষা ধারণা করা হয় না। সেহেতু সন্তানের মঙ্গলকামনায় কোন জননী "ষষ্ঠী"র উপবাসদিনে যেমন ক্রোধে সেই সন্তানকে "মর মর" বলিয়া গালি দিয়া সেই ব্রতের নিয়ম পালন করেন, সেইরূপ "পতি পরম গুরু" লেখা মস্তকে ধারণ করিয়াও অনেকে বিপরীত ভাবে সতীধর্ম্ম বা ব্রত পালন করেন। সুতরাং ধর্ম্ম, ব্রত ও নিয়মাদি পালনের উদ্দেশ্য কি,—সেই শিক্ষা বালিকাজীবনে

মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রকৃত সুশিক্ষিতা করিলে, তবেই প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ হয়। কাম, ক্রোধ আদি শত্রু, ও কখনও তাহাদের বশীভূত হইতে নাই ও হইলে ঐ ব্রত নিয়মাদি সব নষ্ট হইয়া যায়, এই ধারণা দৃঢ়ভাবে বালিকাহৃদয়ে সৃষ্টি করিয়া দিতে হয়। সাত্ত্বিকতাই মহৎ গুণ, রাজসিকতা ও ও তামসিকতা বিশেষ দোষাবহ,—জীবনের প্রথম হইতেই যথা সম্ভব এ শিক্ষা দেওয়া উচিত; এবং যেরূপ আহারাদির দ্বারা ঐরূপ সত্ত্বগুণপ্রধান জীবন যাপন করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও বালিকাবয়স হইতেই করিতে হয়, ও তাহা করিলেই তাহার বিশেষ সুফলও ফলে। লিখিতে পড়িতে শিখানও শিক্ষা বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা ঐ সকল ধর্ম্মশিক্ষা বা সংনীতিআদি শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, ও তাহাই জীবনে অশেষ কল্যাণকর। অনেকে মনে করেন যে, লিখিতে ও বই পড়িতে ও বুঝিতে শিখিলেই অথবা স্মরণশক্তির প্রখরতা সৃষ্টিতেই শিক্ষা হইল, ও ক্রমে সেইরূপ শিক্ষিতা বালিকাগণ ভাল ভাল বহি পড়িয়া ক্রমে আপনারাই ঐ সকল নীতি শিক্ষা করিয়া লইবে। কিন্তু তাহা কোন জীবনে প্রকৃতপক্ষে হইতে প্রায় দেখা যায় না। সেই জন্য বালিকাবয়সে এমন ভাবে লেখাপড়া শিখান দরকার, যাহাতে পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র—মহাভারত ও রামায়ণ আদি—পড়িবার ও বুঝিবার শক্তি এবং তাহাতে ও হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ হয়।

গৃহকর্ম্ম ও রন্ধনাদিতে পটুতাও বালিকাবয়সের প্রধান শিক্ষা। কারণ "অগ্নি-ভীতা" রন্ধনে অপটু নারী, এবং স্নানার্থী

"শীত-ভীত" ব্রাহ্মণ—উভয়কেই অকর্ম্মণ্য বলা হয়। পাকা রাঁধুনী হওয়া পাকা গৃহিণীর প্রধান লক্ষণ। নতুবা রন্ধনে ও আহারে প্রকৃত শুচি বা সাত্বিক ভাব হিন্দুর সংসারে থাকিতে পারে না। অপবিত্র ব্যক্তির স্পর্শেই আহারের সমস্ত শুচি বা সাত্বিকতা নষ্ট হইযা যায়। সে জন্য "সে কালে" যাহার তাহার হাতের রান্না খাওয়া হইত না, যাহা তাহা খাওয়া হইত না, এবং অসতী নারীকে রন্ধনশালায় প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হইত না। তাহাতে হিন্দুজীবনে আহারের পবিত্রতা বা সাত্বিকতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইত। এক্ষণে আবার সেই পবিত্রতা বা সাত্বিকতা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে; সুতরাং সম্পূর্ণভাবে যাহাতে তাহা রক্ষা করা যায়, তাহার ব্যবস্থার জন্য বালিকা-বয়স হইতে রন্ধনশিক্ষা বিশেষভাবে দেওয়া উচিত। সাত্বিকতার আদর ও অসাত্বিকতার অনাদর জীবনের প্রথম হইতেই ভালরূপে শিক্ষা দিলে, শেষে তাহা অমৃতময় ফল দেখাইয়া থাকে। সে জন্য দেখা যায় যে, হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আদির মর্য্যাদাশিক্ষাসহ রন্ধন ও শিল্পকার্য্যাদিতে যে সকল বালিকা "মহাকালী পাঠশালা" বা ঐরূপ শ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা অনেক সংসারে সুনিপুণা আদর্শ গৃহিণী হইয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন; সে সব সংসারে তাই হিন্দুত্ব, সতীত্ব ও সাত্বিকতা প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

কিন্তু বিদ্যালয়ে বালিকার শিক্ষা না হইলেও চলে। এক্ষণে অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য বালকদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না-

করিলে চলে না ; কিন্তু বালিকাদিগকে সেই অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাদান করা ত প্রায় হয় না। অনেক বালক বিদ্যালয়ে গিয়া নানা কুসঙ্গে সেই অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে গিয়া মহা অনর্থকরী বিদ্যা শিখিয়া থাকে। বর্ত্তমান বিদ্যালয়সকল অনেক সময় কুসঙ্গের আবাস-স্থল দেখা যায়। সুশিক্ষা অপেক্ষা অতি অল্প বয়সেই কুসঙ্গে পড়িয়া যেরূপ কুশিক্ষা সব হইতেছে, তাহা দেখিয়া চক্ষুতে জল আসে। বালিকাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট বালিকা-বিদ্যালয়েও সেইরূপ অনেক প্রকার বিরুদ্ধচরিত্রের বালিকার আবির্ভাব হয়। সুতরাং বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ের সেই কুসঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়া—তথায় প্রেরণ না করিয়া—বাড়ীতেই যথেষ্ট সৎশিক্ষা বা বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

জননীর ন্যায় উত্তম শিক্ষক আর নাই। কথিত আছে যে, একজন জননী একশত শিক্ষকের অপেক্ষা অধিক। প্রকৃতই জননী নিজে কর্ত্তব্যবুদ্ধি-পরায়ণা হইলে ও সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিতা হইয়া নিজ কন্যাকে সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ সুশিক্ষিতা করিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না। এক্ষণে অনেক জননী আলস্য ও বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া—"মেয়েরা দুপুরবেলা বাড়িতে হুড়াহুড়ি করিয়া বড়ই জ্বালাতন করে"—এই হেতুতে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া আটক রাখার ব্যবস্থা করেন। ঐ আটক হইতে যে মেয়েদের ভিতরে কত টক রস আসে, তাহা দেখিয়াও দেখেন না, কারণ তাহা দেখিতে গেলে তাহাদের দুপুরবেলার অনেক রঙ্গরসের বা বিশ্রামের ব্যাঘাত পড়ে। সর্ব্বদা—দিবারাত্র—মা'র সঙ্গে থাকার যে অভ্যাস, ও মেয়েদের সঙ্গে

রাখার যে অভ্যাস, তাহা মাতা ও কন্যার উভয়তঃ যে কত হিতকর, তাহা বলা যায় না। তাহাতে মাতা ও কন্যার উভয়েরই —কত সংযম ও সুশিক্ষা হয়। আলস্যই এখন অনেক জননীর অতি প্রিয় বস্তু ; কিন্তু সয়তান যে অলস ব্যক্তির মস্তিষ্কে আপন কারখানা রচনা করিয়া কতই কুযন্ত্র—কুচক্র—সৃষ্টি করে, তাহা নিজেরাও বুঝেন না, বা কন্যাগণকেও সম্যক্ বুঝিতে দেন না। মাতা সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃতা থাকিলে ও কন্যাকেও সেই রূপ ব্যাপৃতা থাকার অভ্যাস করাইলে, সয়তানের প্রেরণায় অনেক কুকার্য্য হইতে—কুচিন্তা হইতে—যে রক্ষা পাইতে ও করিতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

একটি প্রবাদবাক্য এদেশে প্রচলিত আছে—"পিতা মাতা হয়ত সন্তানের পরম শত্রু, নতুবা পরম মিত্র।" অতি সূক্ষ্মভাবে এই কথাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহাতে যে কত সদুপদেশ নিহিত আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রথমেই নরনারী পিতামাতা হইবার উপযুক্ত গুণ ও বয়স না থাকা সত্বেও পিতা মাতা হইয়া রুগ্ন, দুর্ব্বল, কুচরিত্র দাসবংশ বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের ও সংসারের কত অহিত করেন, তাহা সূচিত হয়। সেরূপ সন্তানের জনকজননী হওয়া বিশেষ অন্যায়—এ জ্ঞান না থাকায় তাঁহারা সেরূপ সন্তানের জন্ম দ্বারা তাহাদের পরম শত্রুতা-সাধনই করিয়া থাকেন। সুসন্তান লাভ কিসে হয়, তাহা সম্যক্ জানিয়া সেরূপ সন্তান লাভ করিলে পিতামাতার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা হয় ; পরে ঐ সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি পরিমার্জ্জিত রাখা সম্বন্ধে উদাসীনতা ও অযত্ন দেখাইলে

পিতামাতাই সন্তানের পরম শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়া ধার্ম্মিক সন্তান উৎপাদন করত সে সন্তানের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম ও সুনীতির বীজ স্থাপন ও তাহার পরিপুষ্টি বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা ও সুব্যবস্থা করেন, তাঁহারাই —সেইরূপ জনকজননীই—সন্তানের প্রকৃত বন্ধু। পিতামাতা হইয়া শুধু অর্থব্যয় করিয়া সন্তানকে মাত্র বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেই সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষা দান করা হয় না, বা সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে অশেষ কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করাও হয় না।

জগৎপ্রসিদ্ধ পরম ধার্ম্মিক সলিমান রাজা লিখিয়াছেন—"বাল্যকালে সন্তানসন্ততিদিগকে এমন শিক্ষা দাও এবং এমন সৎপথ দেখাও, যেন বয়ঃস্থ হইলে তাহারা সে শিক্ষার ফল ভোগ করিতে পারে, এবং জনকজননীর প্রদর্শিত সৎপথ ছাড়িয়া কদাপি অন্য পথে না যায়; এবিষয়ে অশ্রদ্ধা ও শৈথিল্যভাব প্রকাশ করিয়া যে পিতামাতা ঐ বালকবালিকাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেন, ঐ বালকবালিকারা তাঁহাদিগের লজ্জার ও নিন্দার সোপান হইয়া উঠে।"

লিখিতে পড়িতে (বা নাটক নভেল ও প্রেমপত্র লিখিতে পড়িতে) না শিখিলে প্রকৃত শিক্ষা বা ধর্ম্মশিক্ষা হয় না, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাহারা মহাভ্রান্ত। অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে রমণীগণ এত লেখাপড়ার কিছুই জানিতেন না সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম-শিক্ষায় তাঁহারা সুশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া অনায়াসে ভবনদী-পারের ব্যবস্থা তাঁহাদিগের করতলগত ছিল। শুধু পাণ্ডিত্যে ও আধুনিক বিদ্যায় এ ভবনদী পার হওয়া যায় না। বেদ-

বেদান্ত না জানিলেও ধর্ম্মশিক্ষার সাঁতার মাত্র জানিলেই এ ভবনদী পার হওয়া যায়।

এখন বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাও অদ্ভুত। "গরুর উদরে নয়টি প্রকোষ্ঠ আছে"—এই বিজ্ঞানপাঠ শিক্ষার স্থলে, যদ্যপি গো-সেবা একটী পরম ধর্ম্ম,—এই শিক্ষা দিয়া বালিকাদিগকে গো-সেবায় রত করিবার শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে গো-সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষা হয়। তখন গো-সেবা দ্বারা "দুহিতা" নাম অর্জ্জন হইয়াছিল। এখন সেরূপ দুহিতা আবার সৃষ্টি হইলে, গো-সেবার ভয়ে গো-পালনে বিরতি বন্ধ হইয়া অনেক সুফল ফলে।

পূর্ব্বে "সুশীলার উপাখ্যান" আদির ন্যায় যে সকল অমূল্য গ্রন্থ স্ত্রীপাঠ্য ছিল, এখন আর সেরূপ সুন্দর গ্রন্থের আদর দেখা যায় না। তাহার ফলও তদ্রূপ মন্দ হইতেছে।

অধুনা পিতামাতা কন্যাদিগকে অধিক শিক্ষিতা না করিয়া যদি কেবলমাত্র পঞ্জিকা দেখিয়া কার্য্য করিবার মাত্র শিক্ষা দিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় আপাততঃ উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দুরমণীগণ যদি পঞ্জিকার শিক্ষামত দিন দেখিয়া দেখিয়া তাহার বিধিনিষেধগুলি পালন করিয়া আহারবিহারে প্রকৃত সংযম শিক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলেই বোধহয় তাঁহাদিগকে এখনকার পক্ষে যথেষ্ট সুশিক্ষিতা বলা যাইতে পারে। সংযমই শিক্ষার লক্ষণ; অসংযতা কখনই শিক্ষিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। অন্য কোন শিক্ষা না হইলেও, যদি কেবলমাত্র সংযম শিক্ষা হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে যথেষ্ট শিক্ষিতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

সতীত্ব।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা ও বিভিন্ন অভিরুচি দেখিলে বর্ত্তমান কালে হিন্দুবালিকার শিক্ষা যে অতি কঠিন ও জটিল প্রশ্ন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমি হিন্দু, আমি আমার কন্যাটিকে (টি নহে, গুলিকে) কত যত্নে ও আদরে হিন্দুধর্ম্ম-মতে সাত্ত্বিক আহারে অভ্যস্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও রীতিনীতি অনুসারে লজ্জা সরম রন্ধনাদি কার্য্য সব শিখাইলাম,—রামায়ণ মহাভারত আদি পাঠ করিবার উপযুক্ত বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখাইলাম, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইবার প্রধান কারণ যে ইংরাজী লেখাপড়া, তাহা না শিখাইয়া ভাবী কালে যাহাতে কর্ত্তব্যপরায়ণা ও ধার্ম্মিকা হিন্দুস্ত্রী হয়, তাহার যোগ্য শিক্ষা দিলাম। কিন্তু মেয়ে পরের জিনিষ, তাহাকে পরের ঘরে দিতেই হইবে। সুতরাং সেই পরের ঘরে তাঁহারা কিরূপ শিক্ষার আদর করেন, তাহা বুঝিয়া না চলিলেই আমার মহাবিপদ। যে "লজ্জা সরম, ধরম করম" আমি হিন্দুপিতা, কন্যার পিতা হইয়া এত যত্নে ও কষ্টে শিখাইলাম, পরে দেখি যে, সমাজ সেই "লজ্জা সরম ধরম করমের" মস্তকে পদাঘাত করিতে বা তাহা চর্ব্বণ করিতে যে সকল মেয়ে শিখিয়াছে, তাহাদিগকেই পছন্দ করিয়া লইতেছেন, আমার মেয়ে আধুনিক সভ্যতায় অগ্রসর নহে ও পিছাইয়া রহিয়াছে জ্ঞান করিয়া কেহ তাহাকে পছন্দই করিতেছেন না। পাত্রী দেখিয়া পছন্দ করিতে যিনি আসিয়াছেন, তিনি যেন কোন থিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয়, তাঁহার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য নটী খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। আমার মেয়ে নাচিতে গাহিতে ও হার্ম্মোনিয়ম আদি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করা

হইল। আমি ত ঐ সব ব্যাপার নির্লজ্জতার চরম বলিয়া সেইরূপ সব কুশিক্ষা কন্যাকে দিই নাই। সুতরাং আমার কন্যাকে পছন্দ হইল না। এইরূপ কত অদ্ভুত ও বিসদৃশ ও বিষময় অভিরুচি এখন সমাজে দেখা যাইতেছে। আমি হিন্দু, সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ—এই জ্ঞানে তাহার উৎকর্ষ কন্যায় ফলাইলাম; তুমি ঘোর তমোগুণী বা রজোগুণী পাত্রের পিতা, তাহা একেবারেই অপছন্দ করিলে। তাহা হইলে উপায় কি? সুতরাং পূর্ব্ববৎ সামাজিক রুচি শাস্ত্রসঙ্গতভাবে এক না হইলে, হিন্দু বালিকার শিক্ষা এখন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার মীমাংসা হওয়া অতীব কঠিন ব্যাপার, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি যাহাকে সতীত্ব বা গুণ বলিয়া জানি, তুমি তাহাকে অসতীত্ব বা দোষ বলিয়া জানিলে, এবং আমি যাহাকে অসতীত্ব বা দোষ বলিয়া জানি, তুমি তাহাকেই সতীত্ব বা গুণ বলিয়া জানিলে, কিরূপে পরস্পরের কন্যাকে "সতীধর্ম্ম" শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? সুতরাং সতীধর্ম্মকে আবার সর্ব্ববাদিসম্মত করিতে না পারিলে, হিন্দু বালিকাকন্যার শিক্ষা অতিশয় জটিল প্রশ্ন, ও তাহার সমাধান হওয়া অসম্ভব।

সাত্ত্বিকতাই নারীজীবনে সতীত্ব ও ধর্ম্মজীবনলাভের ভিত্তিস্বরূপ। আমি কন্যার পিতা হইয়া সেই ভিত্তি পত্তন করিলাম, আর তুমি পাত্রের পিতা সেই ভিত্তি সমূলে উৎপাটন করিবার ব্যবস্থা করিলে, হিন্দু-সমাজ ভিত্তিহীন হইয়া যায় না কি? যে বিলাসিতা ব্যভিচারের জননী কাম-রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য আমি কন্যার পিতা তাহাকে সেইরূপ নানা প্রকার

ধর্ম্মশিক্ষা দিলাম, তুমি পাত্রের পিতা সেই রাক্ষসীর পরম ভক্ত, সেবক ও পূজক হইয়া আমার সেই কন্যাটীকে সেই রাক্ষসীর মুখে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিবে। ইহাতে হিন্দুসমাজ চলিবে কিরূপে ও কন্যার পিতামাতার পক্ষে কন্যার শিক্ষাপ্রণালী কিরূপে সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইবে? সেহেতু বর্ত্তমান অবস্থায় কন্যাকে সুশিক্ষা দিব কিম্বা কুশিক্ষা দিব, ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হিন্দুসমাজের এ অধঃপতনের বেগ কবে কম পড়িবে বা দূর হইবে, এবং কবে আবার প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। তবে সাত্ত্বিকতাই যে প্রকৃত উন্নতির ও সুখের মূল, ও সেই শিক্ষাই বালক-বালিকাদিগের প্রকৃত শিক্ষা ইহাতে সন্দেহ নাই; কারণ উহা শাস্ত্রসম্মত।

অধুনা সমাজের এক প্রকার "ধনুকভাঙ্গা পণ" প্রথার কল্যাণে,—স্বর্ণ রজত গলাইয়া নদী প্রবাহিত না করিতে পারিলে কন্যার বিবাহ অসম্ভব হেতু, নাবালিকা অবস্থায় সে বিবাহ প্রায় ঘটে না। বাল্যের উষাকাল অন্তে প্রথম যৌবনউদ্গম-রূপ তরুণ-অরুণ-উদয়ে নারী-হৃদয় তাহার সুচারু আভায় প্রথম রঞ্জিত হইবার কাল,—জীবন-সাগরের কূলে প্রথম উপনীত হইয়া ভাব-তরঙ্গ-ভঙ্গি প্রথম অবলোকন ও তাহার প্রথম আঘাত অনুভবের কাল,—নারী-জীবনের বাল্য ও যৌবনের এই সন্ধিস্থল; তাহা অতি প্রলোভনের কাল; সেই হেতু তাহা অতিশয় সতর্কতা অবলম্বনের কাল। সে সময়ে কন্যাকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে—"চোখে চোখে"—রাখিয়া তাহার পরিচালনা করিয়া সৎচরিত্র গঠিত করার ভার জননীর উপর। ঐ ভার যে জননী

যত ভালরূপে গ্রহণ করিয়া আপন কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দেন, ততই মঙ্গলকর হয়। বিপরীতে বহু অমঙ্গলের সম্ভাবনা হয়। মন্মথের প্রথম ফুলশরসন্ধান হইতে কন্যাকে রক্ষা করা অতি সতর্ক প্রহরীর কার্য্য; মাতা ঐ প্রহরী হইলে আর বড় ভয় থাকে না। সেহেতু কন্যার মাতার কিরূপ ভীষণ দায়িত্ব, তাহা আর বলিবার কথা নহে। গৃহিণীর—জননীর সে দায়িত্বজ্ঞান না থাকিলে, গৃহে গৃহে "বিদ্যাসুন্দর" অভিনয় হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চভাবের সমাবেশ সুপত্নীতে দেখা যায়। বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা না দিলে ও পাইলে, ঐ সকলের সম্যক্ স্ফুরণ সম্ভবপর নহে।

মেয়েরাই পরে মা হইবেন। সুতরাং মা'র সব গুণ যাহাতে পান, তাহাই দেখা ও করা কর্ত্তব্য। "মাসী"র দোষ পাইয়া যাহাতে পরে "ফাঁসীর কারণ" না হন, সে সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাল্যকাল হইতে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

একটি উদ্ভট শ্লোকে আছে—

"একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া।
পুত্রাপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ॥
শেষঃ শয্যা জলধি-শয়নং বাহনং পন্নগারিঃ।
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥"

অর্থাৎ—"মুরারি—জগন্নাথ—তাঁহার নিজ গৃহের রকম ও ব্যবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া কাষ্ঠময় বা "আকাট" হইয়া গিয়াছেন;—গৃহে দুই স্ত্রী, একজন সরস্বতী, প্রকৃতিমুখরা; দ্বিতীয়া লক্ষ্মী, চঞ্চলা। একটীমাত্র পুত্র মদন, তিনি ভুবনবিজয়ী ও দুর্নিবার।

ক্ষীরোদ সাগরে অনন্ত নাগে শয্যা, ও তাঁহার বাহনটি সর্পভুক্ গরুড়।"

কাম-জনক জগন্নাথদেবের ঐ ত্রিভুবনবিজয়ী পরম অশান্ত দুর্নিবার পুত্র মন্মথটিকে শাসন করার যেন তাঁহার হাত পা নাই। সেহেতু জনকের অপেক্ষা তনয়ের প্রতাপ ও প্রকোপ যেন বেশী, ও তাহাতেই যেন বসুন্ধরা মহাভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় আপনাকে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই দুর্নিবার পুত্র রতিপতি বড়ই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম। ত্রিলোচন উঁহার জ্বালাতনে জ্বলিয়া উঁহাকে জ্বালাইয়া দগ্ধ করিয়া—একবার সে আপদ্ বালাই দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু যদি তাহার পর তাহার স্ত্রী রতির বিলাপ-অশ্রুতে ভোলানাথ না ভিজিতেন ও অনঙ্গ অবস্থায় তাহার আবার প্রাণ দান না করিতেন, তবে আজ এ সংসারের এত অনিষ্ট ঘটিত না, এবং তাঁহার রাজধানী স্বর্ণপুরী—তীর্থ-রাণী—বারাণসীকেও আজ এত পাপ-ভার বহিতে ও সহিতে হইত না।

মহাপ্রভাব অবিদ্যার খেলায় ঐ দম্পতি রতিমদন প্রধান খেলোয়াড়। তাহাদের অদ্ভুত খেলায় এ জগৎ মোহিত, আচ্ছন্ন, উন্মত্ত, অন্ধ। কামান্ধই মোহান্ধ ও মহান্ধ। কামানল দুষ্পূর, দুষ্প্রধর্ষ, সর্ব্বনাশী; ও তাহা প্রকৃতই কৃষ্ণ-বর্ত্ম।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় (৭ অধ্যায়, ১৪ শ্লোকে) বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" অর্থাৎ—

সত্ত্বাদি গুণময়ী আমার দৈবীমায়া বা শক্তি নিশ্চয়ই দুস্তরা; (কিন্তু) যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারাই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।"

সুতরাং এই ভীষণ মায়ার খেলা, মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কিরূপে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার ভজনা দ্বারা আত্মরক্ষা ও আত্মলাভ করিতে হয়, জনকজননী নিজেরা তাহা শিখিয়া সন্তানগণকেও সেই শিক্ষা দিয়া তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত এবং ইহাই শিক্ষার সার।

নারী-অঙ্গাদি "মিথ্যা-মায়া-মোহাবেশ,"—তাহারা "মাত্র মাংসবসাদি-বিকার,"—মনে মনে বারম্বার এই বিচার করা, এবং "ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং" বলিয়া সেই অভয় শ্রীপদের ভজনা, স্মরণ ও শরণগ্রহণ করাই তাঁহার সেই দুর্নিবার পুত্রের হস্ত হইতে,—মায়ার হস্ত হইতে—রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। "ডুকৃঞ করণে"—অর্থাৎ ব্যাকরণ বা লেখাপড়া শিক্ষায় বা শুধু পাণ্ডিত্যে উহা হইতে—মরণ হইতে—রক্ষা পাওয়া যায় না। ঐরূপে ভগবানের শরণাগতি লাভ দ্বারা আত্মরক্ষার—সতীত্বরক্ষার,—সর্ব্বস্বরক্ষার—শিক্ষাদানই অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষাদানই পরম শিক্ষাদান, ও সেই শিক্ষায় যে পিতামাতা পুত্রকন্যাকে রীতিমত শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহাই যে সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোত্তম শিক্ষা, ইহাতে সন্দেহ নাই।

"অদ্বৈত—চৈতন্য—নিত্যানন্দ"। যেখানে অদ্বৈত গোস্বামী,

সেই খানেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, ও সেই খানেই নিত্যানন্দ গোস্বামী; অর্থাৎ যাঁহার "ভগবান এক" বা "আমিই সেই" এই অদ্বৈত জ্ঞানলাভ হয়, তিনিই চৈতন্য লাভ করেন ও নিত্য আনন্দে বা নিত্যানন্দে থাকেন। সেইরূপ যে সতী নারী স্বামীর সম্বন্ধে অদ্বৈতজ্ঞান বা "স্বামিরূপ ভগবান্ এক," বা "আমি ও আমার স্বামী এক, পৃথকত্ব নাই"—এইরূপ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারই প্রকৃত চৈতন্য উদয় হয়, এবং তিনিই নিত্যানন্দ লাভ করেন, সদানন্দে থাকেন। এই জ্ঞান, চৈতন্য ও আনন্দ লাভই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার ফল। ঐরূপ ধর্ম্মশিক্ষাই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা; সেই শিক্ষার অমোঘ বীজ কন্যার হৃদয়ে বপন করিয়া তাহাকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা করিলে, যথাকালে তাহার সুফল প্রসব করিবেই। নিত্যানন্দে কন্যার হৃদয় পূর্ণ থাকিবে, ও যিনি যে কন্যার সম্পর্কে আসিবেন, তিনিই সেই বিমল আনন্দের অংশ পাইবেন।

স্বামী ও স্ত্রী "এক"—এই জ্ঞান হইলে, উভয়ের জীবন একই নিক্তির দুই পাল্লার মত বোধ হইবে; এবং উভয়ের মনরূপ এক নীচের কাঁটা, উপরের কাঁটা সেই ভগবানের সহিত ঠিক এক হইয়া থাকিবে। পাল্লার দুই দিকের কোন দিক্‌কে হাল্কা বা ভারি হইতে দিবে না। উভয় জীবনই অমৃতময় হইয়া থাকিবে। বাল্যে সে শিক্ষার আভাস পাইলে তবেই তাহার ফল হয়। ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল বৃদ্ধ বয়সের জন্য,—এই জ্ঞানে বাল্য ও যৌবন বৃথা কাটাইলে, অনেক জীবনে বৃদ্ধবয়স আসেও না, বা আসিলেও তখন কোন সুকার্য্য বা ধর্ম্মকর্ম্ম করার শক্তি ও ইচ্ছা থাকেও না।

সু-অভ্যাসের শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই না হইলে, আর প্রায়ই হয় না দেখা যায়। ধর্ম্মশিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা; ধার্ম্মিক মূর্খও অধার্ম্মিক পণ্ডিতের চেয়ে শতগুণে ভাল। ধর্ম্ম অর্থে যাহা সকল মনুষ্যকে পোষণ করে ও শোষণ করে না। যাহা পোষণ করে তাহাই ধর্ম্ম বা পুণ্য, এবং যাহা শোষণ করে তাহাই অধর্ম্ম বা পাপ। অভিধানমতে ধর্ম্ম অর্থে—সৎ সঙ্গ। দীপিকামতে—পুরুষের বিহিত ক্রিয়াসাধ্য গুণকে ধর্ম্ম বলে। ভারতমতে—ধর্ম্মের লক্ষণ অহিংসা। পুরাণমতে—যাহাদ্বারা লোক স্থিতি-বিহিত হয় তাহার নাম ধর্ম্ম। যুক্তিবাদ মতে—বেদবিধান অনুসারে মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহার সম্পাদন করাকে ধর্ম্ম বলে। জ্ঞানবাদমতে—মনের যে প্রবৃত্তির দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। সেহেতু যাহা অবলম্বনে জীবন ধারণ করা যায় বা যাহা জীবনকে বা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম।

লেখাপড়া শিখিয়াও মহামূর্খ হয়, আবার কিছুই লেখা পড়া না শিখিয়াও ধর্ম্ম-বলে মহাপণ্ডিত হওয়া যায়। নারীর ধর্ম্ম সতী-ধর্ম্ম; সতীত্বই নারীর স্বধর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় (তৃতীয় অধ্যায়, ৩৫ শ্লোকে) বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্থাৎ—সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তির নিধন ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম অতি ভয়ের বস্তু। হিন্দুনারীর সেই স্বধর্ম্ম ভুল হইয়া—ভগবান্ ভুল হইয়া,—আজ আনন্দময়ীর রূপ হইয়াও হিন্দুনারীর এত আনন্দের

অভাব! প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে তাই আজ সাহারা মরুভূমি দেখা যাইতেছে। ধর্ম্মের সহিত কোনও সম্পর্ক না রাখায়,—ভগবানের সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখায়,—আজ কত সংসার উৎসন্ন যাইতেছে,—"কত সাজানো বাগান শুকাইয়া যাইতেছে।" কত কেরোসিন তৈল ও দিয়াশলাই সাহায্যে জ্বলিয়া জ্বালা অবসানের পথ মুক্ত হইতেছে। তত সাহস না থাকিলে কত নারী "মরিলেই বাঁচি"—এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে দিন গণিয়া সেই শেষ দিনের প্রতীক্ষায় বহিয়াছেন। ধর্ম্মহীনতাই এই আনন্দহীনতার—এত নিরানন্দরূপ বহ্নি সৃষ্টির কারণ। যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়, সেখানেই বিমল আনন্দ, চির আনন্দ—চির শান্তি। তাই হিন্দু বালিকাগণকে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা সেই আনন্দ পাইবার অধিকারিণী করিবার ব্যবস্থাই যে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

— —

সতীত্ব।

৬। জগতে ইহার মহিমা, মূল্য বা সারবত্তা।

ভারত-আকরে যেরূপ সতীত্ব-রত্নের উদ্ভব হয়, সেরূপ রত্ন আর কোন দেশে দৃষ্টিগোচর হয় না। সে রত্ন চিনিবার ও তাহার মূল্য নিরূপণ করিবার উপযুক্ত জহুরিও অন্য কোন দেশে নাই। যাহার যেমন পুঁজি, সে এ রত্নের সেরূপ দাম দিতে চাহে। সেজন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে "বেগুনওয়ালা" "কাপড়-ওয়ালা"র ন্যায় এ রত্নের দর উঠে। কিন্তু হিন্দুগণই এ রত্ন চিনিবার প্রকৃত জহুরি; সেই জন্যই তাঁহারা এ রত্ন অমূল্য বলিয়া জগতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। অর্থের বিনিময়ে এ মহার্ঘ রত্ন লাভ করা যায় না। এ নিধির তুলনা নাই। ভারতবর্ষ জাগতিক ব্যাপারে এখন দরিদ্র হইতে পারে, কিন্তু সামান্য ধনের দারিদ্র্য ভারতে পাপ বলিয়া পূর্ব্বে বিবেচিত হইত না। আর্য্যস্ত্রীগণ সহাস্যবদনে আর্থিক দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইতেন; কিন্তু তাঁহারা এই দুর্লভ, অমূল্য সতীত্ব-নিধি ধারণ করিয়া রাজরাজেশ্বরী অপেক্ষাও অধিক আদর ও সম্মান পাইতেন। অনর্থনিদান অর্থের আদর পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে এদেশে আসিয়া পড়ায়, সেই সামান্য অকিঞ্চিৎকর অর্থ-মোহে এই সার সতীত্ব-রত্নকেও বিসর্জ্জন দিতে দেখা যায়! ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশে অর্থই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অপেক্ষা উচ্চ আসন পায়। ঐ সকল ইহকালসর্ব্বস্ব দেশে দারিদ্র্য

এক মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। সেখানে অর্থের আধিক্যের অনুপাতে লর্ড, ব্যারণ আদি জাতিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে, ও সে সকল ধনগত-জাতিভেদ-সংস্কার এদেশের জাতিভেদের রূপান্তর মাত্র। অর্থই তথায় সর্ব্বস্ব, সারধন। তাহার সহিত তুলনায় আর কিছুই সেরূপ সার নহে।

প্রায় একশতাব্দী পূর্ব্বে সিড্‌নি স্মিথ বলিয়াছিলেন—"Poverty is regarded as infamous" অর্থাৎ ইংলণ্ডে দারিদ্র্য মহাপাপ ও গৌরবহানিকর বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ধনসম্পত্তি তথায় সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও গৌরবরক্ষাকারী। ধন-গৌরবই সে দেশের জীবনী-শক্তি। সেই ধনের আদর সেখানে এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, রাজনৈতিক জগতে দিগ্‌গজগণের বিবেকও অর্থের দ্বারা ক্রয় করিতে পারা যায়—বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। অসংযম ও বিলাসের স্রোতে ভাসমানা নারীর বিবেক থাকিলে তাহা, বা তাহার দেহ মন আদি ক্রয় করা তাই সে দেশে এত সহজ, ও সতীধর্ম্মের তথায় এত অনাদর। অর্থ-সমাগমের পথ প্রশস্ত করার জন্য ও পদোন্নতির জন্য সে দেশে অনেকে নিজস্ত্রীকে পর্য্যন্ত উপরিস্থ কর্ম্মচারীর সন্তোষ সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করার উদাহরণ বড় বিরল নহে, এবং ঐরূপ সব আচরণ অন্যায় বলিয়াও বিবেচিত হয় না। ধন্য ধন-পূজা! ধন্য সতীত্বের ও মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা !!

প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশের রাজধানী লণ্ডন নগরে উচ্চকুলোদ্ভবা ইংরাজ মহিলাকুলের এক নারী-সমিতি বা সভায় হিন্দুসমাজসংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত

উমেদরাম লালভাই দেশাই নামক জনৈক মারহাট্টা ব্রাহ্মণ-যুবক নিমন্ত্রিত হন। তিনি ঐ সভায় বক্তৃতাকালে সে দেশের ও এদেশের নারী-চরিত্র ও সামাজিক চিত্র বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তুলনা করিয়া যে সকল অপ্রিয় সত্যকথায় তাঁহাদিগের চৈতন্য সমুৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে অনেক রকম শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার সেই বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ধিক্ ধিক্ শত ধিক্, এই সমৃদ্ধিশালিনী সভ্যতাভিমানিনী ইংলণ্ড ভূমিকে—যে ইংলণ্ডে দৈনিক উদরান্ন উপার্জ্জনের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে হামার বা হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে প্রাণান্ত হইতে হয়।"

"এই ঘৃণিত অপমানিত দারুণ দুঃখদারিদ্র্যের ফলও হইতেছে —হায়! অতি শোচনীয়! ব্যভিচারে বিলাত প্লাবিত হইতেছে। জীবিকানির্ব্বাহের মর্ম্মান্তিক দুর্গতি সহ্য করিতে না পারিয়া অসংখ্য রমণী আধটুকরা রুটির জন্য শরীরের পবিত্রতা পথে পথে বিক্রয় করিতেছে। অমূল্য সতীত্ব-রত্ন ব্যভিচারের অতলস্পর্শ পাপ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া বাজারে বাজারে বেশ্যাবৃত্তির স্রোত প্রখর হইতে প্রখরতর করিতেছে। হায়! প্রতিমুহূর্ত্তে কতই রমণী আশ্রয়ের অভাবে, জঠরানলের দুঃসহ দহনে ঐ পূতিগন্ধময় স্রোতে আজন্মের জন্য দলে দলে ঝাঁপ দিতেছে। ঐ দেখ অগণিত গণিকায় তোমাদের "পিকাডিলি" "চারিংক্রশ" (কোন্ স্থানই বা নয়?)", পূর্ণ প্লাবিত! রজনীর নিশীথ সময় পর্য্যন্তও তোমাদের সভ্য (?) সমাজসৃষ্ট পথিনীরা শরীরবিনিময়ে এক গ্রাস আহার্য্য উপার্জ্জনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ধিক্ এই

জাতিকে, ধিক্ ইহাদের জাতীয় জীবনকে! ধিক্ ইহাদের সাম্য, স্বাধীনতা, সভ্যতাকে! ছি! ছি! কি লজ্জা! কি ঘৃণা! নারী-জাতির কি দুর্গতি! হে লণ্ডন! তোমার বক্ষের উপর! ধিক্ তোমার জীবনকে, ধিক্ তোমার সমাজকে।"

"আমি নিঃসন্দেহেই বলিতেছি যে, এই ইউরোপভূমিতে এক প্রকারের ভ্রূণহত্যা বিশেষরূপে প্রচলিত আছে, যাহা এতদ্দেশীয় আইন দ্বারা আদৌ শাসিত হয় না।" (এই সময় শ্রোতৃমণ্ডলী বলিয়া উঠিলেন—"মহালজ্জা! মহাপাপ!!)

"হাঁ মহাপাপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ইহা আপনাদের আইন অনুমোদিত মহাপাতক। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের আর একটি অনিষ্টের বিষয় আর অধিক উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সে অনিষ্টটা ত মহা অনিষ্ট। হাঁসপাতালের কার্য্য উপলক্ষে আমি সর্ব্বদাই দেখিয়া থাকি যে, এই স্বাধীনদেশের সুসভ্যা সুন্দরীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব শরীরের অতীব কোমল আভ্যন্তরিক অংশে এমন ভয়াবহ অনিষ্ট সংসাধন করেন যে তাহা বলিবার নয়। যদি এমন পৈশাচিক ব্যাপার আপনাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আইন দ্বারা যেরূপ অনুমোদিত হইতেছে এইরূপ আরও কিছুকাল হয়, তাহা হইলে আমি দিব্যচক্ষুতে দেখিতেছি যে, আপনাদের এই ইংলণ্ডভূমি প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রেত-ভূমিতে পরিণত হইবে। ইহা আর মনুষ্যজাতির বাস-ভূমির যোগ্য থাকিবে না। এবংবিধ বিসদৃশ ব্যভিচার দ্বারা আপনাদের স্ত্রীজাতির শারীরিক সৌন্দর্য্য ধ্বংস হইবে, এবং আপনাদের পুরুষদিগের বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে লোপ পাইবে।"

আপনাদের এই সকল গির্জ্জাগৃহের তামাসা ও বিবাহপদ্ধতির বিদ্রূপ এখনকার এই জারজতা হইতে আরও অধিকতর জারজত্ব প্রাপ্ত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

"আসল কথাটা এই যে, হিন্দুসমাজ অতি কঠোর ধর্ম্মনীতি দ্বারা সুশাসিত। ধর্ম্মনীতির অবতার ব্রাহ্মণের হস্তে সমাজের শাসনভার। বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমার স্বদেশে সদাচার এতাদৃশ দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা হিন্দুসমাজের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যে সকল বিপদ্ আপনারা 'কুইনাইনপেসারী' বা 'রবার পিচকারী'র দ্বারা নিবারণ করেন, তাহা আমাদের দেশে নিবারিত হয় আত্মসংযম ও উপবাসাদি দ্বারা। আমি ভরসা করি আপনারা স্বীকার করিবেন যে, আত্মসংযম লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ উভয় দিকেই শ্রেষ্ঠ"। (ধন্যবাদ)

"হিন্দুনারী একবারের অধিক এবং একের অধিক কদাচ বিবাহ করেন না। আমাদের পুরুষগণও প্রায়শঃ একপত্নীক। হিন্দুমহিলা, ইংরাজ মহিলা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসভাজন; পরন্তু আমাদের পুরুষগণও অধিকতর ধর্ম্মপরায়ণ। আমরা 'প্রেম' বিষয়ে বেশী লেখাপড়া বা বলাকহা করিনা; কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা তাহার সাধন করিয়া থাকি। আমরা অবশ্য অতি গরিব, আমাদের গৃহস্থালীতে নানা অভাব; কিন্তু আন্তরিক স্নেহ মমতায় ও মিষ্টকথায় সব অভাব পূরণ করিয়া থাকি; সেই জন্যই হিন্দুসংসার স্বর্গবিশেষ। তা আমরা যে বড় গরিব হইয়া পড়িয়াছি, সে গৌরবটা আমাদের ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টেরই বটে।"

"আপনারা দাস-দাসী-বৃত্তিকে বড়ই ঘৃণা করেন। ঘৃণা-করাই উচিত ; কিন্তু আপনাদের দেশীয় অবিবাহিতাগণ ক্রীতদাসী অপেক্ষাও অধীন এবং ক্লেশকর জীবন বহন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে আপনাদের বিবাহিতাগণ বেজায় রকম বিলাসিনী হয়। আমাদের দেশে কিন্তু তাহা নয়। আমাদের স্ত্রীগণ দাসীও নহেন, বিলাসীও নহেন ; তাহারা প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। তাঁহারা আদরের, আত্মসংযমের ও অনাকাঙ্ক্ষার অবতার। তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষুধায় অন্ন ও তৃষ্ণায় বারি প্রদান করেন, জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করেন। আমরা মাসিক দশ টাকা আয়েও বৃহৎ সংসার চালাইয়া থাকি। কিন্তু ইংরাজ কদাচ তাহা পারে না। ইহার কারণ কি ? কারণ এই যে, আমাদের গৃহ-কর্ত্রীগণ লক্ষ্মী-রূপা ; আত্মসংযমে একান্ত অভ্যস্তা। তাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করিতে জানেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা সতীসাধ্বী স্নেহশীলা প্রেমিকা, ধর্ম্মপরায়ণা। হিন্দুস্ত্রী ঘৃণিতা, পদদলিতা নহেন ; তাঁহারা সংসারে সর্ব্বে-সর্ব্বময়ী ; তাঁহারা শ্রদ্ধা ও সম্মানের আস্পদ ; তাঁহারা পতির একান্ত প্রাণেশ্বরী। রমণী হিন্দুর নিকট দেবী ; স্ত্রীলোকের প্রতি একটি তৃণ উত্থিত করাও হিন্দুর পক্ষে মহাপাতক। ইহাতেই আপনারা বুঝিয়া লউন কি প্রকার মাননীয়-পদাভিষিক্তা। না জানিয়া, না শুনিয়া তাঁহাদিগকে পদদলিতা মনে করা, ছি, ছি, আপনাদের মহা ভ্রম।"

"এখনও বিধবা ও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একটা কথা। তা বেশ, কুমারী যখন একান্তই না পাওয়া যাইবে, তখন না হয় আমরা বিধবা-বিবাহ করিব। কিন্তু আগে-ভাগে কদাচ উচ্ছিষ্ট ভোজন করিব না।"

তৎপরে বক্তা বিধবাদিগের ও সহমরণের কথা সুচারুরূপে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতা শেষ হইলে রাজকুমারী ইয়ুজিন তাঁহার অনেক প্রশংসাবাদ করিয়া সকলে প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

বিলাতী বিলাসিনীগণ নানাপ্রকার অবৈধ ও অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বনে দিবারাত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ ও কণ্ডূয়ননিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত। সেরূপ জীবন মনুষ্যজীবন নহে; তাহা পশুজীবনেরও অধম, কারণ পশুদিগেরও সঙ্গমের কালাকাল আছে। নারীজাতি মাতৃজাতি; মাতৃত্বেই নারীত্ব, এবং সতীত্বেই মাতৃত্বের পবিত্রতা ও নারীজীবনের বিশুদ্ধি। কিন্তু বিলাস ও ব্যভিচারে উন্মত্ত হইয়া নারীজীবনে সতীত্ব যে কিরূপ সর্ব্ববিধ শুভপ্রদ ও কত আদরণীয়, তাহা যে কি স্বর্গীয় বস্তু, তাহার ধারণা করিবার শক্তি ঐরূপ দারুণ ইন্দ্রিয়পরায়ণা ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিতা বিলাসিনীদিগের নাই ও থাকিতেও পারেনা। হিন্দুর সতীজীবন স্বর্গের সমান; তাহার সহিত তুলনায় ঐরূপ নারী-জীবন নরক অপেক্ষাও ঘৃণ্য।

যাহারা নারকীয় জীবন যাপন করে, তাহারা নরককে নরক বলিয়া ঘৃণা ও ত্যাগ করিতে পারে না; কিন্তু যিনি জীবনে পবিত্রতাকে সমাদর করেন, তাঁহার নিকট অপবিত্র জীবন নরক বলিয়া ঘৃণ্য ও ত্যাজ্য। তাই ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজকবি সেলি (Shelly) নরকবর্ণনায় বলিয়াছেন—"নরক এই লণ্ডনের প্রায় সমান একটি সহর।" ইংলণ্ডদেশে বেশ্যাবৃত্তি আইন দ্বারা অনুমোদিত নহে ও নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু তাহার বাহুল্য সর্ব্ববিদিত। তথায় স্ত্রীলোককে নির্লজ্জতার প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। তাহারা প্রকাশ্য রাজপথে পরপুরুষকে আহ্বান ও টানাটানি পর্য্যন্ত করে. কিন্তু সেরূপ আচরণ পুলিস বা পাহারা-ওয়ালা দেখিলেও বে-আইনী মনে করে না। তবে যদি কেহ সেরূপ উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পুলিসের শরণাগত হন ও তজ্জন্য অভিযোগ করেন, তবেই তাহা তখন আইনভঙ্গের বিষয়ীভূত হয়।

সুসভ্য ফ্রান্সদেশে কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি আইনবিরুদ্ধ নহে। তথায় "Licenced brothels" বা আইনানুমোদিত বেশ্যালয় সকল আছে, এবং তথায় কুৎসিত রোগ বিস্তৃতি নিবারণ জন্য বেশ্যারা প্রত্যহ নাকি চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত হয়। সেরূপ প্রত্যেক বেশ্যালয়ের একজন Matron বা কর্ত্রী থাকেন ও দর্শকগণকে আজানু-উলঙ্গ রঙ্গিণীগণের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। সেখানকার নিশীথের "কাফে" (cafe) এবং কান্ কান্ নৃত্য (Cancan Dance) বিভীষিকায় ও কদর্য্যতায় নরককেও পরাস্ত করে। আহা! ঐ সব সুসভ্য দেশ ভারতবর্ষকেও বর্ব্বর বা অসভ্য আখ্যা প্রদান করিতে লজ্জানুভব করে না। দেশ বা জাতি অসীম নির্লজ্জ না হইলে, তাহার নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকিলে,—ভারতবর্ষের ন্যায় পবিত্র দেশকে বর্ব্বর বা অসভ্য আখ্যা প্রদান করা সম্ভবপর হয় না। দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ সব সুসভ্যদেশ এখন ভারতবর্ষের আদর্শ হইতে বসিয়াছে। শিক্ষালাভের জন্য এদেশের যে সকল যুবক ঐ সব দেশে গমন করেন, তাঁহাদের নৈতিক জীবন বিশেষ উন্নত না হইলে,—তাঁহাদের আত্মসংযমশক্তি বিশেষভাবে প্রচুর না থাকিলে,—তাঁহাদের

সতীত্ব।

স্বগৃহের বন্ধন বিশেষ পবিত্র ও সুদৃঢ় না থাকিলে, চরিত্র রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় এবং দাসীর হস্তেই তাঁহাদের পতন ও মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। জাগতিক উন্নতি সাধনায় ঐ সব স্বাধীনদেশে গমন করিয়া সে সব দেশের স্বাধীন জেনেনাগণের উগ্র প্রলোভনের ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে পতিত হইয়া তাই অনেকেই গভীর পাপ-পঙ্কে নিক্ষিপ্ত ও প্রোথিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যান।

মানব-শরীরে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাত প্রকার ধাতু উপাদান থাকে। যে বস্তু আহার করা যায়, তাহা পরিপাক হইয়া প্রথমে রস, পরে তাহা পরিপাক হইয়া রক্ত ও সেই রক্ত হইতে মাংসাদি জন্মে, এবং শুক্রধাতুই চরম সারাংশ। এই শুক্রধাতু পরিপাক হইয়া ওজঃধাতুতে পরিণত হয়। এই ওজঃধাতু হইতেই মনুষ্যের দেবত্ব লাভ হয়। ইহা দ্বারা নরদেহে ব্রহ্মণ্য ও নারীদেহে সতীত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়-সংযমশীলা সুশীলা ওজস্বিনী হিন্দু-রমণীর দেহে সে জন্য সতীত্বের পূর্ণবিকাশ। সে তেজঃ ও লাবণ্য সতীদেহেই প্রকাশ পায়।

রস নয় প্রকার; শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। "ওজশ্চিত্তস্য বিস্তাররূপং দীপ্তত্বমুচ্যতে" —অর্থাৎ এই ওজঃ সকলের প্রধান ও মানব-চিত্তের বিস্তাররূপ দীপ্তি।

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।"

অর্থাৎ মুক্তার ভিতরে ছায়ার ন্যায় যে ঢলঢলে ভাব দেখা যায়, নারী-অঙ্গে লাবণ্যও সেইরূপ। সতীত্ব বা ওজঃই ঐ লাবণ্য-

প্রদান করে। সতীদেহেই ঐ তেজঃ ও লাবণ্য বিরাজ করে। অসতীর দেহে যতই অঙ্গসৌষ্ঠব, বর্ণ পারিপাট্য বা চর্ম্মের গৌরবর্ণ থাকুক না কেন, ঐ সতীত্ব-লাবণ্য বা তেজঃ তাহাতে থাকে না। সে জন্য তাহা হেয়। আসল মুক্তা ও নকল মুক্তার পার্থক্য ঐ লাবণ্যে। ভারত ভিন্ন অপর দেশে ঐ লাবণ্য দেখিয়া আসল মুক্তা চিনিবার শক্তি নাই। সেহেতু সে সব দেশে আসল মুক্তার বিশেষ অভাবে নকল মুক্তার এত প্রচলন দৃষ্ট হয়। বোধহয় ঐ নকল মুক্তাগণ আসল মুক্তার ঐ সতীত্ব-লাবণ্য লোপ করার জন্য বিলা- সিতার স্রোত প্রবাহিত করিয়া, ব্যভিচারের তরঙ্গে সব ভাসাইয়া দিয়া,—আপনাদের ন্যায় এদেশকেও নকল মুক্তাপূর্ণ করার জন্য এত মায়া প্রদর্শন করেন। লাঙ্গুলহীনা ধূর্ত্ত-শৃগালীর পক্ষে সকলকে লাঙ্গুলহীনা করিবার প্রবৃত্তি ও প্রয়াস বিচিত্র নহে। তাহারাই সতীত্বরূপ সরল, সুমিষ্ট, দ্রাক্ষাফল অতি উচ্চ সমাজ-বৃক্ষে ফলে দেখিয়া, তাহাতে সম্পূর্ণ অনধিকারিণী থাকায় ঐ ফল অম্ল বলিতে বলিতে দূরে চলিয়া যায়। হিন্দুনারীগণ খলের সে চাতুরী ধরিতে পারিলেই মঙ্গল। নতুবা একাকার অবশ্যম্ভাবী।

এ জগতে সকল দেশের সকল সমাজেই সতীত্বের আসন বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। সকল দেশের সকল চিন্তাশীল সাধুব্যক্তিই উহার গুণ বা উপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, এবং সেই জন্য উহার সমাদরও করেন। সকল ধর্ম্মই সতীত্বের প্রাধান্য কীর্ত্তন করে। কিন্তু সামাজিক গঠন, ও স্ত্রীজাতির চরিত্র-গঠনের উপর সতীত্বের ইতর বিশেষ, আদর অনাদর, স্থিতি ও বিকৃতি নির্ভর করে। উত্তমা স্ত্রী স্বামীর পক্ষে পরমসুখের প্রস্রবণ, ও অধমা স্ত্রী

পরমদুঃখের আকর,—ইহা সকল জাতিই একবাক্যে স্বীকার করেন।

অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত গ্রীস ও রোম দেশের ও য়িহুদী নারীগণের ইতিহাস পাঠ করিলেও জানা যায় যে, নারী-জীবনের পবিত্রতা বা সতীত্ব সারধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। হিব্রুভাষায় আদর্শরমণীর সম্বন্ধে লিখিত আছে— "Strength and honour are her clothing"—অর্থাৎ শক্তি ও বিশুদ্ধি তাঁহার বসন বা আচ্ছাদন। ঐ সকল প্রাচীন সভ্যদেশেই নারীগণের উক্ত পবিত্রতা রক্ষার জন্য অবাধ স্বাধীনতা প্রদত্ত হইত না। ঐ সকল দেশের ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, প্রাচীন নারীজাতির সতীত্ব দেশে বিলাসিতার স্রোতবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে খর্ব্ব হইয়াছিল। রোমদেশে সাধারণতন্ত্র পতন হইলে, দেশে বিলাসিতার বৃদ্ধি পাইয়াছিল ও তাহাতে রমণার আদর্শচরিত্রের অধঃপতন দৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বের দাম্পত্যপ্রণয় ও বিশ্বাস শিথিল হইতে আরম্ভ হয়, এবং ক্রমশঃ অধঃপতন হইতে হইঁতে অতি হীন ও ভয়ানক নারীচরিত্র এগ্রিপিনাস (Agrippinas) এবং মেশালিনাস (Messalinas) এর মূর্ত্তি সৃষ্টি হইয়াছিল।

খৃষ্টানজাতির ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে লিখিত আছে—

যে ব্যক্তি (যথার্থ) স্ত্রী প্রাপ্ত হয়, সে একটি উত্তম বস্তু বা সারদ্রব্য প্রাপ্ত হয়, এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। (১)

---

(১) Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favour of the Lord. (Proverbs: Chap XVIII. 22)

সতীত্ব।

একজন সতী স্ত্রী পতির পরম শোভাকর মুকুটস্বরূপ ; কিন্তু যে পতি লজ্জাজনক কার্য্য করে, সে অতীব অসার। (১)

য়িহুদীদিগের পুরাণে লিখিত আছে—

যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তবে বিবাহবেদিও তাহার উপর অশ্রুধারা বর্ষণ করে। (২)

সুসম্মিলিত দম্পতি স্বর্গের গরিমা তাঁহাদের সহচরস্বরূপ প্রাপ্ত হন ; কিন্তু মন্দভাবে মিলিত স্বামীস্ত্রী সর্ব্বধ্বংসকারী অগ্নিবেষ্টিত থাকে। (৩)

হৃদয়ের ব্যথা হইতে অপর যে কোন ব্যথাও ভাল ; এ সংসারে মন্দ স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল আর কিছুই নাই। (৪)

যে আপন মনোমত ও শুভকারিণী স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ভগবানের প্রিয়পাত্র হয়। (৫)

---

(১) A virtuous woman is a crown to her husband, but he that maketh him ashamed is as rottenness to his bones (Chap. XII : 6)

(২) If a man divorces his wife, the altar itself sheds tears over him.

(৩) Man and wife well-matched have heaven's glory as their companion ; man and wife ill-matched are encircled by a devouring fire.

(৪) Rather any ache than heart ache ; rather any evil than an evil wife.

(৫) He who marries a woman *congenial to himself is* loved by the Almighty.

সতীত্ব।

রাবি জেহুদা (Rabbi Jehudah) মন্দস্ত্রী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

পৃথিবীতে মন্দ স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর অসহ্য বা অদম্য পাপ আর নাই। (১)

রাবি চিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট বিদায়গ্রহণকালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

ভগবান্ মৃত্যুর অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী—মন্দ স্ত্রী হইতে তোমাকে রক্ষা করুন। (২)

কি প্রাচীন, কি আধুনিক, জগতের সর্ব্বদেশে সকল সমাজেই স্ত্রীজাতির সতীত্ব মনুষ্যসমাজের পরম হিতকর, ও সেই হেতু পরম আদরের বস্তু বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন—যে ধর্ম্মভুক্ত হউন না কেন,—ধর্ম্ম, আচার ও প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে নানা অমত বা বিরোধ থাকিলেও—ভিন্ন ভিন্ন সকল ধর্ম্মাবলম্বী সকল জাতিই একবাক্যে সতীত্ব-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। জাতীয় জীবন-গঠনে সমাজে সতীস্ত্রীর মহিমা যে অপার, তাহা কোথাও অস্বীকৃত হয় না। কিন্তু মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, প্রকৃত সুখ শান্তি কোথায়, ও প্রকৃত দুঃখ ও অশান্তির মূল কি,—ইত্যাদি বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্তের উপর মানবের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দিষ্ট

---

(১) More ungovernable than any other evil is a bad wife.

(২) May the Lord save thee from something worse than death—a bad wife.

হয়, এবং সেইরূপ স্থির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার অনুকূল সমাজও গঠিত হয়।

বহির্জ্জগৎই সব,—অন্তর্জ্জগত নাই,—জাগতিক উন্নতিই জীবনের সারব্রত,—আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই নহে,—যে জাতি এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সেই ভাবেই নিজ সমাজ গঠন করেন,—যে সমাজ ইহকালই সব, পরকাল নাই বলিয়া ধারণা করেন,—সে সমাজে বর্ত্তমানের ক্ষণিক জাগতিক বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখ, ভবিষ্যতের অতীন্দ্রিয় অনন্ত সুখশান্তি অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়াই বিবেচিত হয়, ও সেরূপ সমাজে বিলাসিতা-রাক্ষসীর করালগ্রাসে পতিত নরনারী সদসৎ বিচার-বুদ্ধি বা বিবেকের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। সে সমাজে পশুভাবই ক্রমশঃ প্রকটিত হয়, ও দেবভাব মাত্র কল্পনার বিষয় হইয়া পড়ে।

ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ জাতির চক্ষুতে নারীদেহ কেবল উপভোগের সামগ্রী মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। স্ত্রীজাতি যে সম্মানিত আসন ও ব্যবহারের উপযোগী, তদপেক্ষা অধিকতর উচ্চে বসাইয়া সর্ব্বদা পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পদলেহন করিতে থাকিলে, স্ত্রীজাতি সে উচ্চ-আসনের প্রকৃত অধিকারিণী না থাকায়, অতি তোষামোদের আকর্ষণে ক্রমেই অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে নামিতে থাকে, ও নিজ-দেবভাব পরিত্যাগ করিয়া কুকুরের আকর্ষণে কুকুরীর ন্যায় ঘৃণ্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। "সর্ব্বং অত্যন্তগর্হিতং" অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যেই অত্যাধিক্য নিন্দনীয়। নারী-পূজার অত্যাধিক্যও নারী-জাতির বিশেষ অধঃপতনের কারণই হয়। ঐরূপ অত্যধিক পূজিত

হইলে, নারীজাতি নিজকর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাইয়া, স্বার্থপর, বৃথা গর্ব্বিত ও মমতাহীন হইয়া পড়ে। তখন স্ত্রীজাতি অত্যন্ত স্বার্থপর অসৎ পরপুরুষের চাটুবাক্যে মোহিত হইয়া "য এব ধীরো মৃদুমন্দভাষী স এব যত্নাৎ পরিশঙ্কনীয়ঃ" অর্থাৎ "যে ধীর মৃদুভাষী বা বিড়াল-তপস্বী, সে শঙ্কার বিষয় বলিয়া সযত্নে পরিত্যাজ্য"—এই নীতিবাক্য ভুলিয়া গিয়া, সেই বিড়াল-তপস্বীর স্তুতিতে তুষ্টিলাভ করিয়া মোহাচ্ছন্নভাবে তাহার মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট ও বিনষ্ট হয়। বিলাসিতা ও ব্যভিচার বশতঃ কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাইয়া নারীজাতির এই অধঃপতন জগতের সকল জাতির ইতিহাসেই দেখা যায়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের সমুদ্রস্নান বা বলনাচের পোষাক পরিচ্ছদ ও ব্যবস্থা আদি দেখিলে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নরনারীর নৈতিক অবস্থা কত শোচনীয় ও নিন্দনীয়,—যথার্থ সতীত্বের কিরূপ মূল্য সে বাজারে প্রচারিত,—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাসিনীগণের পরিচ্ছদের যথাসম্ভব অল্পতা-রূপ বড়শীর দ্বারা পুরুষ-মীনকে গাঁথিবার যে কত আয়োজন, তাহা বলিবার নয়। নরনারীর সেরূপ অগাধ অবাধ মিলন মিশ্রণ, তদুপরি মদ্যপানজনিত উত্তেজনা ও উন্মাদনার মধ্যে যথেচ্ছব্যবহার বা ব্যভিচার যে কি পাপ-সমুদ্র-স্নান, বা ঐ বল-নৃত্য যে কি পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্য, তাহা নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রেই বুঝিতে পারেন। উহা—পরমহংস পরম-হংসীর জল-কেলিও নহে, বা যোগী যোগিনীগণের সম্মিলনও নহে। উহা তথাকথিত সভ্যতা-আলোকের নিম্নস্থ ঘোর 'মোহ' অন্ধকার, ও সভ্যতার ক্ষীণ আবরণে ঘোরতর ব্যভিচার। বিশেষ পরি-তাপের বিষয় এই যে, যে হিন্দু-সভ্যতার সৌরভ কত শত সহস্র

শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে জগতের সমগ্র জাতিকে আমোদিত করিয়া আসিতেছে,—যে হিন্দু-সভ্যতা-তপনের বিমল কিরণ সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিয়া আসিতেছে,—ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ যখন ঘোর অন্ধকার মধ্যে নিহিত ছিল, এখনকার ঐ সকল দেশবাসীগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন বন্যজন্তুর ন্যায় বনে বনে আহার্য্য পশুর সন্ধানে ধাবিত হইত,—বিদ্যা-মদে, পরিচ্ছদের পারিপাট্যে, বীরত্বের শ্রেষ্ঠতায় যে সকল আধুনিক জাতি আজ উচ্চ-পদে আরূঢ়, সেই সকল জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ যখন গৃহ-অভাবে পর্ব্বতগুহায় বা অরণ্যে বাস করিত,—অতি প্রাচীন মিসর-নগরের যখন অঙ্কুর উদ্‌গমও হয় নাই,—গ্রীক ও রোমক জাতিরও অভ্যুদয়ের বহুসহস্র শতাব্দী পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষ সভ্যতার গৌরব গরিমার লীলাক্ষেত্র ছিল,—সেই ভারতবর্ষে, বলিতে গেলে গত-কল্যকার সভ্যতাভিমানী, প্রকৃত অসভ্য পশুজীবনযাপনকারী জাতিগণ সভ্যতা শিক্ষা দিবার স্পর্দ্ধা রাখে, এবং ভারতবর্ষও তাহা-দিগকে আদর্শস্থানে বসাইবার স্বপ্ন দেখে! এ স্বপ্ন কাল-নিদ্রারই অঙ্গ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে স্ত্রী-জাতি পুরুষের সহিত সম-অধিকার ভোগ করেন। ভোটের অধিকার লাভ জন্য তাঁহারা মারামারি লাঠালাঠি করিতেও ছাড়েন না। তথায় বিবাহ-বন্ধনের তাদৃশ দৃঢ়তা না থাকায় নারীসমাজের উপর সমশ্রেণীভুক্ত পুরুষ-সমাজের কর্ত্তৃত্ব ও প্রাধান্য না থাকায়, নারীজাতির উচ্ছৃঙ্খলতার ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা থাকে না; তাহা দমন করিবার ক্ষমতা পুরুষ-সমাজে না থাকায়, এবং পুরুষগণও

নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল অবস্থা পাইয়া ঐ সব স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। সেই জন্য ঐ সকল সমাজে দাম্পত্য-সুখের তাদৃশ মধুরতা নাই। অনেক নরনারী বাল্য ও যৌবন-জীবন স্বাধীন বা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে যাপন করিয়া,—বহু প্রণয়ভঙ্গ ও প্রতারণা আদি অভ্যাস ও সহ্য করিয়া,—অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পরিণত বয়সে বা বৃদ্ধ বয়সে প্রথম বিবাহ করিতে পান। কিন্তু বিবাহের পরেও পূর্ব্ব স্বভাব অনেকে ভুলিতে পারেন না; সেহেতু নিজ স্বাধীনতায় অল্পমাত্র ব্যাঘাত ঘটিলেই সে বিবাহিত জীবনের পরাধীনতা সহ্য করার সীমা অতিক্রম করে। স্বাধীন দেশে স্বাধীন জীবনে কোনওরূপ পরাধীনতাস্বীকার প্রাণান্ত অপেক্ষাও কষ্টকর; সেজন্য বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আবার স্বাধীন বিহঙ্গ সমাজ-বৃক্ষে উচ্চ নীচ সকল শাখায় উড়িয়া উড়িয়া বসিয়া বসিয়া নানা ফল আস্বাদন করিয়া বেড়াইয়া থাকেন। বিবাহের স্বর্ণ-শৃঙ্খলও সুখকর বলিয়া বা জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয় না। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের নারীজাতির সেই অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হন, কিন্তু সংস্কার বা দমন করার সাধ্য কাহারও নাই। ঐ সকল কারণে হিন্দুসমাজে নারীজাতির সতীত্ব, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দাম্পত্যসুখ ও বিশ্বাস সকল জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাতে আবার অনেকের যে চক্ষু টাটায়, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবনে শিক্ষা তিন ভাবে হয়; (১) দেখিয়া, (২) শুনিয়া

ও (৩) ঠেকিয়া। সংযম সতীত্ব অভাবে ব্যভিচার-স্রোতে গা ভাসাইয়া পাশ্চাত্যদেশের নৈতিক অবস্থা ও দাম্পত্য-সম্বন্ধ কি ভীষণ, তাহা একবার ভালরূপে দেখিয়া ও শুনিয়া শিক্ষা কর ও শিক্ষা দাও—সতীত্ব ও সংযম জগতের শ্রেষ্ঠতম সামগ্রী, পরম উন্নতিকর, চরম সুখকর ও দেবত্বপ্রদ, এবং ব্যভিচার ও অসংযম অতিশয় ঘৃণ্য ও পশুত্বসূচক। মনুষ্য-জন্মগ্রহণ করিয়া পশুজীবনযাপনশিক্ষা কখনই কোন সমাজের মঙ্গলকর বা মনুষ্যোচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি তথাকথিত সুসভ্য দেশের বিবাহিত জীবন বা অবিবাহিত জীবন ভালরূপে তলাইয়া দেখিলে ও বুঝিলে তাহা যে তাহা কত বীভৎস ব্যাপার, তাহা প্রমাণিত হয়। নারী পুরুষের সম-অধিকারিণী বা শ্রেষ্ঠতর অধিকারিণী হইলে,—প্রচলিত বিবাহ-বন্ধন অতি শিথিল হইলে ও নারী তাহা অতি সহজেই বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকারিণী হইলে,—সতীত্বের মর্য্যাদা এত ক্ষুণ্ণ হইলে,—কি অসুখকর ব্যাপার ঘটে, তাহা একবার দৃষ্টি কর। দেখিবে প্রতি সংসারে কি অঘটন, অসুখ ও অশান্তি বিরাজ করিতেছে! তথায় আদালতে প্রতি বৎসর যে সকল বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিবাহিত পরাধীন জীবন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য যে সহস্র সহস্র মকদ্দমা মামলা হয়, তাহার সংখ্যা করিলে তাহাকে ৩৬৫ দিয়া ভাগ করিলে, একদিনের সংখ্যাকে ২৪ দিয়া ভাগ করিলে যে ১ ঘণ্টার সংখ্যা হয়, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যে এক মিনিটের সংখ্যা হয়, তাহা গণনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় প্রতি মিনিটে কত বহুসংখ্যায় বিবাহবিভ্রাট বা বিবাহ-

বন্ধন ছিন্ন হইতেছে। আজকাল আবার ঐ শ্রেণীর মকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ বাহির হওয়া নিষিদ্ধ হইতেছে। যাহাই হউক, "ঠেকিয়া" না শিখিয়া, ঐ সব "দেখিয়া" ও "শুনিয়া" শিক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ভারতবর্ষকেও অন্যান্য দেশের ন্যায় সতীত্বের অভাব সম্বন্ধে "ঠেকিয়া" শিখিতে হইলে, তাহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর নাই।

এই ভারতবর্ষ সতীত্বের যে মহিমা, মূল্য বা সারবত্তা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিল, তাহা এ জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। এদেশের ন্যায় এত ভাগ্যবান্ অথচ এত ভাগ্যহীন দেশ বোধহয় ধরাতলে আর নাই।

তাই এই ভারতবর্ষে এক্ষণে দারুণ সুসভ্যতা বশতঃ নারীর সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক কি প্রসারক ইত্যাদি প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত সতীত্ব কি ও কিসে হয় ও থাকে,—প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি ও কিসে হয় ও থাকে, তাহার শাস্ত্রসঙ্গত জ্ঞান লাভ করিলে ঐ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ, কিন্তু সে জ্ঞান না থাকিলে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব। সঙ্কোচ বা প্রসারণ অবস্থাবিশেষে ভাল বা মন্দ, সুখ্যাতি বা অখ্যাতির কারণ হয়। সর্ব্ব স্থলে সঙ্কোচ নিন্দনীয় নহে, ও প্রসারণও প্রশংসনীয় নহে। এক ঘটি খাঁটি দুগ্ধ এক ঘড়া জলমিশ্রিত নামমাত্র "কলিকাতার দুগ্ধ" অপেক্ষা ভাল কি মন্দ, এবং এক বাটি বা ডেলা ক্ষীর এক ঘটি খাঁটি দুগ্ধ হইতে ভাল কি মন্দ, তাহা রুচি ও অধিকারী ভেদে স্থির হয়। সঙ্কীর্ণতা বা বিস্তৃতি অবস্থা অনুসারে আদরণীয় বা অনাদরণীয় হয়। ধর্ম্মপথ অনেক সময়

আপাতদৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণ, অন্ধকারময় ও কণ্টকাকীর্ণ বোধ হয় ; কিন্তু নীচস্বার্থ ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা আদি গুণ অবলম্বনে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও আপাততঃ অনেক উপদ্রব ও কষ্ট সহ্য করিয়া সে পথে চলিলে, পরিণামে ক্রমশঃ বিস্তৃত, আলোকিত ও কণ্টক-শূন্য পথে আরোহণ করিয়া সমুজ্জ্বল শান্তিময় প্রদেশে উপনীত হওয়া যায়। অধর্ম্মের রাজপথ মোহাচ্ছন্ন আপাতদৃষ্টিতে সুবিস্তৃত, কুসুমাকীর্ণ, আলাকমালায় সমুজ্জ্বল ও মনোহর বোধ হইলেও পরিণামে কিন্তু তাহা ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ, অন্ধকারময় ও বহু কণ্টক-ময় হইতে আরম্ভ হইয়া ধ্বংসের নরকে আনিয়া ফেলে। পথ চিনিবার দৃষ্টি চাই। সে দৃষ্টি হিন্দু শাস্ত্রকারগণের সর্ব্বকাল দেখিবার ক্ষমতাযুক্ত শুভ দৃষ্টি হইতে প্রদর্শিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্মপথই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও আদরণীয় জ্ঞানে তাহাতেই চলিতে শিক্ষা করা উচিত। পাশ্চাত্যশিক্ষার জ্ঞানালোকপূর্ণ রাজপথ অজ্ঞানান্ধকারেই ক্রমশঃ চালিত করে। চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টি হয়। চক্ষুর দোষ বা রোগ সারাইবার জন্য চক্ষু আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া কিছুদিন অন্ধকারে থাকিতে হয়। অন্ধকার সকল সময়েই অশুভকর নহে, এবং পশ্চিমের যে আলোক পূর্ব্বদেশবাসীর চক্ষুর হানিকর, তাহাও সকল সময়েই শুভকারী নহে। সুতরাং সে অবস্থায় বা অবস্থাবিশেষে চক্ষুরোগ সারাইবার জন্য সাময়িক অন্ধকার পরম উপকারীই হয়। পরে রোগ সারিলে, আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রকৃত দৃষ্টিলাভ করিলে, তখন আর অন্ধকারে থাকিতে হয় না। প্রকৃত আলোক কি ও কোথায়, ও কোন্ দেশের লোকের

চক্ষু কি আলোকে অভ্যস্ত ও তাহা সহ্য করিতে পারে, তাহা জানিয়া কার্য্য করাই উচিত। পশ্চিম-গগনের চপলা-শোভায় মোহিত হইলে, পরক্ষণেই ঘোর অন্ধকারে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। বর্ত্তমান ভারতের নারীর শিক্ষার দশা ও মনের স্বাধীনতার ভাব দেখিলে তাহা সম্যক্ প্রতীত হয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সম্যক্ অবস্থা জ্ঞাত থাকায়—পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব দেশের নারীর চরিত্র ও অবস্থা জ্ঞাত থাকায়, বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন—"আগে মেয়েদের উন্নত কর, নতুবা এই অধম জাতির উপায় নাই।" এ জাতি যে একদিন উত্তম কেন সর্ব্বোত্তম ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নারীচরিত্রের অবনতি হেতু সে জাতি এখন অধম কেন অধমাধম হইতে পারে, কিন্তু সে অধমভাব দূর হয় যদি নারীচরিত্রের উন্নতি হয়! ভারতের নারীচরিত্র যে ভাবে পূর্ব্বে উন্নত ছিল, সেই ভাবেই উন্নত—সতীত্ব মহিমায় উন্নত করিবার জন্যই স্বামীজীর উক্ত সাগ্রহ উক্তি। নতুবা পাশ্চাত্যদেশের আদর্শে স্ত্রীস্বাধীনতা দিলে, উন্নত না হইয়া অবনতই হইয়া যাইবে। বীর-পূজা করিবার জন্য হিন্দু স্ত্রীলোক-দিগকে যথা তথা যাইবার অধিকার ও সুযোগ দিলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখান হয় না ও ঐ ভাবের প্রসারণই সঙ্কোচতা নাশ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিতে পারে না। হিন্দুর সতীত্ব রক্ষায় হিন্দুনারী সর্ব্বব্যাপী বিভুকে নিজস্বামিরূপে দেখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন,—এই উপদেশ। নিজ হৃদয় স্বামী-ভক্তিতে, স্বামীতে ভরপূর রাখিবেন,—এই শিক্ষা। ভরপূর হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তা,—অন্য কোন অসামান্য বীর-পুরুষের চিন্তাও,—স্থান পাইতে পারে না।

যাঁহার চিত্তে ঐ সব চিন্তা স্থান পায়, তাহা দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার হৃদয় স্বামী-প্রেমে ভরপূর নাই ; সে হৃদয় শূন্য, ও শূন্য আছে বলিয়াই স্বামী ভিন্ন অপরের চিন্তা সে হৃদয়ে স্থান পায়।

কবি গাহিয়াছেন—

"প্রেমের এই মানা না হ'লে প্রেম ত রবে না।
তুমি পিয়া বিনু কারু পানে চাইতে পাবেনা ॥"

যে ভাগ্যবতী নারী পতি-প্রেমের অমৃত আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনি সেই প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। সে প্রেম কিসে আসে, থাকে ও যায়, তাহাও জানেন। তিনি হৃদয়ের অন্তস্তলে—মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন যে, তিনি সেই প্রিয়তম বস্তু—স্বামী ভিন্ন আর কাহারও দিকে চাহিতে পাইবেন না। সেরূপ চাহিতে তিনি ইচ্ছাও করেন না। যিনি তাহা ইচ্ছা করেন, তিনি প্রকৃত স্বামি-প্রেম জানেন না। জানিলে, সেরূপ ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র উদয় হইতে পারে না। সুতরাং "পিয়া বিনু কারু পানে চাইতে পাবে না" বলিলে যদি সে শিক্ষা মনুষ্যত্বের বা নারীত্বের সঙ্কোচক হয় বা প্রসারক না হয়, তবে আর উপায় নাই। ঐ শিক্ষাই মনুষ্যত্বের ও নারীত্বের বা সতীত্বের সম্পূর্ণ প্রসারক ও কিছুতেই সঙ্কোচক নহে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রাণের জিনিস প্রাণই জানে। যাহার সে প্রাণ নাই, মাত্র বাক্য আছে, তাহাকে মাত্র বাক্য দ্বারা প্রাণের জিনিষ বুঝাইবার প্রয়াস মিথ্যা, বৃথা।

হিন্দু সতী নারী যে নিজ পতিভিন্ন অপর পুরুষ বীর কেন,

বীরাগ্রগণ্য হইলেও, তাঁহার দিকে চাহিতে পারিবেন না শিক্ষা করেন, অধুনা সে শিক্ষা অজ্ঞানসম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সেই অজ্ঞানই তথাকথিত জ্ঞানাপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেয় ও প্রেয়। অজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা অবস্থাবিশেষে ভাল বা মন্দ হয়। অজ্ঞতা সর্ব্বত্র মন্দ ও বিজ্ঞতা সর্ব্বত্র ভাল,—ইহা নহে। তাই ইংরাজ কবি লিখিযাছেন—

"Whore ignoaance is a bliss
It is folly to be wise"

অর্থাৎ যেখানে অজ্ঞতাই পরম সুখকর, তথায় বিজ্ঞতাই মহা-মূর্খতা। স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া—"হরি আছেন কিনা দেখিয়া"—বিজ্ঞতালাভ কবিতে গেলে, মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই হিন্দুসতী নারী—জননীগণকে বলিতে ইচ্ছা হয়—"হে জননীগণ! সেই হরি তোমার স্বামীতেই বর্ত্তমান আছেন—এই বিশ্বাসে সেই অজ্ঞতায় থাকিয়া যাও। বিজ্ঞ হইতে গিয়া সে স্বামী-স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া দেখিতে যাইও না। পূর্ব্ব সতীত্ব-গৌরব নষ্ট করিও না, নষ্ট হইও না; বাঁচিয়া থাক ও বাঁচিতে দেও। স্বামী-স্ফটিকস্তম্ভে ভগবান্ আত্মা-রূপে বিরাজমান, ও তোমার ভিতরেও আত্মা রূপে বিরাজমান আছেন। আত্মা যাহা তাহা ত এক, দুই নয়, সুতরাং দুই না রহিয়া উভয়ে এক হইয়া যাও। পতি-আত্মায় আত্ম-বিসর্জ্জন কর, তাহাতে ডুবিয়া যাও, দেখিবে যে অনন্তে মিশিয়া যাইবে। ঐ স্ফটিকস্তম্ভে অবিশ্বাসী হইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেখিতে যাইও না। গঙ্গার ঘাট অনেক আছে, কিন্তু গঙ্গা এক। গঙ্গাস্নান করিতে হইলে, হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ডুব দিতে হয় না। প্রত্যেক পতিই

এক এক ঘাট; যাহার যে ঘাট তাহাতেই নামিয়া স্নান কর, অন্য ঘাটে বা আঘাটায় যাইবার ইচ্ছা করিও না। পতিকে পরম পবিত্র দেবতা—গঙ্গা—জ্ঞানে বিশ্বাস কর, পূজা কর, ভক্তি কর, নিজ জীবন সার্থক কর, উভয়জীবন ধন্য কর। পতি-ঘড়ি চলিতেছে, সময় দেখিয়া লও, সময় চলিয়া যাইতেছে, গত সময় গত স্রোতের ন্যায় আর ফিরে না। বিজ্ঞান বা বিজ্ঞতা লাভের জন্য সে ঘড়ি ভাঙ্গিয়া শিখিতে যাইও না। সে ঘড়ি বজায় রাখ, উভয় জীবনই ঠিক চলিবে। সে ঘড়ি ভাঙ্গিলে অপর ঘড়িতে তোমার জীবন-সময় বা জীবিত-কাল নিরূপিত হইবে না। যাহার যে ঘড়ি, তাহাতেই বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া চল। অপর ঘড়ি ভাল জ্ঞান করিও না ও নিজের ঘড়ি ছাড়িও না। ঘড়ির মূল্য সময়-নিরূপণে; সবই কলকব্জার কাজ; অল্পদামের ঘড়িও খুব উতরাইয়া যায়, বেশী দামের ঘড়ির চেয়েও ভাল সময় রাখে। বেশী দামের ঘড়ি হইলেই যে সকল সময় ভাল চলে, তাহাও নহে। নিজের ঘড়ি ভাঙ্গিও না, কোনও দুইটি ঘড়ি এক রকম সময় নির্দ্দেশ করে না; কিছু না কিছু ইতর বিশেষ হয়ই। তাই ইংরাজ কবি পোপ (Pope) লিখিয়াছেন—

> "It is with our judgments, as with our watches;
> None goes just alike, but each believes his own."

অর্থাৎ "আমাদের বিবেচনাশক্তি আমাদের ঘড়িগুলির ন্যায় চলে, কোনও দুইটি ঠিক এক রকম চলে না বটে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘড়ি ও বিবেচনাশক্তিকেই বিশ্বাস করিয়া চলেন।" তাই বলি,—নিজের ঘড়ি বিশ্বাস করিয়াই চল। নিজের ঘড়ি যদিও

Slow বা কম চলে, তবুও সেই সময় মতই জীবন যাপন কর। কাল অনন্ত; ২।৫ মিনিটের কমেতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। নিজঘড়ি—পতিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস বা অভক্তি করিও না। আপন আপন পতি-ঘড়ি দেখিয়া চলিলে কখনই ভগবান্-রূপ ট্রেণ ফেল হইবে না, তাহা ঠিক ধরিতে পারিবে। সে ট্রেণও late বা বিলম্ব করিয়া আসিয়া তোমায় যথাস্থানে লইয়া যাইবে। নিজ ঘড়ি অবিশ্বাস করিয়া অপর ঘড়ি দেখিয়া চলিলে ও সেই ট্রেণ ধরিতে গেলে দেখিবে, সে ট্রেণ তোমার জীবন-ষ্টেসন হইতে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তোমার স্বস্থানে যাওয়া হইল না।”

হিন্দু-নারীগণ ঐভাবে জীবনে চলিলে, ভারতের পূর্ব্ব সতীত্বের মহিমা, মূল্য ও সারবত্তা সম্যক্ বজায় রাখিয়া জগতে তাহা পুনরায় ঘোষণা করিবার শক্তি লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি “হিন্দুরঞ্জিকায়” এক নব আবিষ্কারের কথায় দেখা যায় যে, সাহারা মরুভূমির এক প্রান্তে এক জাতীয় নরনারী বাস করে, যাহাদের পুরুষগণ আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় এক গা গহনা পরিয়া ঘোমটা দিয়া অন্তঃপুরে বাস করে ও গৃহস্থালীর সব কার্য্য করে। পুরুষেরা মেয়েদের কাছে একেবারে মেষ ও অনিমেষনয়নে তাহাদের মুখপানে চাহিয়া থাকে, ও মেয়েরাই পুরুষদের অভিভাবকস্বরূপ বাহিরের সব কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া পতি অন্বেষণ ও মনোনয়ন করে ইত্যাদি। তথায় কার্য্যতঃ পুরুষেরাই স্ত্রীলোক, ও স্ত্রীলোকেরাই পুরুষ।

অদ্ভুত আবিষ্কার তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গবালাগণ যে ভাবে স্বাধীনতায় অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের তাধিন্‌ধিন্” নাচ ও পদবিক্ষেপ দেখিয়া মনে হয় যে, এ সোনার সরস বঙ্গদেশকে সাহারা মরুভূমির প্রান্তদেশে উপনীত করিতে তাঁহাদের অধিক দিন বিলম্ব হইবে না। সুতরাং আমরা পূর্ব্ব হইতে—এখন হইতে—তাঁহাদের শ্রীহস্তে আমাদের অভিভাবকত্বের সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া অন্তঃপুরে সিকড় গাড়িয়া না বসিলে, ও ঘোম্‌টা আদি দিবার অভ্যাসে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হইতে না শিখিলে, পরিণামে সে অবস্থা অনভ্যাস বশতঃ আমাদের বিশেষ কষ্টকর হইতে পারে। সাবধানের বিনাশ নাই। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের (বুদ্ধিমতীর ?) কার্য্য নহে কি ?

———

সতীত্ব।

৭। ইহার বিভিন্ন পরিমাপ নিরূপণ বা আদর্শ।

পরাধীন দেশে শাসকজাতির রীতিনীতি ও সামাজিক আচার পদ্ধতির অনুকরণপ্রিয়তা প্রজাবর্গের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। ডারইউন সাহেবের মতে বানরজাতির ক্রমোন্নতি হইয়া মনুষ্যে পরিণতি হইয়াছে। অপর অনেকবিষয়ে মত-বিরোধ থাকিলেও, মনুষ্যত্বহীন, পরাধীন ও অবনত মানবজাতির অনুকরণ-প্রবৃত্তি—এই একটি মাত্র বিষয় লক্ষ্য করিলেই, ঐ মতের পোষকতায় মত দিতে ইচ্ছা হয়। যে ভারতে সতীত্বের আদর প্রিয়তম প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর ছিল,—যে রত্নরক্ষার জন্য ভারতের সতী রমণীগণ দলে দলে হাস্যমুখে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারিয়াছিলেন,—সে ভারতে আজ সতীত্বের মাপ পূর্ব্বপ্রচলিত "মাপকাটি"তে হইতে দেখা যায় না। সেই পূর্ব্ব আদর্শকে হীন ও খর্ব্ব করিয়া গঠিত করা হইতেছে দেখা যায়। ইহার হেতু কি? —এই প্রশ্নের উত্তরে—কালচক্র বা অদৃষ্টচক্র ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। সেই কালচক্রে বা অদৃষ্টচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া আজ সে সতীতেজ খর্ব্বতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অমোঘ কালচক্রের বা অদৃষ্টচক্রের প্রেরণায় বিদেশীয় ও বিজাতীয় জাতি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করায় তাঁহাদের দেশের হাব ভাব, রীতি নীতি ও সমাজ-পদ্ধতির প্রসার এদেশে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ উদারতা

বশতঃ এদেশের সমাজে প্রচলিত বহুবিধ অভিনব প্রথা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। পাশ্চত্যশিক্ষা আসিয়া ভারত-বাসীর মন অধিকার করিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বের সকল সংস্কারই কুসংস্কার—এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল। ঋষিবাক্য—বেদপুরাণ তন্ত্র—সমস্ত আগাধ জলধিতলে নিমজ্জিত হইল, এবং নব নব সুসংস্কার আসিয়া ভারতবাসীর মন বিমোহিত করিতে লাগিল। তাহাদের সম্মোহিনী শক্তি দুর্নিবার। সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণভেদে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জাতি-ভেদরূপ সুবৃহৎ বৃক্ষ ভারতবক্ষে বিরাজমান ছিল, তাহাই সর্ব্ববিধ কুসংস্কারের বীজ, ও তাহাই ভারতে যত প্রকার কুফল প্রসব করিতেছে ও সেই বিষ-ফল-সেবনে ভারতবর্ষ মৃতপ্রায় হইয়া সভ্যতার ও উন্নতির পথে আরোহণ করিবার শক্তি হারাইয়াছে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে ভারতবাসীরাও নানারূপ সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও সুসভ্য হইতে লাগিল, এবং সেই সুবিশাল শান্তি-তরুর মূলে কুঠারঘাত করিবার উপযুক্ত শাণিত অস্ত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে মূল এত প্রাচীন, এত কঠিন ও এতই দৃঢ় যে, কোন অস্ত্রই তাহার গাত্রের ত্বক্ পর্য্যন্ত ছেদ করিতে সমর্থ হইল না। যে যে শাখায় রকম রকম কুসংস্কারের ফল প্রসব করে, সেই সেই শাখা ছেদন করার জন্য কুঠার ব্যবহৃত হইতে লাগিল। যথা—

(১) কুসংস্কারের প্রথম শাখা—সমদৃষ্টির অভাব। চির-নিস্পৃহ ও বিবেকবৈরাগ্যবান্ হইলেও ব্রাহ্মণ কেন অপর জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য হইবেন? তাঁহার সে উচ্চস্থানে অবস্থান অসহ্য।

(২) দ্বিতীয় শাখা—পূর্ব্বতন সামাজিক প্রথাগুলি দূরীকরণের অনিচ্ছা, ও তাহা রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি।

(৩) তৃতীয় শাখা—সনাতন ধর্ম্মভাব ও পৌত্তলিকতা ও দেবদ্বিজ পিতামাতা পতি প্রভৃতি গুরুজনে দেবতার ন্যায় ভক্তি। ইহা উদার সমদৃষ্টির প্রতিরোধ করে, এই হেতু অসহ্য।

(৪) চতুর্থ শাখা—যৌথ হিন্দুপরিবার। ইহা আলস্যে ও পরমুখ চাহিয়া জীবনধারণের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং ইহা অসহ্য।

(৫) পঞ্চম শাখা—নারীর অবরোধ ও অবগুণ্ঠনপ্রথা। ইহা স্ত্রীজাতির দারুণ কষ্টকর, অশেষ ব্যাধিজনক ও উন্নতি-পথের কণ্টক স্বরূপ। যদিও এ শাখা অতি প্রাচীন নহে ও যেখানে মুসলমান রাজত্বের প্রভাব ও অত্যাচার বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই খানেই প্রচলিত হইয়াছিল, এবং যদিও ইহার বহু উপকারিতা আছে, তথাপি ইহা "ফাটক"। ফাটকে আটক রাখা নিদারুণ নির্দ্দয়তা, ও সহৃদয়তার অভাব হেতু ইহাও অসহ্য। ইত্যাদি।

ছেদকগণ আপন আপন কুঠার এক দেশেই ক্রমাগত শাণিত ও চালিত করিতে লাগিলেন। ধ্বংসকার্য্য সজোরে চলিতে লাগিল। পুরুষগণ ধর্ম্মভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট, আচারভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট, বিলাসী ও ইহকালসর্ব্বস্ব হইতে লাগিলেন ; এবং তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে পূর্ব্বের যথার্থ জ্ঞান, ভক্তি, বিদ্যা, সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য ও সাধুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি হইতে চিরবিদায় লইয়া অজ্ঞানী, অভক্ত, পণ্ডিতমূর্খ. অসংযমী, লম্পট ও অসৎ হইতে আরম্ভ করিলেন। বহির্জগতে—জড়জগতে—ষোলআনা মন ভরিয়া রহিল। অন্তর্জগতের দৃষ্টি লোপ হইল। নারীগণকে ঐ পাশ্চাত্য-

শিক্ষার বিষ প্রথমে জর্জ্জরিত করিতে পারে নাই। কিন্তু পুরুষ বিগড়াইলে নারী বিগড়াইতে বিলম্ব হয় না, এবং নারী মন্দ হইলে পুরুষ মন্দ হইতেও বিলম্ব ঘটে না। পুরুষগণ নিজ কুশিক্ষার বিষ নারীশরীরে সঞ্চারিত করিলেন। ক্রমে সন্তান সন্ততিতেও ঐ বিষ সংক্রমিত হইল। কয় পুরুষ গত না হইতেই অধঃপতন ক্রমশঃই নিম্নস্তরে উপনীত হইতেছে।

পুরুষ গুণান্বিত হইলে নারীও গুণান্বিতা থাকিবেন, ও তাহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফললাভ সুনিশ্চিত। সে জন্য মনু বলিয়াছেন—

"যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগাঃ ॥"

অর্থাৎ বিশুদ্ধ সুপেয় জলশালিনী নদী সকল লবণাক্ত জলধিতে মিশিয়া যেরূপ লবণাক্ত হয়, সেইরূপ সুশীলা পত্নীগণ দুঃশীল পতিসংযোগে দুঃশীলা হইয়া থাকে। অধুনা নারীগণেরও এই যে ইহকালসর্ব্বস্ব ভাব আসিয়াছে, তাহা তাঁহাদের কুশিক্ষা-দাতা পতিগণের কুশিক্ষার ফলমাত্র। কিন্তু মোহান্ধতা এতই প্রবল যে, এখনও চৈতন্যের উদয় হইতেছে না। উভয়েই এই সংসার-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন। যাহার তুলিবার কথা, সে-ই ডুবাইয়া দিতেছে,—ইহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

পুরুষের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য স্ত্রীলোকে চিরকাল করিয়া থাকেন, এবং সেই কার্য্যে যদি তাঁহারা নিজেদের যথেষ্ট সুখ স্বচ্ছন্দতা

নাই। উহা মন্দের ভাল। পতির সহিত অসদ্ভাব হইলেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর পতি গ্রহণের সুবিধাপ্রাপ্তি, প্রকৃত সতীধর্ম্মের বিশেষ অন্তরায়, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যদেশের ঐ আদর্শ এদেশে আসিয়া এক শ্রেণীর লোককে ঐ আদর্শ অনুকরণ করিতে লুব্ধ করিয়া হিন্দুত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। বিচিত্রতাই এ সংসারের রীতি। প্রতি দণ্ডে,—প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে,—এ নীতির ক্রিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। একেবারে অনশন বা বিবস্ত্র অবস্থা অপেক্ষা অর্দ্ধাশন বা অর্দ্ধউলঙ্গভাব নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত ভাল। উহাও সমাজের অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক। কিন্তু সে আদর্শ কখনই সর্ব্বোচ্চভাবে অনুপ্রাণিতা হিন্দুনারীর অনুকরণীয় হইতে পারে না। তাহা তদপেক্ষা অধঃপতিতা বা নিম্নে অবস্থিতা নারীর অনুকরণযোগ্য বটে। সে হেতু বিভিন্ন সমাজে এইরূপ বিচিত্রতার আবশ্যকতাও দৃষ্ট হয়। অন্ধকার না থাকিলে,—উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর ও উজ্জ্বলতম আলোকের মহিমা উপলব্ধি হয় না। যাঁহারা একেবারে অন্ধকারে আছেন, তাঁহারা তাহা হইতে উজ্জ্বল আলোকে আসিবেন; যাঁহারা উজ্জ্বল আলোকে আছেন, তাঁহারা উজ্জ্বলতর আলোকে আসিবেন, ও যাঁহারা উজ্জ্বলতর আলোকে আছেন, তাঁহারা উজ্জ্বলতম আলোকে আসিবেন,—এই এ সংসারের ক্রমোন্নতির পথ। সতীত্বের উজ্জ্বলতম আলোক হিন্দুশাস্ত্রকারগণ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই উজ্জ্বলতম আলোকই নারীজাতির সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য—ইহা একদিন এ দগ্ধ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল; এবং ক্রমে অন্ধকারের অশেষ নরকদুর্গতি অনুভূতির

পরে তাহা দূর করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আসিলে, আবার যে তাহাই সকলের আদর্শ ও লক্ষ্য হইবে, ইহা ভাবিলে বা বলিলে বোধ হয় তাহা বাতুলতা মাত্র না হইতে পারে।

মহেশ্বর পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—"তুমি জগতের মাতা হইয়া কি প্রকারে জগতের ঘরে ঘরে বধূরূপে বিরাজ করিতেছ—এই ভাবিয়াই আমি পাগল হইয়াছি।" উহাতে ভোলানাথের পাগল হইবার যথেষ্ট কারণ দর্শিত হইয়াছে। এ বিষয়—মহামায়ার এ লীলা—বুঝিতে চেষ্টা করিলে পাগল হইবারই কথা। মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক কি ছার! একই নারী-দেহে মাতৃত্ব ও বধূত্ব বিরাজিত থাকায়, এবং একই পুরুষ-দেহে পুত্রত্ব ও পতিত্ব প্রকাশিত থাকায়, পতিপত্নী ভিন্ন উভয় দেহ সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারগণ উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষার বিধান করিয়া গিয়াছেন। সেই বিধানে নর ও নারী, যেরূপই নিকট সম্পর্কের হউন না কেন, কখনও পরস্পরকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না। পাদবন্দনাকালেও সেই জন্য নিজ গর্ভধারিণী ভিন্ন অপর পূজ্যা স্ত্রীলোকেরও পাদস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ। পাদপদ্মের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিবার ব্যবস্থা আছে। এ কঠোরতা তাৎপর্য্যহীন নহে। সন্তান ভিন্ন অপর পুরুষ—তিনি যিনিই বা যাহাই হউন—সুপবিত্র হিন্দুনারী-দেহের পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার অধিকার লাভ করেন নাই। এই পবিত্রতা রক্ষার নিয়ম কি অনুপম নহে? সতীনারী-অঙ্গ অপর পুরুষের বিন্দুমাত্র স্পর্শেই কলুষিত হইতে পারে। সতীত্ব-রক্ষার—নারীদেহের পবিত্রতা রক্ষার সেই নিরুপম আদর্শ আজ

কোথায়? অমূল্যনিধি রক্ষার জন্য এরূপ সতত সতর্ক প্রহরী নিয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সম্যক্ জ্ঞাত থাকিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলুষস্পর্শে কলুষিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। ব্যভিচারের প্রথম পদবিক্ষেপ—বিন্দুমাত্র কলুষিত স্পর্শ। সে জন্য মাতৃজাতির পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে, মাত্রপাদপদ্মস্পর্শ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্যসভ্যতায এ আদর্শ বর্ব্বরতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু আদর্শ অতি উচ্চে রাখিবারই ব্যবস্থা। অনেক সময়ে সেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ-স্থান স্পর্শ করিতে না পারিলেও, তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেই উচ্চভূমি লাভ হয়। নতুবা আদর্শ নিম্নে থাকিলে, আরও নিম্নেই থাকিতে হয। আর্য্যগণ আর্য্যনারীগণের পক্ষে ঐরূপ অতি উচ্চ আদর্শ দিযা গিয়াছিলেন বলিয়াই এখনও পতিতা হইয়াও হিন্দুনারীগণ এত উচ্চ-ভূমিতে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন যে, এই পাশ্চাত্যশিক্ষার ও সমাজবিপ্লবের মহাবন্যায় দেশ প্লাবিত হইলেও, সকলেই সম্পূর্ণ অধঃপতনের সাগর-জলে ভাসিয়া সেই সাগর-তলে ডুবিয়া যান নাই ও যাইবেন না। এই ভারতবর্ষ ব্যতীত জগতের নারীসমাজের দুরবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারীমাত্রেই নারীঘটিত কথাবার্ত্তা পরিত্যাগ করিবে; কেননা প্রবল ইন্দ্রিয়সকল যতিরও মন হরণ করে। যুবাশিষ্য যুবতী গুরুপত্নীদ্বারা আপনার কেশপ্রসাধন, গাত্র

মর্দ্দন, স্নপন অভ্যঞ্জনাদি কার্য্য করাইবে না। কারণ প্রমদা অগ্নিতুল্য, পুরুষ ঘৃতকুম্ভসদৃশ; নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থিতি নিষিদ্ধ" ইত্যাদি।

রক্তমাংসের শরীর সংযমব্যতিরেকে বিশ্বাসের পাত্র নহে। কখন কি বিকারে কি কার্য্য করিবে—ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অগ্নি ও ঘৃত পরস্পর নিকটবর্ত্তী রাখিলেই ঘৃত গলিয়া অগ্নিসাৎ ও ভস্মসাৎ হয়—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর অগ্নি ও ঘৃতের ন্যায়। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধই থাকুক না কেন, পরস্পর পৃথক থাকিবেন,—ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

শ্রীমদ্ভাগবতে নারীকে অগ্নির সহিত ও পুরুষকে ঘৃতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু চাণক্য পণ্ডিত মহাশয়—"ঘৃতকুম্ভা সমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্" লিখিয়া নারীকে ঘৃতকুম্ভ ও পুরুষকে অগ্নিসম বলিয়াছেন। যুবতীকে "আগুনের খাব্‌রা" বলিয়াই ভাষাকথায় বলে ও তাহাকে সেই জন্য সতর্কতার সহিত রাখিবার ব্যবস্থা। বর্ত্তমানকালে পুরুষ নিজ ব্রহ্মচর্য্যের তেজ ও উত্তাপ হারাইয়া যেরূপ প্রকৃত পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্ব হারাইতেছেন, তাহাতে তাহাকে আর অগ্নির সহিত তুলনা না করিয়া নির্জীব ঘৃতকুম্ভ বা "তৈলটিন" বলিলে উপমা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও উপযুক্ত হইবার সম্ভাবনা; এবং নারী যেরূপ উষ্ণ দেহধনু দ্বারা মদনের ফুলশর হানেন, যেরূপ নয়নযুগল দ্বারা কামাগ্নিশিখা বাহির করেন, তাহাতে তাঁহাকে অগ্নি বা তপ্তাঙ্গার বলিয়া তুলনা করাই বোধ হয় যোগ্যতর। অঙ্গনা বিদ্যুতের অগ্নি। উহা "দরশনে" অতি মনোরম বটে, কিন্তু "পরশনে" মরণ।

আনয়ন করে। যাহাহউক, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যিনিই ঘৃত বা অগ্নি হউন, পরস্পরের গুণ অনুসারে তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া পৃথক্ রাখাই,—তাহাদের যোগ অপেক্ষা বিয়োগ করিয়া রাখাই,—মানবসমাজে সর্ব্বমঙ্গলজনক বলিয়াই শাস্ত্রের বিধি।

ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের নারীগণকে উচ্চশিক্ষা, স্বাধীনতা, উদারতা, সামাজিকতা প্রভৃতি অগণিত গুণরাশিতে ভূষিতা দেখিয়া, তাঁহারাই অনুকরণ-প্রিয় ও কুসংস্কারদ্বেষী আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিতসমাজের আদর্শস্থানীয়া। আমাদের দেশের নারীগণের সেরূপ উচ্চশিক্ষা, উদারতা, স্বাধীনতা, সামাজিকতা প্রভৃতি কোন গুণের লেশমাত্র নাই বোধ করিয়া, তথাকথিত শিক্ষিতসমাজ প্রাচ্য নারীগণকে প্রতীচ্যের নারীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করাইবার প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রতীচ্য নারীজীবনের গভীর স্বচ্ছ সরোবর স্নানপানে মন বিমুগ্ধ করে; সুতরাং তাহাই আদর্শরূপে অনুকরণীয়—এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সেই পথে ভারতনারীজীবন চালিত করিবার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু সেই স্বচ্ছসরোবর-সলিল মধ্যে কত অসংযম, স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচাররূপ মকর কুম্ভীর প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জলজন্তু সকল (যাহা আমাদের এই জলে জন্মায়ও না ও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত) যে ডুবিয়া রহিয়াছে ও কত ভীষণ অপকার সাধন করিতেছে, সে দিকে দৃষ্টিপাত নাই। ভারতের তুলনায় ঐ সকল দেশের দাম্পত্যসুখ ও শান্তি এত অল্প ও ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী যে, সে সুখশান্তি নাই বলিলেও চলে। ঐ সকল দেশে স্থাপিত ও প্রচলিত অনাথ বালকবালিকা-

'গণের আশ্রম দেখিলেই সে দেশের নারীজাতির সতীত্বের সৌরভ যে কত উগ্র, তাহার আঘ্রাণ পাওয়া যায়। বাল্য-বিবাহ মহা কুসংস্কার ও সমাজের মহা অমঙ্গলকর বিবেচিত হয়, ও তাহা ঐ সকল দেশের সভ্যতার অনুমোদিত না হওয়ায় প্রচলিত নাই। যৌবন বা প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্যবিবাহ সমাজের মহা হিতকর ও সুসংস্কার সঙ্গত থাকা হেতু সেইরূপ বিবাহপ্রথা তথায় প্রচলিত আছে। কিন্তু সে সকল দেশের নরনারী অসাধারণ অসংযম ও ব্যভিচার দোষে দুষ্ট থাকায়, যৌবন প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্য বিবাহের পূর্ব্বেই জ্বলন্ত কামানলে সর্ব্বদাই পূর্ণাহুতি পড়িতে থাকে, ও নারীগণ সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও বহু সাবধানতা ও কৌশল অবলম্বন সত্ত্বেও সন্তান প্রসব করিতে বাধ্য হন, কিন্তু স্বহস্তরোপিত বিষ-বৃক্ষের ফল সূতিকাগারে নষ্ট না হইলে, তাহাদিগকে পিতামাতার নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া রাশি রাশি ঐরূপ অনাথ আশ্রমে প্রেরণ করা হয়, ও তদ্দারা জনকজননীর ভীষণ লজ্জা ও সতীত্ব সুরক্ষিত হয়। ঐরূপ কত শত আশ্রমে কত সহস্র অনাথ বালকবালিকা লালিত পালিত হয়। তাহাদের সুসভ্য ও সুশিক্ষিত পিতামাতা সশরীরে মর্ত্ত্যজগতে বর্ত্তমান থাকিতেও তাহারা পিতৃমাতৃহীন অনাথ। ঐ সকল অনাথ-আশ্রম বা 'অনাথ-নিবাস সুসভ্যতার ও উচ্চশিক্ষার কীর্ত্তিস্তম্ভ। দুঃখের বিষয়, উহারা আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত ও পাশ্চাত্যজগতের অনুকরণপ্রিয়,—সে সব দেশের সব ভাল, কিছু মন্দ নাই—এ দেশের সব মন্দ, কিছুই ভাল নাই—এইরূপ সিদ্ধান্ত-কারী জনগণের ব্যভিচার-সমুদ্র মধ্যে আলোকস্তম্ভের ন্যায় সে সাগরগর্ভস্থ বিপদ-শৈল-প্রদর্শকের কার্য্য করিতে পারে না।

শুনা যায় যে, ঐ সকল দেশের যে সকল নারী অপেক্ষাকৃত ইতর শ্রেণীভুক্ত, তাহারা তাহাদের শিশুসন্তানসহ পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিলে পথিকের জিজ্ঞাসায় বলিতে থাকে—"এই কয়টি আমার বিবাহের পূর্ব্বের, ও এই কয়টি পরের।" অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষা বা কোন শিক্ষা না থাকায়,—সুশিক্ষা ও সুসভ্যতার চূড়ায় আরোহণ না করিতে পারায়,—তাহারা সেরূপ সন্তানগণের মাতার নাম জানিতে দেয়; পিতার নাম অবশ্য চিরকালই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। পিতার নাম বা পরিচয় সে সকল সুসভ্য দেশে জিজ্ঞাসা করা মহাপাপ ও অসভ্যতা-সূচক বলিয়াই বিবেচিত হয়। সে সব দেশে বীরবর কর্ণের নীতি অনুসারে বলা হয়—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যোবা সোবা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্॥"

অর্থাৎ আমি সূত বা সারথিই হই বা সূতপুত্রই হই, যে বা সে আমি হই না কেন, সৎকুলে জন্ম দৈবাধীন, কিন্তু পৌরুষ আমার আয়ত্ত।

ঐ সকল দেশের বিবাহে—"ভালবাসা, সম্মান ও বশ্যতা প্রদর্শন কর" ("Love honour obey")—এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়। তথায় মনুষ্যত্বে ও পশুত্বে এত অল্প পার্থক্য রক্ষিত হয় যে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব অল্পই লক্ষিত হয়। ঐ মন্ত্র উচ্চারণের অল্পকাল পরেই স্বামীস্ত্রী উভয়েরই ভুল হইতে দেখা যায়, এবং "ভালবাসা সম্মান ও বশ্যতা"র পরিবর্ত্তে—"ঘৃণা, অসম্মান ও অবাধ্যতা" পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়া বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে সহজ আইনজ

অস্ত্রপ্রয়োগে বাধ্য হইতে হয়। তৎপরে আবার ঐ মন্ত্রপাঠ, আবার বিস্মরণ, আবার বন্ধন-ছেদন,—এইরূপ আজীবন হইতে থাকে।, দাম্পত্য-সুখ ও গৃহস্থাশ্রমের শান্তির বিমল শীতল ছায়া-লাভ সে সব দেশে তাই অতি অল্প ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ভারতে "সতীত্ব" শব্দে যে অর্থ হয়, তাহার বোধ ঐ সকল দেশের নাই। পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার; উভয়ের আপন আপন বা ব্যক্তিগত অধিকার আছে অর্থাৎ যাহার সহিত ইচ্ছা আহার বিহার করিবার ক্ষমতা আছে, ও তাহাতে অপরের আপত্তি করিবার অধিকার নাই। অর্দ্ধাঙ্গিনী,—যেমন তেমন অর্দ্ধাঙ্গিনী নহেন, উত্তম অর্দ্ধাঙ্গিনী। সুতরাং নারী পুরুষের উত্তমাঙ্গ। সে উত্তমাঙ্গ যে কত বিকৃত, তাহা জগদ্বিখ্যাত। সুতরাং সে সব সমাজ যে কত বিকৃত, ও এ দেশের সতীসমাজের সম্মুখে বর্ত্তিকা ধারণও করিতে পারে না, ও সেখানকার সতীত্বালোক যে অতি হীনপ্রভ ও নিস্তেজ,—তাহা বলাই বাহুল্য। তথায় সতীত্বের প্রতিশব্দ fidelity বা সাধুতা, বিশ্বস্ততা, অর্থাৎ পরদার বা পরপুরুষগমনে বিমুখতা। সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য অভাবে পশুজীবনে সে সাধুতা বা বিশ্বাস সর্ব্বত্র রাখা বা থাকা অসম্ভব। সেইজন্য বিবাহের পবিত্র বিশ্বাস পরস্পরের দ্বারা রক্ষা করা দায় হয়, ও সে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইলে প্রায়ই ডাইনীর কোলে পুত্র সমর্পণ করা হয়। তাহার পরিণাম বিবাহবন্ধনছেদন ও পলায়ন।

নারীর রূপগুণ আদি নিজপতি ভিন্ন অপরকে প্রদর্শন করিবার, এবং তদ্দারা অপরকে লুব্ধ বা মুগ্ধ করিবার বা জনসাধারণের

সুখ্যাতিলাভ করিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা অতি কুপ্রবৃত্তি, ও তাহা হিন্দুর সতীত্ব-আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহা সতীত্ব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা রাজরাণীর যোগ্যা ত নহেই, এমন কি, সে রাজবাটিতে প্রবেশ করিবারও অধিকারহীনা, পথের ভিখারিণীর উপযুক্ত। ঐ জঘন্য ভাবে নারীজীবনের কলঙ্কই সূচিত হয়; তদ্দ্বারা নারী-জীবনের কপটতা ও চরিত্রহীনতাই সূচিত হয়। এদেশে ভাষা কথায় তাহাকে "ছিনালী" বলে। উহা দুষ্টা স্ত্রীলোকের চতুরতা বা হাবভাব বলিয়াই এদেশে প্রসিদ্ধ। তাহা এদেশের আদর্শ নহে; তাহা বিদেশীয় আদর্শ হইতে পারে। নারীজীবনের বিশুদ্ধতম ভাব যে সতীত্ব হিন্দুর আদর্শ, সে আদর্শ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অপর ধর্ম্মে বা দেশে নাই। খৃষ্টান বা মুসলমান জগতে সেইজন্য অতি জঘন্যশ্রেণী হইতেও পত্নীনির্ব্বাচনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বিবাহ-মন্ত্রোচ্চাবণরূপ বাজিকরের দণ্ডস্পর্শদ্বারা পূর্ব্বপাপজীবনের যত অপবিত্রতা ও অনাচার-পাপ ধৌত হইয়া গিয়া বিশুদ্ধিপ্রাপ্তি ও পত্নীরূপে গ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয় বিবেচিত হয়, এবং অনেক স্থলে সেইভাবে সে সব জাতির বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের পূর্ব্ব রজনীতে যে নারী বারবিলাসিনীর জীবন যাপন করিয়াছে, পরদিন প্রভাতে বিবাহমন্ত্রস্নান দ্বারা সে পবিত্রা হইয়া কাহারও পত্নী হইয়া যায়। কিন্তু কাকপুচ্ছ দুগ্ধসমুদ্রে শতস্নানেও কৃষ্ণত্ব ত্যাগ করে না। কলঙ্কিনী-চরিত্রের কলঙ্ককালিমা কয়লার বর্ণের ন্যায় শতবার বিবাহমন্ত্রজলে ধৌত করিলেও দূর হয় না। কেহ কেহ পূর্ব্ব-জীবনের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন,

কিন্তু অধিকাংশস্থলেই স্বভাব মূর্দ্ধায় বর্ত্তমান থাকিয়া অচিরে আত্মপ্রকাশ করে। অনেকস্থলে বিবাহ "সুবিধার বিবাহ" (marriage of convenience) হইয়া থাকে। উহার অনেক কারণ ও শ্রেণী আছে। তাহার দ্বারা বিবাহের ধারণা যে কত নিম্ন, তাহা প্রকাশ পায়। অনেকে বিবাহ-পাশে আবদ্ধ ঐরূপ সর্ব্ববল্লভা স্ত্রীকে সম্মুখে রাখিয়া সংসার-সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ও ভার্য্যাট-জীবনে তৃপ্ত থাকিয়া, নিজ স্ত্রীকে পরপুরুষভোগ্যা করার অনুমতি ও সুবিধা দিয়া সেইরূপে---সেই অতি ঘৃণিতভাবে লব্ধ অর্থে মহাসুখে কালাতিপাত করে। উহা বিবাহের পরিহাস মাত্র নহে কি? সুসভ্যতার অপার মহিমা! ভারতবর্ষকে—হিন্দুকে—অসভ্য বর্ব্বর বলিবার স্পর্দ্ধাও কিন্তু ঐরূপ সব সুসভ্য-দেশ দেখায়। ইহা অদৃষ্টের পরিহাস নহে কি? বাতুলতা ও সুসভ্যতার নামে ঘোর বর্ব্বরতা কত প্রকারই এ জগতে দৃষ্ট হয়! দারুণ আক্ষেপের বিষয় এই যে, ঐরূপ বর্ব্বরতাপূর্ণ সুসভ্যতাও এদেশে অনুকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

জাপানে নর্ত্তকীগণকে "গায়সা" বলে। সেদেশে অনেকে সেই শ্রেণী হইতেও পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে মনে করেন যে, পাপপঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া পত্নীত্বে বরণ করিলেই সমস্ত পাপপঙ্কই নারীদেহ হইতে বিধৌত ও দূরীভূত হইয়া যায়, ও সেরূপ পত্নীও নিষ্কলঙ্ক শশীর ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়-গগনে বিমল দাম্পত্যসুখের জ্যোৎস্না বিতরণ করে। এ জগতে হৃদয়-গঠনের বা মনোবিকারের যে কত তারতম্যই লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সতীন্দ্র।

৮। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ইহার স্থান বা সম্বন্ধ।—

ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গলাভের জন্যই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ। দেহস্থিত প্রাণ উক্ত চতুর্ব্বর্গলাভের হেতু। শরীর বা দেহ সেই প্রাণের আধার। মানবের এই মন-প্রাণরূপ আধেয় ও দেহরূপ আধারের সহিত এত নিকট সম্বন্ধ যে, একের অমঙ্গলে অপরের অমঙ্গল হয়। দেহের আরোগ্য বা নীরোগভাব বা স্বাস্থ্য সেহেতু উক্ত ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ-লাভের মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

চরকসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমং।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের আরোগ্যই বা স্বাস্থ্যই উত্তম মূল; রোগসকলই সেই সকলের, এবং জীবনের সর্ব্বমঙ্গলের অপহারক।

বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে তাহা যেমন বাঁচিতে পারে না, মানবশরীরের মূলস্বরূপ এই স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইলে, শরীর-বৃক্ষও নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য সাংসারিক সকল উন্নতির মূল কারণ সুস্থ দেহে সুস্থ মন। শরীরপালনের জন্য,—শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য,—স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিধিনিষেধ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

সেগুলি সম্যক্ পালন করিলে, স্বাস্থ্যসুখের ন্যায় মহাসুখ অনুভব করা যায়, ও তাহাদের অপালনে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে, রোগের যাতনায় জীবন্মৃত হইতে হয়, এবং ক্রমে কালের করালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। সেই জন্যই কথিত হয় যে, স্বাস্থ্যের ন্যায় মানবের হিতকারী বন্ধু ইহজগতে আর নাই, এবং অস্বাস্থ্য বা রোগের ন্যায় কষ্টদায়ক শত্রুও আর নাই। ধর্ম্মসাধনের প্রধান সহায় নীরোগ শরীর ; ইহকাল ও পরকাল, উভয়কালের সদ্গতি ও উন্নতিলাভের পথ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা দ্বারাই প্রশস্ত হয়।

শাস্ত্রকারগণ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বযুক্ত এই দেহকে ক্ষেত্র বলেন, এবং আত্মাকে দেহী বা ক্ষেত্রী বলেন। এই দেহ-ক্ষেত্র হইতেই সেই আত্মা-ক্ষেত্রীর সন্ধানলাভ হয়। সেহেতু এই ক্ষেত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধক তাই গাহিয়াছেন—

"মানব-দেহের মাঝে আজব কারখানা,
দেহ ধর্ম্ম-ক্ষেত্র এ বিচিত্র রহস্য কেউ বোঝে না॥
দেহ-রাজ্যে রাজা মন,   ইনি ধৃতরাষ্ট্র হন,
সৎ অসৎ দেখিতে ইঁহার নাহিক নয়ন।
(দেখ) রাজার পুত্র ইন্দ্রিয়গণ কারুর কথা মানে না॥
দেহে এই দু'টি দলে   সদা দুইদিকে চ'লে,
পরস্পর বিরোধী হ'য়ে যুদ্ধ ঘটালে।
(এরূপ) নিয়ত হ'তেছে সমর গুরুর কৃপায় যায় জানা॥"

ভক্ত ও সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ তাই মনের উপর দুঃখ করিয়া গাহিয়াছেন—

"মনরে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-দেহ রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা॥ ইত্যাদি"

সতীত্ব ঃ

প্রকৃতই এই দেহ-ক্ষেত্র শাস্ত্রসঙ্গতভাবে "চাষ আবাদ" করিলে সোনা ফলে, বা মনুষ্যজীবনধারণ সার্থক হয় ; কিন্তু অবহেলায় আবাদ না করিলে, কৃষিকার্য্য না জানিলে, মাত্র আগাছায় তাহা পূর্ণ থাকিয়া দুর্লভ মনুষ্য-জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

এই মানবদেহকে ক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র বলা হইয়াছে। পাপ-মনের,—ধৃতরাষ্ট্রের ইন্দ্রিয়াদি কুপ্রবৃত্তিরূপ শত পুত্রগণের সহিত ধর্ম্মপুত্র ও তাঁহার সহোদররূপ সুপ্রবৃত্তিনিচয়ের মহাসমর এই ক্ষেত্রেই নিয়ত হইতেছে। ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম দ্বারা এই যুদ্ধে জয়লাভ বা ধর্ম্মলাভই মনুষ্যত্ব ; এবং তাহাদের বশ্যতা-স্বীকার বা পরাজয়ই বা অধর্ম্মলাভই পশুত্ব। শাস্ত্রে সেইজন্য নির্দ্দেশ আছে—

> "বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
> অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়ানাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম না করিলে, শাস্ত্রগর্হিত নিন্দিত কর্ম্ম করিলে, এবং ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ বা সংযম না করিলে মনুষ্য পতিত হয়। সেহেতু অন্যান্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ অন্যায় বা পাপকর্ম্মের ন্যায়, ইন্দ্রিয়সংযম না করাও পাপ সৃষ্টির কারণ ও পতনের হেতু হয়। জলপ্রবাহের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে —পাপ-পথে। রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ—এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি মনকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করায়। মনুষ্য কেন, সৃষ্ট সমস্ত প্রাণিজগৎ—এই খেলা খেলিতেছে ও ভুগিতেছে। অগ্নিশিখার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কত কীট পতঙ্গ পুড়িয়া মরে। রসের লোভে আকৃষ্ট হইয়া কত প্রাণী ডুবিয়া

মরে। শব্দে বা বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া কত মৃগ স্বাধীনতা বা প্রাণ হারায়। পুষ্পের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কত অলি কত ছুটাছুটি করে। স্পর্শসুখে আকৃষ্ট হইয়া গৃহ পালিত হস্তিনীর দ্বারা কত স্বাধীন বন্য হস্তী বদ্ধ হয়। মানুষ যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিয়া এই পাঁচটির আকর্ষণে পড়িয়া কার্য্য করিতে থাকে, তবে তাহার কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মনই ইন্দ্রিয়গণের চালক, ও তাহার শক্তিও অসীম। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় আপন বিভূতি বর্ণনাকালে বলিয়াছেন— "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি"—অর্থাৎ "আমি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন।" এই মন-রাজাকে বিবেক বা হিতাহিতজ্ঞান বা সদসৎবিচারবুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা বশীভূত করিতে ও রাখিতে পারিলে, মন-রাজার প্রজাবর্গ ইন্দ্রিয়গণকে ও তাহাদের রাজধানী এই দেহকেও স্ববশে রাখিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। নতুবা সে রাজ্যে বাস মহা অসুখকর ও অশান্তিময় হয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল স্বর্ণনির্ম্মিত হইলেও তাহা বন্ধনের হেতু। এই ইন্দ্রিয়-বন্ধন, —এই দেহ-বন্ধন হইতে অব্যাহতিলাভই প্রকৃত মনুষ্যত্বজ্ঞাপক। ঐ অব্যাহতিলাভ বা মুক্তিই মানবজীবনধারণের চরম উদ্দেশ্য, এবং দেহের স্বাস্থ্য তাহার প্রধান উপায়। এই স্বাস্থ্যরক্ষারূপ উপায় অবলম্বন দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নরের সাধুত্ব ও নারীর সতীত্ব বা নরনারীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবত্তাই সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পূর্ব্বসূচনা, এবং ধর্ম্মপথের প্রদর্শক ও দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন।

পরস্ত্রী বা পরপুরুষগমন করিলে সংযমের বিশেষ অভাব প্রকাশ পায়, ও তাহা দারুণ চরিত্রহীনতার পরিচয় প্রদান করে

সত্য ; কিন্তু স্বামীস্ত্রীর মধ্যেও ব্যবহারে উপপতি-উপপত্নীর ঘৃণিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোগবিলাসে ঘোর অসংযমীর জীবন যাপন করিলে যে সংযম ও চরিত্ররক্ষা হয়, এমন নহে। স্বামীস্ত্রীর মধ্যেও ইন্দ্রিয়সংযম না থাকিলে, তাহাও ব্যভিচারী জীবনের রূপান্তর মাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। সহধর্ম্মিণীর সহিত যদি ধর্ম্মসংশ্রব না থাকে, এবং কেবলমাত্র দেহ-সম্বন্ধই থাকে,—তাহা হইলে তাহা ঘোর নারকীয় ব্যাপারে পরিণত হয় না কি? হইলেনই বা তাঁহারা স্বামীস্ত্রী; কিন্তু কেবলমাত্র কাম-তাড়িত হইয়া তাঁহারা পরস্পর আকৃষ্ট ও মিলিত হইলে, তজ্জাত সন্তানে জারজত্ব দোষ স্পর্শ করে না কি?

হিন্দুর পক্ষে পরস্ত্রী মাতার সমান। পরস্ত্রীগমন সেজন্য হিন্দুজীবনে মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অসংযতভাবে ইন্দ্রিয়সেবায় পতিপত্নী উভয়ের স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও নষ্ট হইয়া যায়। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়-সেবার প্রবৃত্তিই এইরূপ (আধিক্যের দিকে ধাবিত), কিন্তু নিবৃত্তিই মহা সুফল প্রসব করে; ইহাই শাস্ত্রের শিক্ষা। স্বীয় পত্নীতে অভিগমন সম্বন্ধে সেইজন্য শাস্ত্রে কত বিধিনিষেধ আছে। রাজ্যে যে প্রকার ব্যভিচারেই হউক, জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই যে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়,—এ শিক্ষা হিন্দুর ছিল না। পিণ্ডপ্রদানের জন্য,—পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্যই হিন্দুর পুত্র-কামনা; এবং সেই পুত্র উৎপাদনের জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—অর্থাৎ আপনিই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইতে হয়। সেহেতু পিতামাতা যেরূপ সু বা কু প্রকৃতিযুক্ত

হন, সেইরূপ প্রকৃতিই সন্তানে বর্ত্তায়। সুসন্তানলাভের জন্য তাই জনকজননীর সৎ-স্বভাবযুক্ত হইবার ব্যবস্থা। অসংযমী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পিতামাতার ঔরসে ও গর্ভে সেইরূপ অসংযমী ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র সন্তানই জন্মে, এবং সৎস্বভাব ধার্ম্মিক পিতামাতার সেইজন্য সুশীল ধার্ম্মিক সন্তান জন্মে। এসংসারে সন্তান হইতে মানুষের যত সুখ বা দুঃখ লাভ হয়, এত আর কিছু হইতে হয় না। সেইজন্য কথিত হয়—

"অজাতমৃতমূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখকরাবাদ্যৌ অন্তিমস্তু পদে পদে॥"

অর্থাৎ—পুত্র জন্মে নাই, জন্মিয়া মৃত হইয়াছে, ও জন্মিয়া মূর্খ বা কুচরিত্র হইয়া বাঁচিয়া আছে,—এই তিন অবস্থার মধ্যে প্রথম দুইটী বরং ভাল, কারণ সে দুঃখ কেবল একবারই পাইতে হয়; কিন্তু শেষ অবস্থাটি—মূর্খ বা কুপুত্র—পদে পদে সারাজীবন দুঃখ দেয়। কুসন্তানজনিত এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রকারগণ কুসন্তানলাভের আশঙ্কা দূর করিবার মানসে দারোপগমন সম্বন্ধে কতই বিধিনিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের রজোদর্শন দিন হইতে ষোড়শ দিন ঋতুকাল; এই সময় মধ্যে যুগ্ম দিনে স্বামীস্ত্রী পবিত্রমনে থাকিয়া সন্তানোৎপাদন করিবেন, ও প্রতিঋতুকালে একদিন মাত্র স্ত্রীসহবাস ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনের হানিকারক নহে,—ইহা শাস্ত্রের বিধান। ঋতুর প্রথম তিন দিন সহবাস একেবারে নিষিদ্ধ, ও তদ্দ্বারা স্বামীস্ত্রীর আয়ুঃ, বল ও তেজঃ—ক্ষয় হয়, এবং চক্ষুর হানি ও মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। স্ত্রীর আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি স্থানচ্যুত হইয়া অধিক রক্তস্রাব, বাধক-

ব্যথা ও প্রদরাদি রোগের সৃষ্টি করে, ও পরকালে উভয়ের নরক-বাস ঘটিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। উক্ত প্রথম তিন দিন, এবং অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি—এই পঞ্চ পর্ব্বদিন সহবাসপক্ষে নিষিদ্ধ। বুধবারও নিষিদ্ধ দিন। ঋতু-কালের চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি পর পর রাত্রি তেজস্বী সুসন্তান জননের প্রশস্তকাল বলিয়া উক্ত হয়। শুনা যায় ঋতুকালমধ্যে শেষভাগের অংশে জাত সন্তান গৌরবর্ণ হয়, এবং প্রথম প্রথম দিকের জাত সন্তান কৃষ্ণবর্ণ হয়। ষোড়শ রাত্রির পর ঋতুকাল গত হওয়ায় স্ত্রীসংসর্গ সন্তান উৎপাদনের জন্য হয় না বলিয়া তাহা নিষিদ্ধ। দিবাভাগে স্ত্রাসঙ্গ অতীব স্বাস্থ্যহানিকর বলিয়া একেবারে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রানুমোদিত বার তিথি নক্ষত্র আদি ত্যাগ করিলে প্রতি মাসে অতি অল্প রাত্রিই স্ত্রীসম্ভোগ জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে দেখা যায়, এবং তদ্দারা শাস্ত্রকারগণের মহৎ অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়।

আহার্য্যদ্রব্যের কত সারাংশ একবিন্দু রক্ত হয়, এবং সেই রক্তের ৪০ চাল্লশ বিন্দুতে একবিন্দু শুক্র জন্মে, সুতরাং শুক্র বা বীর্য্য যে শরীরের কত সারাংশ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সেজন্য মনু বলিয়াছেন "ব্যর্থীকারেণ শুক্রস্য ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ" —অর্থাৎ— "বৃথা শুক্রক্ষয়ে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়।" তাহার পরিমিত ও উচিত ব্যয় যে স্বাস্থ্যের বা জীবনের পক্ষে কত হিতকর, ও তাহার অপরিমিত ও অনুচিত ব্যয় যে কত স্বাস্থ্যহানিকর, ও অশেষ রোগের নিদান, ও পরে মৃত্যুর কারণ হয়, তাহা শাস্ত্রকারগণ সম্যক্ জ্ঞাত থাকিয়া হিন্দুজাতির—তাঁহাদের স্নেহের বংশধরগণের—কত মঙ্গলকামনায় ঐরূপ

সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কুপ্রবৃত্তির—অসংযমের স্রোতে সেই সব শাস্ত্রীয় সুব্যবস্থা কোথায় ভাসিয়া গিয়া হিন্দুসমাজের যে বর্ত্তমান অবস্থা আনিয়াছে, এবং সেই স্রোতে বাধা না পড়িলে ও তাহা না থামিলে, এ জাতির ধ্বংসের যে আর বিলম্ব নাই, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। কোন জাতির স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হইয়া উভয়ের চরিত্র নির্ম্মল ও উন্নত না হইলে, জাতীয় উন্নতির—বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির—আশা সুদূরপরাহত হয়। আধুনিক সময়ে দেখা যায় যে, বাল্যকাল হইতে বালকবালিকাগণ অসংযত পিতা-মাতার কুপ্রবৃত্তিরাশি তাঁহাদেব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়, এবং বাল্যকাল গত না হইতেই, অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনে ইন্দ্রিয়-সুখভোগে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাস্থ্যনাশ,—চরিত্রনাশ,—সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করে। বালিকাদিগের মধ্যে ঐ কুপ্রবৃত্তি ও কুঅভ্যাসের বীজ কালে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়, এবং ঐ লালসা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া নারী-দেহকে ব্যাধিমন্দির করিয়া তুলে। নারীদেহে যত প্রকার কুৎসিত ও কষ্টকর রোগ জন্মে, তাহার অধিকাংশই অপরিমিত পুরুষসঙ্গের ইচ্ছার ও কার্য্যের ফল।

নরনারীর সতীত্ব ও সংযমে আদর থাকিলে ঐ সকল রোগ প্রায়ই আক্রমণ করিতে পারে না। উহাদের সংখ্যার যেন শেষ নাই। ঐ সকল রোগের মধ্যে কতকগুলির পরিচয়, কারণ ও লক্ষণাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। প্রমেহ বা গণোরিয়া।

কারণ—সাধারণতঃ প্রমেহবিষের সংস্পর্শে ও অপবিত্র

সহবাসেই এই রোগ জন্মে। প্রমেহরোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকের সহিত সহবাসে পুরুষগণ, এবং প্রমেহযুক্ত পুরুষের সহবাসে স্ত্রীলোকগণ এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোক অতিরিক্ত ও অনিয়মিত এবং যথেচ্ছ সঙ্গমে রত থাকে, অথচ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখে না, তাহারা অপরের বিনা সংস্পর্শে আপনাআপনিই এই পীড়ার সৃষ্টি করে। প্রমেহজনিত পুজে "গণো কক্কাস" নামক যে এক প্রকার ক্ষুদ্র বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ঋতুমতী বা প্রদরস্রাবযুক্তা নারীর সহবাস, অতিরিক্ত সহবাস প্রভৃতি কারণেও এই রোগ জন্মাইতে পারে।

প্রমেহ রোগ দুই প্রকার ; তরুণ ও পুরাতন। তরুণ ও পুরাতন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সংযমই সাধুতা ও সতীত্বের মূল। সে হেতু নরনারীর চরিত্রে সংযম ও সতীত্ব থাকিলে ঐরূপ কুৎসিত রোগের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ হইয়া থাকে। নতুবা ঐরূপ রোগযন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারা সুকঠিন।

২ঃ উপদংশ বা সিফিলিস ঃ

ভাষাকথায় ইহাকে "গরমীর ব্যায়রাম" বলে। কথিত আছে কুক্কুরসঙ্গমে "ফিরিঙ্গি" নারীর শরীরে প্রথম এই রোগ প্রকাশ পায়। তৎপরে পর্ত্তুগালদেশবাসীগণ বা ফিরিঙ্গিরা এই রোগ *এ দেশে আনিয়াছিল বলিয়া ইহার অপর একটি নাম "ফিরিঙ্গি* রোগ"। ইহা একটি সর্ব্বদেহব্যাপী রোগ। স্ত্রীপুরুষের জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষ এক প্রকার ক্ষত দেখা

দেয়। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কাহারও শরীরে এই প্রকার ক্ষত থাকিলে, স্ত্রীলোক হইতে পুরুষের ও পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকের শরীরে এই রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। শরীরের নানাস্থানে ইহার চিহ্ন প্রকাশ পায়। উপদংশবিষযুক্ত রোগীর লালা, মূত্র, ঘর্ম্ম ও স্তন্য প্রভৃতি দ্বারা এই রোগ অপরের দেহে প্রবেশ করিতে পারে। পিতামাতার শরীরে এই রোগের বিষ থাকিলে তদ্দারা সন্তানগণের—এমন কি, ভবিষ্যৎ বংশধরগণেরও এই রোগ জন্মিতে পারে। ইহাকে কৌলিক বা কুলগত উপদংশ বলে। অনেক সময়ে এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যবহারেও এই রোগের সঞ্চার হইতে দেখা যায়।

সুস্থ ব্যক্তির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে চর্ম্মের কোমল ও পাতলা অংশে অথবা ঘর্ষণ হইতে উদ্ভূত কোন প্রকারে এই বিষ সংস্পৃষ্ট হইলে সেখানে ক্ষত জন্মে। উপদংশবিষদুষ্ট সঙ্গমের পর দুই এক দিন কখন বা এক হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে এই পীড়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, কিন্তু ঐ বিষ সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্যজীবনে সংযম ও সতীত্বের অভাব হইলে, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াও পশুজীবন যাপন করিলে, তাহা জগতের যেরূপ অহিত সাধন করে, ঐ রোগের উৎপত্তি ও জগদ্ব্যাপী বিস্তারই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩। বাগী বা বিউবো।

নানাবিধ কারণে এই পীড়া হয়। তাহার মধ্যে উপদংশ ও প্রমেহ—এই দুইটি বিষই এ রোগের প্রধান কারণ।

সতীত্ব

সকল কারণের মূলই অসংযম ও ব্যভিচার। সতীত্বের অনাদরে এইরূপ কত রোগই যে সৃষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

৪। কামোন্মাদ।

যে রোগগ্রস্ত হইলে নরনারী দুর্নিবার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মান, লজ্জা, ভয় ও ঘৃণা আদি সমস্তই পরিত্যাগ করে, এবং ন্যায় অন্যায় বিচারশক্তিও হারায়, তাহাকে কামোন্মাদ বলে। ইহা দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আক্রান্ত হইতে পারে।

কারণ—সর্ব্বদা অশ্লাল ও কামোদ্দীপক চিন্তা বা কল্পনা, অশ্লাল পুস্তকাদি পাঠ, জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডূয়ন, ভোগবিলাসিতা, আলস্য, জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণ—ইহাতে অতিশয় কামেচ্ছা হয়, ও তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য বিবেচনাশক্তি কিছুই থাকে না। উলঙ্গ হয়, ইসারা করে ও হস্তমৈথুনাদি আরম্ভ করে।

অসতীত্ব ও অসংযম নরনারীকে কি জঘন্য নর-পশুতে পরিণত করে, ঐ রোগই তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

৫। শ্বেতপ্রদর।

গণ্ডমালা ধাতু, বিলাসিতা ও আলস্য, ধাতুর গোলমাল, অতিরিক্ত স্বামী সহবাস,, প্রসব বেদনায় কষ্ট পাওয়া, অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মে।

অসতীত্ব ও অসংযম যে ঐ সকল কারণের মূলে বিদ্যমান থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য।

৬। বন্ধ্যাত্ব।

শারীরিক দুর্ব্বলতা, দেহের অতিরিক্ত স্থূলতা বা মেদ-প্রবণতা, বাধিক বা ঋতুস্রাবের গোলমাল, প্রদরস্রাব ও অতিরিক্ত সঙ্গমাদি কারণে নারী বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

সংযমজনিত সতীত্ব পালনেব অভাবই যে ঐ রোগ সৃষ্টি করে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

৭। অতিরিক্ত ঋতুস্রাব।

অতিরিক্ত সহবাস, অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন, জরায়ুব পীড়া, বারম্বার গর্ভ-সঞ্চার, কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা, ঋতুকালে স্বামিসহবাস ইত্যাদি কারণে প্রচুর রজঃস্রাব হয় ও এই রোগ সৃষ্টি করে।

সংযম ও সতীধর্ম্মের অপালনই যে ইহার মূল কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮। জরায়ু প্রদাহ।

ঠাণ্ডা লাগা, ভিজা স্থানে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকা, ঋতুবন্ধ হওয়া, অতিরিক্ত স্বামিসহবাস, কষ্টকর প্রসব, জরায়ুর উত্তেজনা প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হইয়া থাকে।

সতীত্ব ও সংযমে আদর থাকিলে, কামতাড়িত হইযা এইরূপ রোগের আক্রমণ সহ্য করিতে হয় না। হায়! সতীত্ব-সংযমের অনাদর যে কতই যন্ত্রণাদায়ক পীড়া আনিয়া দেয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সতীত্ব।

স্ত্রীলোকদিগের যত প্রকার পীড়া আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টকর ও ভয়ানক।

অন্যান্য কারণের মধ্যে বহু সন্তান প্রসব ও তজ্জন্য রক্তহীনতা ও অবসন্নতা, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, সূতিকাবস্থায় আক্ষেপ প্রভৃতি এই রোগের কারণ বলিয়া কথিত হয়।

মস্তিষ্কের বিকৃতিই উন্মাদ। প্রথমে কামোন্মত্ত না হইলে, সংযত সতীজীবন যাপন করিলে, সতীত্বে চরিত্রের বল প্রদর্শন করিতে পারিলে, শেষে এ উন্মাদ রোগে কষ্ট পাইতে হয় না, ইহা নিঃসন্দেহ।

১৫। কোরিয়া—অনিচ্ছায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পন্দন।

অন্যান্য কারণের মধ্যে ভয়, নিরাশপ্রণয়, মানসিক উত্তেজনা, অতিরিক্ত সহবাস ও হস্তমৈথুন প্রভৃতি এ রোগের কারণ।

সতীত্ব ও সংযমবলে কাম-তাড়নার চিত্ত-স্পন্দন প্রথমেই নিবারণ করিতে পারিলে, পরিশেষে আর এ রোগের স্পন্দন সহ্য করিতে হয় না। অসংযম ও অসতীত্ব দেহমনকে কতই কুভাবে স্পন্দিত করে! সংযম ও সতীত্বশিক্ষায় শিক্ষিত হইলে, আর কোনরূপ কুস্পন্দনে আলোড়িত হইতে হয় না, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহার অভাবে কতই যে কুস্পন্দন সৃষ্টি করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

১৬। মৃগীরোগ।

অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রবল মানসিক আবেগ, অতিরিক্ত

ইন্দ্রিয়সেবা, হস্তমৈথুন প্রভৃতি কুকার্য্য, মাদকদ্রব্যাদি সেবন প্রভৃতি এ রোগের কারণ বলিয়া উক্ত হয়।

সংযম ও সতীত্ব পালনে ঐ সকল কারণের স্থান থাকে না; বিপরীতে বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী।

১৭। মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত সহবাস বা হস্তমৈথুন, বারম্বার গর্ভধারণ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। ইহা প্রায় যৌবনকালে বেশী দেখা যায়।

সর্ব্বদা চটিয়া থাকা, সহজে কাঁদিয়া ফেলা, নিদ্রাহীনতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অক্ষুধা বা আহারে অরুচি, সহজে সর্দ্দি লাগা ও গায়ে নানা প্রকার ফুস্কুড়ি বাহির হওয়া, সঙ্গমশক্তির অভাব, স্নায়ুশূল, স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা, বুক ধড়ফড় করা, একাকী থাকিতে ভালবাসা, বিরক্তিভাব ইত্যাদি লক্ষণ এ রোগে প্রকাশ পায়।

কঠোর সংযমে ও সতীত্বে যে জীবন বদ্ধ, তাহা যে কোনরূপ স্নায়বিক বা মস্তিষ্কসম্বন্ধীয় দুর্ব্বলতার বহির্ভূত, ইহা বলাই বাহুল্য। সতীত্ব ও সংযমের এতই বল, চরিত্রবত্তার এতই বল, যে তদ্দারা কোনরূপ বলহানতাই আর আক্রমণ করিতে পারে না। সতী-চরিত্রে কোনরূপ দুর্ব্বলতা থাকা অসম্ভব।

১৮। দৃষ্টিহীনতা।

রাত্রি জাগরণ, মানসিক চিন্তা ও প্রবল আলোকে পুস্তকাদি

সন্তীত্ব।

পাঠ, দুর্ব্বলতা ও হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত সহবাস প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

সংযম ও সতীত্বের প্রতি প্রখর দৃষ্টি থাকিলে, দৃষ্টিহীনতারোগে আক্রমণ করিতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ।

১৮। অর্শ।

অন্যান্য কারণের মধ্যে কাম-রিপুর উত্তেজনা ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

সংযম ও সতীত্বপালনে সে রিপুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা ও ঐ রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যে অসাধ্য নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

১৯। হিষ্টিরিয়া—গুল্মবায়ু—মূর্চ্ছা রোগ।

ইহাকে "বিলাতী রোগ" বলিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক রোগ; কারণ এ রোগ যে সকল কারণ হইতে জন্মে, ইতঃপূর্ব্বে সে সকল কারণ হইবার তেমন অবসর বা সুযোগ হইত না।

আত্মমৈথুনাদি কারণে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, কাম-প্রবণতা ও শারীরিক মানসিক ইন্দ্রিয়বিকৃতি বা অসুস্থাবস্থা এই রোগের প্রধান কারণ বলিয়া উক্ত হয়।

"Elements of Social Science" নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিয়াছেন—

"কিন্তু যে সকল কারণ কাম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া তৃপ্তি

দিতে পারে না ও তদ্দারা জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় স্নায়ু সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলে, তাহারাই এই রোগ সৃষ্টির বিশেষ কারণ। প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ইহাই হিষ্টিরিয়ার কারণ। একদা একজন ভারতবাসী কর্ম্মচারী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু-নারীগণের মধ্যে এ রোগ প্রায় অজ্ঞাত, এবং আমরা জানি হিন্দুজাতি কন্যার প্রথম ঋতুকাল আরম্ভ হইবার সময়েই ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত হইয়া কন্যাব বিবাহ দেন। তাঁহাবা মনে কবেন একটিও সুসন্তান নষ্ট হওয়া পাপ। অপব পক্ষে এই দেশে (বিলাতে) এত সর্ব্বত্র ও প্রচুব ভাবে বিস্তৃত বোগ বোধ হয় আর নাই। উচ্চশ্রেণীব মধ্যেই ইহার বিস্তাব খুব সাধারণ। তাঁহাদের মধ্যে কাম-প্রবৃত্তিব অধিকতর দারুণভাবে বৃদ্ধি দেখা যায়; তাহা তাঁহাদের মনকে ব্যাপৃত রাখিবার আবশ্যক কার্য্যের অভাব ও অন্যান্য অনেক কারণে হয়; যথা—নাটক নভেল পাঠ, কাব্য উপন্যাস পাঠ, নাচ গান বাজনা থিয়েটার ও অপরাপর অনেক উত্তেজনা-জনক ব্যাপাব; তাহাবা কাম লালসাকে অত্যুচ্চ চূড়ায় উত্তোলিত করে এবং প্রণয়ের আনন্দ চিত্রকে বিবিধবর্ণে চিত্রিত ও রঞ্জিত কবে। রাজপ্রাসাদ হইতে পর্ণ কুটিববাসী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীতেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, এবং আমরা জানি সকল শ্রেণীতেই অধিকাংশ স্ত্রীলোক জীবনের অধিকতর সময় এবং অনেকে সারাজীবন কামপ্রবৃত্তির অতৃপ্ত অবস্থায় যাপন করেন, এবং ভালবাসিবার ও ভালবাসাইবাব যৌবনসুলভ প্রবলতম লালসার সন্তোষসাধন করিয়া উঠিতে পারেন না। ইত্যাদি।”

সতীত্ব :

উপরে উদ্ধৃত অনুবাদাংশ হইতে ইহা বুঝা যায় যে, যে রোগ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও হিন্দুপরিবারে তেমন দৃষ্ট হইত না, তাহা এক্ষণে ঘরে ঘরে দেখা যায়। বিলাসিতা ও কামুকতা বৃদ্ধির কৃপাকটাক্ষপাতে আরও যে কত কি সৃষ্টি হইবে, তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে।

হিন্দুপরিবারে সতীত্বই বৈশিষ্ট্য। হিন্দুবিবাহ একটি ধর্ম্মসংস্কার। তদ্দ্বারা ধর্ম্মপত্নী বা সহধর্ম্মিণীলাভে পিণ্ডপ্রয়োজন হেতু সুসন্তান লাভের ব্যবস্থা। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের যন্ত্রস্বরূপমাত্র, ইহা হিন্দুধর্ম্মে অজ্ঞাত। যে দেশে বা জাতির মধ্যে বিবাহ কোন ধর্ম্মসংস্কার নহে, মাত্র চুক্তিমূলক, সে দেশে বা জাতিব মধ্যে ঐরূপ ধারণার অনুরূপ ক্রিয়া হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু হিন্দুস্বামী স্ত্রা তাঁহাদের পূর্ব্ব-সংস্কার ও ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া সেই সব জাতিব অনুকরণ করিলে ও তদনুরূপ আচরণ করিলে, অনাচার ও কদাচার জনিত উক্ত প্রকার রোগাদি যে দেশকে আচ্ছন্ন করিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? বিবাহে ধর্ম্মসম্বন্ধ স্থাপিত না হইয়া কামোপভোগের সহায মাত্র হইলে, তাহা যে কোন্ নারকীয় ব্যাপারের নিম্নতম স্তরে ডুবাইয়া দেয়, তাহা প্রকাশ করা যায় না।

২০। রক্তহীনতা :

অন্যান্য কারণ মধ্যে প্রচুর রক্তস্রাব ও অধিক সন্তান প্রসব, এই রোগের অন্যতম কারণ বলিয়া কথিত হয়।

শাস্ত্রবিধি ও সংযমে আদরহীন না হইলে যে এরূপ রক্তহীন হইতে হয় না, ইহা নিঃসন্দেহ।

২১। সংন্যাস রোগ।

অন্যান্য কারণ মধ্যে অতিরিক্ত মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য সেবন ও মদ্যাদি পান, ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা আদি ইহার কারণ স্বরূপ উক্ত হয়।

সংযম অভ্যাসে বিষয়ভোগতৃষ্ণায় বিতৃষ্ণা আসিলে কতই রোগ হইতে, এমন কি, ভবরোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়, শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ।

২২। বিষাদ-বায়ু রোগ।

শারীরিক ও মানসিক বিকৃতিই ইহার কারণ। কখন কখন আত্মহত্যার ইচ্ছা বলবতী হইতে দেখা যায়। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবাই অশেষ প্রকার শারীরিক ও মানসিক বিকৃতির হেতু বলিয়া উক্ত হয়।

সংযম ও সত্যতত্ত্বের আদর রাখিয়া দেহমনের অবসাদ না আনিলে, কোন বিষাদ বা বিষাদবায়ু রোগ আসিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

২৩। ক্ষয়কাস বা যক্ষ্মাকাস (থাইসিস)।

ইহা শিশু অপেক্ষা যুবা বা বৃদ্ধকে অধিক আক্রমণ করে। অনেক সময় পিতামাতার দোষে সন্তানের এই রোগ বর্ত্তায়।

সতীত্ব।

অতিরিক্ত সংবাস ও অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করা অন্যান্য কারণ মধ্যে এই রোগের কারণ স্বরূপ উক্ত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য অভাবে শরীর যে অন্তঃসারশূন্য হয়, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। এক্ষণে অনেকে সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া, এই রোগের বাহ্য অনেক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অবরোধ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিবার অনুরূপ যুক্তি পাইয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, অবরোধে থাকিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অভাবেই ঐ রোগ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও এত সংক্রামক ভাব ধারণ করিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও অবরোধ প্রথার কাঠিন্য বা প্রাদুর্ভাব থাকা কালে যখন হিন্দু নারীগণ বাড়ীর বাহির হইতেন না, রেলপথ বা জলপথে স্থানান্তরে যাতায়াত পর্য্যন্ত করিতেন না, কিন্তু কঠোরসংযমপরায়ণা ছিলেন, তখন ত তাঁহাদিগের মধ্যে এ রোগের এত প্রাদুর্ভাব ছিল না! ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশের যে সকল স্বাধীন নারীগণ পৃথিবীর যাবতীয় স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, যেখানে অবরোধরূপ কুসংস্কারের নামগন্ধও নাই, সে সকল দেশের নারীগণের মধ্যেও ত এ রোগ বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইতে দেখা যায়! এদেশের পুরুষগণের মধ্যেও ত এই রোগ খুবই ছড়াইয়া পড়িয়াছে! তাঁহারা ত অবরোধ-পীড়ায় পীড়িত নহেন, তবে এ পীড়ায় পীড়িত হন কেন? অন্যান্য যতই কারণ থাকুক, ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম এবং সতীত্বের দারুণ অভাবই যে অন্যান্য ভীষণ রোগের ন্যায় এ রোগের একটি প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য

রোগ নাশের ন্যায় এ রোগ নাশ বা উপশম জন্য রাজসরকারের বা দেশের সহৃদয় ধনী ও দাতাগণের আনুকূল্যে কত হাঁসপাতাল বা চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইতেছে; কিন্তু কত শত রোগের মূল কারণ যে অসংযতজীবনযাপন, তাহার প্রতীকারকল্পে কোনই শিক্ষা দান করা হইতেছে না। সংযম শিক্ষা কর, সংযত জীবন যাপন কর, ব্রহ্মচর্য্যে ও সতীত্বে আন্তরিক আদর কর, ও করিয়া নানা রোগ হইতে মুক্তিলাভের উপায় অবলম্বন কর,—এরূপ শিক্ষার কথা ত শুনা যায় না! অসংযমপঙ্ক লেপনের ফল যে রোগাদি, তাহা দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা দেশে দেখা যাইতেছে বটে, এমন কি, সে পঙ্ক ধৌত করার জন্য এদেশের জল অনুপযুক্ত স্থানে বিলাতী জল,—বিলাতের চিকিৎসক দল—আমদানি করার কথাও হইতেছে বটে, কিন্তু সেই পঙ্ক লেপন করিও না, সংযম শিক্ষা কর,—এ শিক্ষায় ত দেশকে শিক্ষিত করা হইতেছে না! সেই উৎকৃষ্ট শিক্ষা এদেশে একদিন ছিল, ও তখন পূর্ব্বজন্মকৃত পাতক, উপপাতক বা মহা-পাতকের ফলে নানা রোগ ভোগ অবশ্যম্ভাবী থাকিলেও, বর্ত্তমান-কালে যত প্রকার ভীষণ ব্যাধির বহুলতা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা তখন ছিল না। সে কালের স্বাস্থ্য, সংযম ও সতীত্ব পালনেরই সুফল ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ে এখন ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা দিবার প্রথা নাই। খৃষ্টান পাদরিগণের প্রতিষ্ঠিত ও চালিত বিদ্যালয়ে কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র শুনাইবার রীতি দেখা যায়; কিন্তু অপরাপর বিদ্যালয়ে সেরূপ করা অসম্ভব হইয়া রহিয়াছে কেন? পাছে বালক বালিকা বা যুবক যুবতীগণ

কোনরূপ ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা পাইলে বা ধর্ম্মকথা শুনিলে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, এই ভয়ে ? এখন ত ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষা শিক্ষার এক অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ভগ্নস্বাস্থ্য ছাত্রের উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া দবারও ব্যবস্থা করিতেছেন শুনা যাইতেছে। ছাত্রজীবনে স্বাস্থ্য-পক্ষী ধরিবার জন্য ঝোপের এদিক ওদিক কত দিকেই ঘা দেওয়া হইতেছে; কিন্তু প্রকৃত স্থল যে ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম ও সতীত্বশিক্ষা,—সে দিকে ত কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে না! বড় বড় মাথায় সংযমের এ ছোট কথার স্থান কোথায় ? যতদিন তাহার স্থান না হইবে, ততদিন স্বাস্থ্যচর্চ্চার ও উন্নতির যতই চেষ্টা হউক না কেন, মূল রক্ষা না করিয়া স্বাস্থ্য-বৃক্ষের অগ্রভাগে যতই শিক্ষার জল ঢালা হউক না কেন, তাহাতে যে কোন ফলোদয় হইতে পারে না, ও হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তুলসীদাস তাঁহার একটি দোঁহায় লিখিয়াছেন—

"দিন্‌কা মোহিনী রাত্‌কা বাঘিনী
পলক পলক লেহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥"

অর্থাৎ—দিবসে মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছলনায় ভুলায়, রাত্রিতে "বাঘিনী"র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে ক্ষণে ক্ষণে রক্ত

চুষিয়া খায়,—জগতের লোক পাগল হইয়া সেই "বাঘিনী"ই ঘরে ঘরে পুষিতেছে।

প্রকৃতই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্মপত্নী—না হইয়া যদি ধর্ম্ম-সংশ্রবপরিত্যাগে কামুকতাবৃদ্ধির সহায় মাত্র হন,—যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কামোন্মাদ রোগের পথ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হন,—তবে পুরুষের পক্ষে স্ত্রী "বাঘিনী"র ন্যায় সর্ব্বনাশকারিণী হইয়া থাকেন। সেরূপ "বাঘিনী"র গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে, বিনাশ মাত্র সময়সাপেক্ষ, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। অপরিমিত বীর্য্যক্ষয়ে দেহ অন্তঃসার শূন্য,—ঘুণধরা বাঁশের মত, —হইয়া পড়ে। সামান্য রোগের আঘাতেই তাহা ছিন্ন ভিন্ন ও নষ্ট হইয়া যায়। সতী স্ত্রী "বাঘিনী"র আচরণ করিয়া পতি-প্রাণঘাতিনী হইবেন না, কারণ পতিঘাতিনী কখনও সতীপদবাচ্যা হইতে পারেন না। যিনি পতি-হত্যার ঐরূপ সহায়তা করেন, সে স্ত্রীও অসতীর মধ্যে পরিগণিতা। "জীবিত থাকুন ও জীবিত থাকিতে দিউন"—ইহাই সৎপুরুষ ও সতীনারীর জীবনের মূলমন্ত্র।

বস্তুতঃ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা দ্বারা নরনারী শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দারুণ দীনতা ও হীনতা প্রাপ্ত হন। জীবনী-শক্তিক্ষয়ে তাঁহাদের শরীরে নানা রোগ প্রবেশ করে। মস্তকে, —হৃদয়ে,—উদরে,—শরীরের সর্ব্বযন্ত্রে ভীষণ ভীষণ রোগের সৃষ্টি হইয়া জীবন দুঃসহ হইয়া পড়ে। অজীর্ণ বা অম্লরোগ অতি সাধারণ রোগের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। আহারের দোষত আছেই, তাহার উপর বিহারের দোষও জঠরাগ্নি নিবাইয়া

মন্দাগ্নি আনয়ন করে, ও আহার্য্য জীর্ণ করার শক্তি নষ্ট করে। যে ক্ষয়কাস বা যক্ষ্মাকাস কত যুবকযুবতীকে অকালে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া কত সংসার শ্মশানে পরিণত করিতেছে, অসংযম ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবায় জীবনী-শক্তি ক্ষয়ই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।

পুরুষের শুক্রস্থিত অসংখ্য বীজাণুর একটীমাত্র স্ত্রীলোকের অণ্ডানুতে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভ বা সন্তান উৎপাদন করে, এবং অসংখ্য বীজাণু বৃথা নাশ পায়। যে বধ্যভূমিস্থ হাড়িকাষ্ঠে অসংখ্য প্রাণী-বীজ নিয়ত বলি হয়, তাহা বাস্তবিকই মহাশ্মশান। সেই শ্মশানবাস জীবনে অতি প্রিয় হইলে, প্রকৃত শ্মশানে চিতারোহণকাল অতি নিকটবর্ত্তী করিয়া দেয়। জীবন-প্রদীপে আয়ুরূপ তৈল ও বর্ত্তিকা থাকা সত্বেও, অসংযম ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবার ঝটিকার সম্মুখীন করিলে, তাহা অকালেই নিবিয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যরূপ কাচ-আবরণের মধ্যে সে প্রদীপ রক্ষা করিলে, প্রবল ঝড় হইতেও সে জীবন-প্রদীপ অনায়াসে সুরক্ষিত থাকে।

বাষ্পীয়শকটের এঞ্জিন যেরূপ জল কয়লা খাইয়া সবলে সতেজে চলে, কিন্তু তাহার সেই পুষ্টির অভাবে শক্তি হারাইয়া অচল হয়, মানব-দেহও সেইরূপ আহারাদি হইতে বল সঞ্চয় করিয়া চলে; কিন্তু সঞ্চয় অপেক্ষা ক্ষয় অধিক হইলে, ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া তাহার গতি একেবারে বন্ধ হয়। ব্রহ্মচর্য্য বা সংযমই দেহে শক্তিসঞ্চয় করিয়া ক্ষয় হইতে তাহা রক্ষা করিতে পারে। সেই শক্তিসঞ্চয়ে নরনারীর দেহে যে

সৌন্দর্য্য বিকাশ হয়, কেবল মাত্র যৌবন ও স্বাস্থ্য তাহা দিতে পারে না। সে এক অপরূপ জ্যোতিঃ শরীরে, ও বিশেষতঃ বদনমণ্ডলে বিকশিত হয়। সতীনারীদেহে স্বাভাবিক রূপ লাবণ্যের সহিত তাহার মিলন হইলে সোনায় সোহাগা হয়। সেই রূপ,—সেই তেজঃ,—সেই জ্যোতিঃ যিনি দেহে ধারণ করিয়াছেন ও যিনি তাহা নয়নগোচর করিয়া জীবন সফল করিয়াছেন, তিনিই ধন্য। রূপসীযুবতীগণ অসংযমে মুখে বা চোখের কোলে কালিমা না মাখিয়া, যথার্থ সতীতেজে—যথার্থ রূপসীমূর্ত্তি ধরিতে কি চাহেন না? রূপমুগ্ধ পতিগণ নিজ নিজ স্ত্রীকে সেই রূপমাধুরী বিতরণ করিয়া যথার্থ রূপবতী করিতে ও দেখিতে কি চাহেন না? রূপ ত উভয়েরই বড আদরের বস্তু! উভয়ের হস্তেই ত সেই রূপ লাভের ও দানের ক্ষমতা রহিয়াছে! ক্ষমতা থাকিতে তাহা প্রয়োগে অত শুভফল লাভ না করা কি পরিতাপের বিষয় নহে? পাপে আয়ুক্ষয় হয়। অসংযম ও অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা শরীরের পক্ষে মহাপাপ। তাহাব ফল ক্রমে ক্রমে,—এক এক পা করিয়া,—মৃত্যুমুখে প্রবেশ। এরূপ আত্মহত্যা কি মহাপাপ নহে?

হিন্দুশাস্ত্রে বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা আছে। বালিকার সঙ্গে যুবকের বিবাহব্যবস্থা ছিল। বালকের বিবাহব্যবস্থা ছিল না। ২৫ বৎসরের যুবক ১০।১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিতেন, কিন্তু ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ ছিল। তাহাতে কুফল ফলিত না। বালক বয়সে স্ত্রীসংসর্গহেতু যে নানা কুফল ফলে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেহেতু সুশ্রুত বলেন—

"ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদা ধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥
জাতো বা ন চীরংজীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥" অর্থাৎ—

যদি পঁচিশ বৎসরের কম বয়সের পুরুষ ষোল বৎসরের কম বয়সের স্ত্রীতে গর্ভাধান করে, তবে সেই গর্ভ মাতার উদরেই বিপদ্‌গ্রস্ত হয়; যদি ব মাতার গর্ভ হইতে বাহির হইতে পারে, তবে দীর্ঘজীবী হয় না; যদি বা বাঁচিয়া থাকে, তবে দুর্ব্বল-ইন্দ্রিয়-যুক্ত হইয়া থাকে; সেইজন্য অত্যন্ত অল্পবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করা উচিত নহে।

বালিকা-বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু বালিকা-গমন-প্রথা নিন্দিত ছিল ও তাহা কখনও প্রচলিত ছিল না। সংযম না থাকিলে যুবতী-বিবাহও অশেষ অকল্যাণ প্রসব করে। মনুষ্যজীবনে সংযমই সারবস্তু এবং অশেষ কল্যাণকর। সংযম ভিন্ন অবৈধ উপায় অবলম্বন দ্বারা সন্তানের জন্ম নিবারণের চেষ্টা অতি অশাস্ত্রীয় ও গর্হিত। পাশ্চত্যদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার অনুমোদন করিলেও, হিন্দুর দেশে হিন্দুর চক্ষুতে উহা মহাপাপ ও সতীত্বহীনতার পরাকাষ্ঠা বলিয়াই বিবেচিত; এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত।

পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিলে সতীত্ব বজায় থাকার সহায়তা করে, কিন্তু জাতি দুর্ব্বল হইয়া যায়। সেহেতু সে সকল সুসভ্য দেশে স্ত্রীজাতির সতীত্ব অপেক্ষা জাতীয় পশুবল ও লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অধিকতর আদরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

সতীত্ব।

ঐতিহাসিক লেকি তাঁহার "History of European Morals" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইউরোপের অপর সকল দেশে স্ত্রীলোকের যে বয়সে বিবাহ হয়, আয়ারলাণ্ড দেশের স্ত্রীলোকদিগের তদপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই সেখানে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সতীত্বের আদর ও ব্যভিচারের অভাব অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

রেভারেণ্ড চালস্ ভায়েসী নামক জনৈক পাদ্রি সাহেব ইংরাজসমাজে অল্প বয়সে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহপ্রথা প্রচলন দ্বারা সতীত্ববৃদ্ধির ও সে দেশের ভীষণ ব্যভিচারস্রোত-হ্রাসের জন্য স্বদেশবাসীকে পরামর্শ দিয়াছেন।

আর্য্যঋষিগণ এখন কাঙ্গালশ্রেণীতে পতিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু কাঙ্গালের কথাই "বাসি" হইয়া অনেক বিষয়ে এ জগতে খাটিতেছে দেখা যায়।

হিন্দুর ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ অশেষ কুসংস্কার-ভস্মে আচ্ছাদিত বলিয়া আধুনিক সভ্যসমাজ কতই নিন্দা করেন। কিন্তু ভস্মের তলেও অমূল্য রত্ন নিহিত থাকিতে পারে। তাই কবি লিখিয়াছেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই,
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।"

হিন্দুর সেই জাতিভেদই আদর্শ হিন্দুপারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবনগঠনের দৃষ্টান্তস্থল ও শ্রেষ্ঠসভ্যতাসূচক বলিয়া আধুনিক শিক্ষিত সমাজের গুরুস্থানীয় ইউরোপই স্বীকার করিতেছেন, এবং সে দেশেও নূতন জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত করিয়া

যাহাতে বিশুদ্ধরক্ত রক্ষা দ্বারা উচ্চবংশবিশেষ সৃষ্টি করিতে পারা যায়, সেজন্য অনেকে সচেষ্ট হইতেছেন। ব্রহ্মচর্য্য বা সংযমের প্রস্তরময় দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত সমাজেই সতীত্ব সৌধ অচল অটল সুমেরুবৎ বর্ত্তমান থাকে, নতুবা ব্যভিচার ও অসংযমের ভিত্তির উপর স্থাপিত সমাজ তাসের ঘর বা বালির বাঁধ,—ইহাই আর্য্যজাতির প্রদত্ত শিক্ষা।

বিলাতে "National Council of Public Morals" বা "জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র রক্ষণ" নামক সমিতিতে জন্মের হার সংযত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি ঐ সভায় স্থির হইয়াছে যে, কৃত্রিম উপায়ে জন্মের হার হ্রাস করার চেষ্টা অন্যায়, এবং ন্যায্যভাবে উহা সংযত করার একমাত্র উপায় আত্মসংযম। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম যে সমাজের অশেষ কল্যাণকর বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—সেই কাঙ্গালের কথাই বাসি হইয়া বিলাতেও খাটিতেছে। আত্মসংযম করিতে গেলে সত্ত্বগুণপ্রধান হওয়া ও তজ্জন্য সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ ও মধ্যে মধ্যে উপবাসাদি করা আবশ্যক বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা। কোনও দিন এ শিক্ষারও আদর যে ইউরোপ করিবে না—ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

বিলাসিতায় ইন্দ্রিয়সংযম কমে ও ব্যভিচার বাড়ে। চরিত্রের সাধুতা ও সতীত্বের অভাবে নরনারীর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতি অনিবার্য্য। নরনারীর সাধুতা ও সতীত্ব ইন্দ্রিয়-সংযমের সুফল। সে সুফল ভোগ না করিতে পারিলে, দেহ মন ও নীতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। দেহ দুর্ব্বল হইলে নানা রোগ আশ্রয়

করে, কিন্তু সংযমের ফলে দেহ সবল থাকিলে, অনেক রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ম্যালেরিয়া রোগ এ দেশকে ছারখার করিতেছে; দরিদ্র জাতির ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দুর্ব্বল দেহ অসংযমে ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবায় অধিকতর দুর্ব্বল হইতেছে বলিয়া তাহার প্রকোপও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাচীন গ্রীসদেশের ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, সেই প্রাচান সুসভ্য জাতি যতদিন বিলাসিতাহেতু ও অসংযমহেতু দুর্ব্বল হইয়া পড়েন নাই, ততদিন ম্যালেরিয়ারোগ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। পরে গ্রীক্ নরনারী চরিত্রের পবিত্রতা বা সাধুতা ও সতীত্ব হারাইয়া যখন হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, ব্যভিচার ও অসংযমের খরস্রোতে যখন সে দেশ প্লাবিত হইতে লাগিল, তখনই তাঁহাদিগের দুর্ব্বল দেহ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা স্বাধীনতা ও পূর্ব্বগৌরব বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রীতি অসংযমী ইন্দ্রিয়পরায়ণ জাতির মধ্যে শূন্যগর্ভ শব্দে বা নামমাত্রে পরিণত হয়। জোন (Joane) সাহেব তাঁহার লিখিত "Greek History and Malaria" নামক গ্রন্থে ঐ বিষয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন।

উক্ত গ্রীক্ ইতিহাস এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে এখন দৃষ্টান্ত স্থলে থাকিয়া ধর্ম্ম নীতি ও সংযমহীন বঙ্গবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক হইবার যোগ্য। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত অধঃপতিত গ্রীক্‌জাতির চরিত্রের সহিত বর্ত্তমান বঙ্গবাসীর চরিত্রের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। নরনারীর অসাধুতা ও অসতীত্ব,—অসংযম ও অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা,—সকল জাতিকেই অন্তঃসারশূন্য করিয়া অধঃপতনের

গভীরতম তলে নিক্ষেপ করে,—ইহাই জগতের ইতিহাসের শিক্ষা। পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অনেক জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ভাগ্যহীন বঙ্গদেশ কি প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানলাভে সংযমের পথ ধরিবে না? ছিন্ন কন্থাশয্যাতেই সুখশায়িত হইয়া লক্ষ মুদ্রার সুস্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিবে? বঙ্গদেশের এই বৃথা শিক্ষিতাভিমান কবে দূর হইবে? কবে বঙ্গবালাগণ অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণা হইবেন? কবে ধর্ম্মহীন, নীতিহীন শিক্ষার মাকালফলের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া প্রাচীন ভারতের যে প্রকৃত শিক্ষা ছিল, সেই শিক্ষালাভে, নীতিশিক্ষালাভে নিষ্কলঙ্কচরিত্র হইয়া আবার হিন্দুর গৃহ আলোকিত করিবেন? কবে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া চরিত্রের বা কায়মনোবাক্যের পবিত্রতা রক্ষায় যত্নশীল হইবেন? তাঁহারাই লোকমাতা—লক্ষ্মী। তাঁহারা মাতৃত্বের—নারীত্বের যে কত দায়িত্ব, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রসূতি তাঁহারা, তাহা কবে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কলুষকালিমা ত্যাগে আবার জগতের চক্ষুতে পূর্ব্বসতীত্বের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেবী হইয়া জগতের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি লাভের উপযুক্ত হইবেন? কবে তাঁহারা আবার পূর্ব্বগৌরবমণ্ডিত মস্তক উন্নত করিয়া জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সতীত্বের আদর্শ—ত্যাগ, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ জগতের সমক্ষে ধারিবেন? কবে বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণ আবার গৃহের প্রকৃত লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিয়া এদেশকে ধন্য করিবেন? স্বেচ্ছায় অন্তঃপুর বা গৃহ ত্যাগে বহির্গমন করিতে ও সর্ব্বনাশের মূল তথাকথিত স্বাধীনতায়,—ব্যভিচারপূর্ণ যথেচ্ছব্যবহারে ঘৃণা আনিয়া প্রকৃত